প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ

সুকুমারী ভট্টাচার্য

বৈদিক যুগে নারী

'বৈদিক যুগ' বলতে যদি আমরা ঋগ্বেদ ও বেদাঙ্গসূত্র-এর মধ্যবর্তী সময়কাল বুঝি, এবং যথাযথ বৈদিক যুগের সময়সীমা যদি সেটাই হয় তাহলে তার ব্যাপ্তি সতেরো থেকে আঠারোটি শতক। (১) অবশ্যই এই সময়ে নারীর অবস্থান আগাগোড়া এক ছিল না। ঋগ্বেদ-এর প্রাচীন অংশে আমরা দেখি, গ্রামকেন্দ্রিক যাবাবর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যতটুকু প্রত্যাশা করা যায়, নারী সেই মাত্রাতেই স্বাধীনতা ভোগ করছে। (২) নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নানা চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ঊষস অর্থাৎ ভোর এক রূপসী, সুসজ্জিত রমণী; তাকে সম্পূর্ণ বাধাহীন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: 'শুচি ও সুন্দর ঊষস, রক্তবস্ত্রে সজ্জিতা যেন সদ্যস্নাত, মায়ের হাতে স্নেহভরে প্রসাধিতা এক কন্যা।' (৩) 'হাস্যমুখী বধু যেমন স্বামীর সামনে নিজের রূপ উন্মোচিত করে তেমনি ঊষা তার রূপ উন্মোচিত করেন।' (৪) এ ছাড়া তাকে নির্লজ্জাও বলা হয়েছে। (৫) এর থেকেই নারীর স্বাধীন বিচরণ বিষয়ে সমাজের বিরূপ

মনোভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু এই অংশটি ঋগ্বেদ রচনার অর্বাচীন সময়কার। 'অগ্নি মানুষের স্তুতি তেমন ভাবেই উপভোগ করেন, যেমন ভাবে প্রেমিক পতি স্ত্রীকে উপভোগ করেন।' (৬) 'আমাদের স্তুতি তোমাকে তেমনি ভাবে স্পর্শ করুক, যেমন ভাবে স্বামীর স্পর্শে স্ত্রীর কামনা জেগে ওঠে।' (৭) 'অগ্নি স্বামীর দ্বারা সম্মানিত স্ত্রীর মতোই পবিত্র।' (৮) লক্ষ্য করা যেতে পারে, দেবতার পবিত্রতা মর্ত্য নারীর পবিত্রতার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। একের পর এক চিত্রকল্পে নারীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারী পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ভক্তের ইষ্টদেবতার প্রতি আবেদনের। (৯) সূর্য উষার পিছনে পিছনে যান, যেমন পুরুষ যায় নারীর পিছনে। এমনকী পুরুষের প্রতি নারীর কামনাকেও খোলাখুলি ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (১০) সূর্য উষার উপপতি; 'জারোন'— বারে বারে ব্যবহৃত এই অংশটির মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের চিত্র বহুবার পাওয়া গেছে। পিতা ও কন্যার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক নাভানেদিষ্ঠ সূক্তের বিষয়। (১১) ভাইবোনের মধ্যে এই সম্পর্ক বিখ্যাত যম-যমী সংবাদ সূক্তের বিষয়। (১২) 'নদীগুলি বিশ্বামিত্রের দিকে যায়, যেমন নারী নত হয় চুম্বনোদ্যত পুরুষের দিকে।' (১৩) 'যেমন প্রিয়া পত্নী প্রেমিক স্বামীর মধ্যে আনন্দ পায়, হে ভক্ত, তুমিও যেন আমার মধ্যে সেই আনন্দ পাও।' (১৪) আবার ভক্ত ও ইষ্ট দেবতার তুলনা করা হচ্ছে মনুষ্যমিথুনের সঙ্গে। ঘৃতের ধারা সোমের দিকে যায়, যেমন সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণী যায় স্বামীর কাছে। (১৫) অবিবাহিতা নারী তার স্বামী বেছে নিতে পারে। (১৬) গৃহে তার কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে স্পষ্ট ভাবে কিছু বলা নেই, শুধু বলা হয়েছে সে জল আনত এবং ক্ষেতের দেখাশোনা করত। (১৭) শতপথ ব্রাহ্মণ-এ বলা হয়েছে, সে পশম পাকাত (এবং হয়তো বুনতও)। (১৮) অবশ্যই বাড়িতে আরও অনেক কাজ তাকে করতে হত। ঋগ্বেদ-এ নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করারও সাক্ষ্য আছে। তাই আমরা শুনি, মুদ্-গলিনীর যুদ্ধ জয়ের বৃত্তান্ত। (১৯) বিশ্‌পলা যুদ্ধে একটি পা এবং বধ্‌মিতী একটি হাত হারান। বধ্‌মিতী এবং শশীয়সী তাঁদের বীরত্বের

জন্যও উল্লিখিত হয়েছেন। এর থেকে প্রাচীন বৈদিক যুগে নারীর কিছুটা সাম্য ভোগ করার সাক্ষ্য মেলে। দেবগণ ও পিতৃগণকে দৈনন্দিন জল দেওয়ার প্রসঙ্গে এমন তিন নারীর নাম পাই যাদের উদ্দেশ্যেও জল দেওয়া হত। তাঁরা হলেন গার্গী বাচক্লবী, বাড়বা আত্রেয়ী এবং সুলভ মৈত্রেয়ী। (২০) তাছাড়া বেদের ছয় অধ্যয়নের অন্তে উৎসর্গ দিবসে একটি অনুষ্ঠান হত; অন্যান্য শ্রদ্ধার্থীদের মধ্যে বিশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীকে আসন দেওয়া হত।

বিবাহের সময়ে বধূর মধ্যে পাঁচটি আকাঙ্ক্ষিত গুণ ছিল: বিত্ত, রূপ, শিক্ষা, বুদ্ধি এবং সঙ্গশ। (২১) কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার অধিকার এক বিতর্কিত বিষয়। বহু অর্বাচীন একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রাচীন কালে নারীর যজ্ঞোপবীত দিয়ে দীক্ষা হত; তার বাবা, কাকা বা দাদা তাঁকে বেদাধ্যাপনা করাতেন; তিনি গৃহেই আনুষ্ঠানিক ভিক্ষা করতেন এবং মৃগাজিন, বঙ্কল বা জটা ধারণ করতেন না। (২২) কিন্তু এই গ্রন্থ অনেক পরবর্তীকালের, এবং অনুমান হয় দ্বিতীয় প্রকারের নারী অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিনীদের জন্য যমসংহিতা-র নিয়মের উপর ভিত্তি করে রচিত। অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য ধারণা বলে যা মনে হয়, তা হল, আর্য বসবাসের প্রথম কয়েকটি দশকে নারী তার উপনয়ন ও স্বাধ্যায়ের অধিকার হারায়নি, কিন্তু আর্যরা যখন অনার্য পত্নী গ্রহণ করতে শুরু করল, তখন সমাজ নারীর উপনয়ন ও স্বাধ্যায়ের অধিকার কেড়ে নিল। অতএব সাধারণ ভাবে নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হল। তবে এর ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল: দয়াল পিতারা বালবিধবা কন্যাদের শিক্ষা দিতেন; বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত কুমারীদেরও শিক্ষা দিতেন। এই ব্যতিক্রমগুলির কথাই আমরা মাঝে মাঝে শুনি; তাদের মধ্যে আছেন বিশ্বব্যারা, ঘোষা, গোধা, অপালা। যাগুবল্ল্য বিদুষী কন্যা লাভের জন্যও একটি অনুষ্ঠানের নিয়ম বলেছেন। (২৩) ঋগ্বেদ একাধিক ঋষিকার বিষয়ে অবহিত; আমরা অস্তুরের কন্যা বাক-এর কথা জানি, যিনি বিখ্যাত 'সোহহম' তন্ত্রের ঋত্রি, যে তন্ত্র উপনিষদের শিক্ষা ও বেদান্তের বীজ। গার্গী এবং মৈত্রেয়ীও এর নিদর্শন। কিন্তু

যে নারী যুক্তিসঙ্গত ভাবে তর্ক করতে পারে ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঋষিকে তর্কে কোণঠাসা করে ফেলতে পারে, তার বিষয়ে সমাজের রক্ষণশীলতা প্রতিফলিত হয়। গার্গীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের অযাচিত তিরস্কারে: 'আর প্রশ্ন কোরো না তোমার মাথা খসে পড়ে যাবে।' (২৪)

পরবর্তীকালে ব্যাকরণ গ্রন্থে একটি স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করার নিয়ম করা হয়েছে যার ফলে শিক্ষয়িত্রীকে শিক্ষকের স্ত্রীর থেকে ভিন্ন করা যায়। ফলে আমরা কাশাকুৎস্না আপিশলার সঙ্গে পরিচিত হই, যিনি মীমাংসা ও ব্যাকরণে পারদর্শী ছিলেন। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কবে শিক্ষার অধিকার এমন ভাবেই কেড়ে নেওয়া হল যে নারীর শিক্ষার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেল; কেন এবং কবে উপনয়নের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল, স্বাধ্যায় নারীর কাছে অগম্য হয়ে গেল এবং যে ব্যতিক্রম পাওয়া যায় তা প্রাদেশিক বংশগত মাত্র। (২৫) আমরা শুনতে পাই যে শিক্ষিতা নারী আসলে পুরুষই, যদিও শিক্ষিতা বধূর আকাঙ্ক্ষা ছিল। এ থেকে স্পষ্টই নারীর শিক্ষা বিষয়ে সমাজের দৃঢ় আপত্তির প্রতিফলন পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই নারীর নির্বাসন হচ্ছিল গৃহকর্মে; সে বন্দি হচ্ছিল অন্তঃপুরে। যদিও ঋগ্বেদ-এর একটি সূত্রে নববধূকে আশীর্বাদ করা হয়েছে 'তোমার শ্বশুর কুলের সবার সম্রাজ্ঞী হও।' (২৬) তা সত্বেও অথর্ববেদ-এ বলা হয়েছে, সূর্যোদয়ের সময়ে তেমনি ভাবেই প্রেতেরা পালায়, যেমন ভাবে পুত্রবধু শ্বশুরের কাছ থেকে পালায়। (২৭) ঋগ্বেদ-এর আশীর্বাদ সদিচ্ছামাত্র, বাস্তবতার বিরোধী বলেই তাকে এ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে; বাস্তব জীবনে নারী তার স্বাধীনতা আগেই হারিয়েছে এবং অথর্ববেদের পরিস্থিতির দিকে চলেছে। এও আবার এক প্রহেলিক; কেমন করে, কেন এবং কবে এই বিবর্তন ঘটিল; এর পিছনে সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধার্মিক-সাংস্কৃতিক কী কী শক্তি কাজ করছিল তা অনুসন্ধানের বিষয়।

শোনা গেছে, নারীর স্থান গৃহে। বাইরের জীবন বলতে যা কিছু সে এক সময়ে ভোগ করেছে, ভারতীয় মাটিতে আর্ষেরা বসতি করার পর আনুমানিক দুই শতক অবধি সেই স্বাধীনতাটুকু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সব অধিকারের সঙ্গেই সে হারিয়েছে। তার মনের উপর কোনও অধিকার নেই, এমনকী নিজের শরীরের উপরেও না। (২৮) সে যেহেতু শিক্ষার অধিকার হারিয়েছে, তার জীবন দুটি ভাবে বিভক্ত: প্রথম, পিতৃগৃহে কয়েক বছর, এবং দ্বিতীয়, বয়ঃসন্ধির পর (পরবর্তীকালে বয়ঃসন্ধির পূর্বেই) যখন তাকে সম্প্রদান করা হত এবং বাকি জীবনটা শ্বশুরালয়ে কাটত। বিবাহিতা নারী কোনও অবস্থাতেই পিতৃগৃহে ফিরে সেখানে থাকতে পারত না, কারণ তাতে কলঙ্ক হয়। বেদাঙ্গের গ্রন্থকাররা কঠোর ভাবে তার ফিরে আসার নিন্দা করেছেন। (২৯) অবিবাহিতা নারীদেরও নিচু চোখে দেখা হত, সম্ভবত সামাজিক ভাবে তাদের একঘরে করে রাখা হত। এমনকী ঋগ্বেদ-এও বয়স্ক কুমারীদের উল্লেখ আছে, যারা পিতৃগৃহে বৃদ্ধ হয়ে যায়। (৩০) এর সাক্ষ্য বহন করে 'কুলপা'— গৃহে পালিতা, 'অমাজু', 'আমাজুর'— যে গৃহে বৃদ্ধ হয়ে যায়, 'বৃদ্ধকুমারী' এবং 'জরৎকুমারী'— আইবুড়ি, ইত্যাদি। সুতরাং পরে বিবাহ যেমন আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল, ততটা তখন ছিল না। মেয়েদের শরীরে কোনও খুঁত থাকলে যৌতুকের প্রয়োজন হত। (৩১) এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, নারী এর মধ্যেই এক দায় বলে গণ্য হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সী কুমারীস্ব যুগের সঙ্গে অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

ঋগ্বেদ-এর যুগে সম্ভবত বিধবারা বেঁচে থাকত, কখনও কখনও তাদের দেবরের সঙ্গে বিবাহ হত। একটি সূক্ত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর এক নারী তার পাশে শুয়ে থাকে, তখন এক পুরুষ (সম্ভবত দেবর, ভাষ্যে বলা হয় গুরু বা প্রাচীন দাস) তার হাত ধরে জীবিতের রাজ্যে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করতে অনুরোধ করে। (৩২) এখানে দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে,

স্বামীর চিতায় মতুর ইচ্ছা অনুকরণ করে তাকে সেখান থেকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনা। গ্রন্থের পটভূমিকা থেকে মনে হয়, সতীদাহের রেওয়াজ জানা ছিল এবং সম্ভবত কোথাও কোথাও তা অনুষ্ঠিতও হত। অথর্ববেদের একটি সূত্রে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়: 'জীবিত নারী মৃতের বন্ধুরূপে গৃহীত হচ্ছে, অথবা 'এই নারী তার স্বামীর দেশে চলেছে, সে প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করছে।'(৩৩) এই রীতি কত প্রাচীন ছিল? কোথায় কখন এবং কেন তা প্রচলিত ছিল? দেওরালার ঘটনা যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সে কথা বোঝার আগে এ বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন। ইন্দো-ইউরোপীয়রা সতীদাহ করত না; হোমার, ভার্জিল, নিবেলুঙ্গলিয়েড ও বীরগাথা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। একি তবে দেশীয় রীতি, সিন্ধুসভ্যতার রীতি? কিন্তু বিধবা বেঁচে থাকলেও তার জীবন খুব সুখের ছিল না; একটি মন্তব্যে বলা হয়েছে, 'আমি যেন ইন্দ্রাণীর মতো অবিধবা থাকতে পারি।'(৩৪) এ শুধু তার পতি প্রেমের অভিব্যক্তি নয়; কিন্তু কোনও পুরুষের বিপল্লীক না হওয়ার প্রার্থনার নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না।

নারীর বহুবিবাহও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না; অথর্ববেদে বলা হয়, 'যে নারীর পূর্বে স্বামী ছিল, সে যদি দ্বিতীয় পরিগ্রহ করে, তাহলে তাকে পঞ্চোন্দন অর্থদান করতে হয়।'(৩৫) অথবা, 'যে নারীর দশ স্বামী আছে, সেও যখন ব্রাহ্মণ স্বামী গ্রহণ করে, সেই ব্রাহ্মণই তখন তার প্রকৃত স্বামী, রাজন্য ও বৈশ্য স্বামীরা নয়।'(৩৬) গ্রন্থগুলিতে বিধবা বিবাহের বিকল্প অর্থ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নারীর বহু বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ—দুটি ক্ষেত্রেই এই অংশগুলিতে নারীর যে অধিকারের ইঙ্গিত আছে, তা সে পরে হারিয়েছিল। তা কবে এবং কেন?

গণিকাবৃত্তিকে বলা হয় পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন পেশা এবং বেদে নানা নামে গণিকার পরিচয় মেলে: হস্তা, অগ্র,(৩৭) সাধারণী ও সামান্যা,(৩৮)

পুংশচলী,(৩৯) রজয়িত্রী,(৪০) অতিস্কন্দরী, অপস্কন্দরী।(৪১) পরে নামগুলির সংখ্যা আরও বেড়েছে, এবং এদের অধিকার, কর্তব্য এবং সামাজিক অবস্থান আরও স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত হয়েছে।(৪২)

নারীহরণের উল্লেখও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি সূত্রে জনৈক পুরুষ তার প্রেমিকার আত্মীয়দের মতের বিরুদ্ধে —তবে অনমান করা যায়। তার নিজের মতানুসারে—প্রেমিকাকে অপহরণ করার সময়ে প্রার্থনা করে ফেন সমস্ত পরিবার প্রেমিকার ভাইয়েরা, তার আত্মীয়েরা এমনকী কুকুরগুলো পর্যন্ত গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে, যাতে সে নির্বিঘ্নে প্রেমিককে নিয়ে পালাতে পারে।'(৪৩) পুরুষিত্রের কন্যাকে নিয়ে বিনদের পালানোর কথা জানা যায়।(৪৪) নারীর বহুবিবাহ যদিও সংখ্যায় কম এবং ব্যতিক্রমী চরিত্রের—অন্তত লিখিত নিদর্শন যেটুকু পাওয়া যায়—কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহ সাধারণ ব্যাপার। পুরুষের দুটি বিবাহের সমর্থনে এক যন্ত্রীয় অনুষ্ঠানের ছদ্মযুক্তি পাওয়া যায়: 'যেহেতু দুটি বস্ত্রখণ্ড একটি দণ্ডকে বেঁধে রাখতে থাকে, বিপরীতটি হয় না, অতএব নারীর দুই স্বামী থাকতে পারে না, কিন্তু পুরুষের দুই স্ত্রী হয়।'(৪৫) রাজা বৈধ ভাবেই চারটি মহিষী রাখতে পারতেন।(৪৬) তার পরেও যত খুশি বিবাহ করতে পারতেন এবং তার অন্তঃপুরে নানা প্রকৃতির উপপত্নীও রাখতে পারতেন। ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে দ্বিতীয় পত্নীকে ভোগ করা যায়—তাই প্রত্যেক পুরুষের দুটি করে পত্নী ভোগ করার ক্ষমতা আছে।'(৪৭) যদিও পুরুষের একাধিক পত্নী থাকে, এক নারীর পক্ষে এক স্বামীই যথেষ্ট।'(৪৮)

একটি অত্যন্ত ইঙ্গিতবহু অংশে বলা হয়, সমৃদ্ধি সেই পুরুষেরই যার পশুপালের চেয়ে স্ত্রীর সংখ্যায় কম।'(৪৯) লক্ষণীয় যে, ধনের অর্থে পশুপাল ও স্ত্রীর কথা এক নিঃশ্বাসে বলা হয়েছে। ধনীর পশুপালের সঙ্গে যখন তুলনা হচ্ছে, তখন তার স্ত্রীর সংখ্যা যে কত তা কল্পনাভীত। এক পুরুষের অনেক স্ত্রী

থাকত।(৫০) এমনকী ঋগ্বেদেও পুরুষের বহুবিবাহের কথা শুনি।(৫১)
মৈত্রায়ণী সংহিতা-য় মনুর দশ পত্নীর উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা-য়
সাতাশ পত্নীর স্বামী চন্দ্রের রোহিণীর প্রতি পক্ষপাতের জন্য শাস্তির বিবরণ
আছে।(৫২) বলা বাহুল্য, সাতাশটি পত্নীর বিবরণ সমাজের অতি পরিচিত
বাস্তব চিত্রের একটি পৌরাণিক প্রতিফলন মাত্র। সাধারণ ভাবে নারীর
তপস্যা করার কথা নয়; একমাত্র স্বামীলাভের জন্য তপস্যা তার
ব্যতিক্রম।(৫৩)

বিবাহ অধিকাংশ নারীর পক্ষে আবশ্যিক; এক বিবাহে নারীকে শুধু এক
ব্যক্তির হাতে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় 'পরিবারকে', (৫৪) ফলে গোটা
পরিবারেরই তার উপর অধিকার জন্মায়। বিবাহে বধু বরের তুলনায় নিকৃষ্ট;
স্বামীর পরিবারের প্রতি তার প্রচুর কর্তব্য; কিন্তু তার পরিবারের প্রতি স্বামীর
কোনও কর্তব্য নেই। সে শুধু স্বামী ও সন্তানদের সেবা করে না, শ্বশুরবাড়ির
সব আত্মীয়দেরই সেবা করে। 'তাকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকতে হবে, না হলে
তার শক্তি ক্ষয় হয়।' (৫৫) প্রশ্ন করার বাসনা হয়, এ কোন শক্তি যা শুধুমাত্র
অবরোধে থাকলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? 'সতী স্ত্রী সে-ই যে স্বামীকে তুষ্ট করে,
পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর মুখের উপর জবাব দেয় না।' (৫৬)
'পুরুষের সম্মুখে স্ত্রীর ভোজন উচিত নয়।' (৫৭) শোনা যায়, স্ত্রী যজ্ঞের
উত্তরার্থ, (৫৮) কিন্তু ধর্মাচরণে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নেই, (৫৯) স্ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করতে
পারে না। তার উপস্থিতি যজ্ঞে আবশ্যিক, কিন্তু সে সেখানে পুতুলমাত্র। (৬০)
'সে যজ্ঞে আহুতি দিতে পারবে না।' (৬১) সে সভায় উপস্থিত থাকতে পারত
না, (৬২) মধুপান করতে পারত না। 'সে মধু খায় না, বলে-আমি আমার
পুত্রদের জন্য এই ব্রতপালন করলাম।' (৬৩) তার প্রধান কর্তব্য পুত্রের জন্ম
দেওয়া (৬৪) এবং সে যদি তা না পারে তবে তাকে ত্যাগ করা যায়। (৬৫)
অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়, স্ত্রী কলহপরায়ণা, অশুচি, ধর্ষিতা বা চৌর গৃহীতা

হলেও 'তাকে ত্যাগ করা যাবে না।'(৬৬) 'যে স্ত্রী ভ্রষ্টা, সেও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পবিত্র হতে পারে।'(৬৭) 'যে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে তার কঠোর দণ্ড হতে পারে, কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তার শুদ্ধি হয়।'(৬৮) 'যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি কটুভাষণ করে, তাকে উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।'(৬৯) বন্ধ্যা নারী দশ বছর পরে আইনত পরিত্যাজ্য হত, যে নারী মৃত্যুবৎসা বা শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়, সে বারো বছর পর পরিত্যাজ্য হত, এবং কলহপরায়ণা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্য।'(৭০) লক্ষণীয় যে বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র অনুসারে কলহপরায়ণা স্ত্রীও অপরিত্যাজ্য।(৭১) সেখানে যে স্বামী ধর্ষিত স্ত্রীকেও ত্যাগ করে, তার জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান আছে। কিন্তু মহাকাব্য বা পুরাণে যে রকম নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, স্ত্রীর কোনও রকম চারিত্রিক বিচ্যুতি থাকলে, বা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও তাকে অবশ্যই ত্যাগ করা হত। সমাজে কন্যাসন্তানের পরিস্থিতি অতিরিক্ত প্রকট হয়ে পড়ে, শুধুমাত্র কন্যাসন্তানের জননীর কঠিন শাস্তি পাওয়ার বিষয়ে নিয়মগুলি থেকে। একটি সোমযাগে কয়েকটি যজ্ঞপাত্র মাটিতে রাখা হয়, কয়েকটি উপরে তুলে ধরা হয়: 'সুতরাং সদ্যোজাত কন্যাসন্তান মাটিতে রাখা হয়, পুত্রসন্তান উপরে তুলে ধরতে হয়।'(৭২) অতএব নারীকে সামাজিক ভাবে নিচু করে দেখার যে সহজাত প্রবণতা, সেটা জন্মক্ষণ থেকেই পরিস্ফুট এবং একটি কু-তর্কের সাহায্যে তার একটি ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। বিবাহেও সে তার দাম্পত্যজীবন শুরু করে নিচু হয়েছে; পরিচিত বিবাহের মন্ত্রে স্বামী বলেন, 'তোমার হৃদয় আমার ব্রতে নিহিত হোক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তকে অনুসরণ করুক।'(৭৩) লক্ষণীয় যে, তাকে তার ব্যক্তিত্ব স্বামীর ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিতে হতো। 'স্বর্গ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব...স্ত্রী যেন স্বামীর পরিবারে ধ্রুব হয়।'(৭৪) যে জিনিসটা খুব প্রকট ভাবে অনুপস্থিত, তা হল তার প্রতি ধ্রুব হওয়ার, তার মানসিক ভাবগত প্রয়োজনগুলি মেটাবার বিষয়ে তার স্বামীর কোনও প্রতিশ্রুতি। তাকে ব্যবহার করা হয় একটি

অসাড়, চিত্তহীন পদার্থী হিসেবে, যার অস্তিত্বে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার স্বামীর তুষ্টিসাধন করা। 'স্ত্রী স্বামীর অনুগামী হবে।' (৭৫) 'নারী তার স্বামীর পথে চলবে।' (৭৬) নারীকে শৈশবে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে স্বামী রক্ষা করে, বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে; স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নেই।' (৭৭) অগ্নিপত্নীবৎ— অনুষ্ঠানে যেমন হবিকে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়, 'ঠিক তেমন ভাবেই পত্নীকে প্রহার করা উচিত, যাতে তার নিজের শরীরের উপর বা সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার না থাকে।' (৭৮) তার যে সম্পত্তির অধিকার ছিল না, অন্য অনেক গ্রন্থ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—এবং এখান থেকে এবং অন্য আরও গ্রন্থ থেকে—পরিষ্কার হয় যে, তার নিজের দেহ তার নিজের নয়। মান্যবর যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, স্ত্রী যদি স্বামীর সম্ভোগ কামনা চরিতার্থ করতে অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী প্রথমে কোমল ভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে, তার পরে উপহার দিয়ে তাকে কিনে নিতে চেষ্টা করবে (অবক্রীণীয়াৎ) এবং তারও পরে স্ত্রী রাজি না হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে বশ করবে।' (৭৯)

বরুণপ্রঘাস যজ্ঞে যজমানের পত্নীকেই প্রকাশ্য ভাবে তার ব্যভিচারের বৃত্তান্ত স্বীকার করতে হত। (৮০) যজমান নিজে যজ্ঞের জন্য দায়ী হলেও তাকে কোনও লজ্জাকর প্রশ্ন করা হত না। বস্তুত যজমানকে দীক্ষার দিনটুকুই শুধু গণিকার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। পরের দিন তাকে পরস্ত্রীর সঙ্গে এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে, এবং যজ্ঞের দিন তার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তাকে এড়াতে বলা হয়েছে। (৮১) পুরুষের যৌনজীবনে বিচুতিগুলির বিষয়ে সমাজের ক্ষমাশীল মনোভাব লক্ষ্য না করে উপায় নেই। কিন্তু সেই সমাজ বিবাহিত নারীর বিচুতির বিষয়ে অবিশ্বাস্যরকম নিষ্ঠুর; তার জন্য বিহিত শাস্তি অত্যন্ত বীভৎস, জুগুঙ্গাজনক এবং তা উচ্চারণ করার পক্ষে বড় বেশি নির্মম। (৮২) এবং এটি যে প্রয়োগ করা হত না, এ রকম মনে করার আমাদের

কোনও কারণ নেই, সাহিত্যে এর অনুল্লেখের কারণ, স্পষ্টতই এর মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে যে কুৎসিত অত্যাচার স্পৃহা, তাই। গৃহে স্ত্রীর স্থান স্বামীর নিচে,(৮৩) সে সব সময়ে স্বামীর অনুগামিনী হবে।(৮৪) স্বামীকে বলা হয়েছে, খাবার পরে স্ত্রীকে উচ্ছিষ্টটি দিতে।(৮৫) এই স্পষ্ট উক্তির কোনও ভাষ্য প্রয়োজন হয় না, এবং তার মধ্যে দিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। পুংসবন নামে গর্ভধারণের যে অনুষ্ঠানটি আছে, তার উদ্দেশ্য পুত্রসন্তান লাভ করা। অথর্ববেদে পুত্রসন্তানের জন্মের জন্য একটি মন্ত্র আছে।(৮৬) স্পষ্টতই সমাজ সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিত পুত্রসন্তানের উপর। 'স্ত্রী সঙ্গিনী, কন্যা অভিশাপ, পুত্র স্বর্গে আলো।'(৮৭) প্রথম অংশটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর, এর ফলে আমাদের বিশ্বাস করতে স্পৃহা হয় যে স্ত্রীকে সঙ্গী হিসেবে দেখা হত। অপর একটি অনুরূপ অংশে আছে, 'স্ত্রী পুরুষের অপরাধ' এটিও সমাজের নারী সম্বন্ধে মনোভাবের বিষয়ে আমাদের আশঙ্কাকে শান্ত করে, কিন্তু এর পরে বলা হয়েছে, 'সুতরাং যতদিন কারও স্ত্রী সংগ্রহ না হয়, তার সন্তান আসে না।'(৮৮) অতএব পুত্রসন্তান লাভের প্রয়োজনেই স্ত্রীর মূল্য। একের পর এক গ্রন্থে তার মানবিক অধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উপরন্তু 'যার স্ত্রী নেই সে যজ্ঞে অনধিকারী।'(৮৯) পুরুষের অধিকার আছে একাধিক পত্নীকে বিবাহ করার, অসংখ্য উপপত্নী রাখার এবং গণিকার কাছে যাওয়ার, স্ত্রীর কিন্তু উপপতি রাখার অধিকার নেই; স্ত্রীর উপপতিকে ধ্বংস করার জন্য উপচার ক্রিয়ার বিধান আছে।(৯০) কিছু কিছু গ্রন্থে অবশ্য স্ত্রীকে প্রতারণা করে অপর রমণীর কাছে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিন্দা করা হয়েছে: 'সে গর্দভের চামড়া দিয়ে নিজেকে ঢেকে ভিষ্কা করবে এবং নিজের অপরাধের কথা ঘোষণা করে ঘুরে বেড়াবে।'(৯১) কিন্তু সাহিত্যে এ রকম প্রায়শ্চিত্তের একটি ঘটনাও বর্ণনা করা হয়নি, যদিও অসতী বা আপাত অসতীর কঠোর-কখনও নির্মম-ভাবে শাস্তি পাওয়ার নিদর্শন আছে।

নারী নিজেই পাপ। কতটা? 'অমৃতকে দেখবে না, অর্থাৎ নারী, কুকুর ও কালো পাখি দেখবে না; অন্যথায় পুণ্য ও পাপ জ্যোতি ও অন্ধকার সত্য ও মিথ্যা মিশে যাবে।' (৯২) 'স্ত্রীলোক রাতে তার স্বামীকে মুগ্ধ করে নিজের ইষ্ট সিদ্ধি করে নেয়।' (৯৩)

এমনকী যজুর্বেদ-এর সময়েও শুনি, 'নারী মিথ্যা, দুর্ভাগ্য, সে মদ বা জুয়ার মতো ব্যসন মাত্র।' (৯৪) গর্ভাবস্থার পূর্বে নারীর জন্য কোনও যজ্ঞকর্মের বিধান নেই, এখনও পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য এবং তার জন্মের পূর্বে ও পরে তার মঙ্গল কামনায় পুংসবন অনুষ্ঠান। যে যজ্ঞে তার উপস্থিতি থাকে, সেখানেও মন্ত্র ছাড়াই তার কাজ অনুষ্ঠিত হয়। বৈদিক সমাজের নারীর প্রতি মনোভাব সবচেয়ে পরিস্ফুট ভাবে প্রমাণিত হয় একটি বেদাঙ্গ সূত্রে '(মাত্র একদিনের কৃষ্ণসাধন) কালো পাখি, শকুনি, নেউল, ছুঁচো, কুকুর, শূদ্র ও নারী হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত।' (৯৫) সামগ্রিক ছবিটা উনমানব এবং সম্পূর্ণভাবে পাপের। তাই তাকে যে নিম্নশ্রেণির জীব বলে গণ্য করা হয় তা কিছু বিচিত্র নয়। অতএব, 'সর্বগুণসমন্বিতা নারীও অপকৃষ্টতম পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।' (৯৬)

সমাজে নারীর স্থান উনমানবীর, তাকে শুধু ভোগের সামগ্রীরূপে দেখা হত। তার দেহ, তার শ্রম তার প্রভুর ভোগের জন্য। তাই তাকে বন্ধক রাখা যেত, কেনা যেত, বিক্রি করা যেত; যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে, যৌতুক হিসাবে বা অতিথির উপহার হিসাবে দানও করা যেত। শাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'নারী সঙ্কোচ আনে।' (৯৭) তাছাড়া, পশু, ভূমি ও নারীর অতিভোগ নয়। (৯৮) সারস্বতস্বস্তয়ন নামক যজ্ঞের দক্ষিণা একটি ঘোটকী এবং একটি সন্তানবতী দাসী। (৯৯) অন্য অনেক যজ্ঞেই নারী দক্ষিণা হত, মহাকাব্যে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নারীদের শ্রেণিভাগ ছিল কুমারী, সধবা, সন্তানবতী বা নিঃসন্তানরূপে। কারা পেত তাদের? পুরোহিতেরা। তারা এত নারী নিয়ে কি

করত? তাদের মধ্যে কারওকে গ্রহণকর্তা ভোগ করত, বাকিদের মধ্যে কারওকে দান করত, কারওকে বিক্রি। কেউ কেউ আবার সমাজের নানা অন্ধকার এলাকায় আঁকাবাঁকা পথে ঘুরে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হত বেশ্যালয়ে।

এর থেকে নারীর যে দ্ব্যর্থহীন চিত্র বেরোয় তাতে নারীকে মূলত উনমানবী হিসাবে দেখা হয়, যার জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে তার যৌবন, রূপ, লাস্য এবং গৃহকর্মে তার শ্রম দিয়ে তুষ্ট করা। সেই পুরুষ ও তার আত্মীয়স্বজনকে তার নম্র হয়ে সেবা করতে হবে, কাজে বা কথায় তাদের কোনও প্রতিবাদ না করে। নিজের শরীরের উপরে তার কোনও অধিকার নেই; তার সম্পত্তি অর্জন বা ভোগ করার অধিকার নেই, এমন কি স্বামীর সম্পত্তিতেও অধিকার নেই।(১০০) সে তো নিজেই একটি সম্পত্তি, কি করে সে কোনও রকমের সম্পত্তি অর্জন বা ভোগ করবে? অবশ্যই কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছিল। অবশ্যই এমন স্বামী ছিল যারা স্ত্রীকে সম্মান করে, ভালবাসে, তার যত্ন নেয়।(১০১) কিন্তু তা তো ব্যতিক্রম; এবং ব্যতিক্রমই নিয়মকে প্রমাণ করে। এবং এই নিয়ম পূর্ণমাত্রায় নারীর মানুষ হিসাবে গণ্য হওয়া ও মানবিক অধিকার পাওয়ার বিরোধী।

বলা হয়েছে, 'সুন্দরী নারী স্বামীর প্রিয় হয়।'(১০২) প্রথমত সব নারী সুন্দর নয়; সাধারণ চেহারার নারী কি স্বামীর প্রেম পেত না? আবার সুন্দরী বধু যখন বয়স, বহু-প্রসব এবং সাংসারিক শ্রমের ফলে তার রূপ হারিয়ে ফেলত, তখন কী হত? এর উত্তরের ইঙ্গিত আছে বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের উচ্চারিত একটি মন্ত্রে: 'এস আমরা মিলিত হই, যেন পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়, যে সন্তানদ্বারা সম্পত্তিবৃদ্ধি হবে।'(১০৩) এই মন্ত্রেই বলা হয়েছে, 'আমি যেন পুত্র, পৌত্র, দাস, শিষ্য, বস্তু, কাম্বল, ধাতু, বহু ভার্যা, রাজা, অন্ন ও নিরাপত্তা লাভ করি।' যখন চিন্তা করি যে, এই মন্ত্র দম্পতির নতুন জীবন শুরুর প্রতীক,

এবং নববধূর উপস্থিতিতেই তা উচ্চারিত হচ্ছে, তখন বহু ভার্যার' জন্য এই প্রার্থনা প্রয়োজনে বিনিময়যোগ্য ভোগ্যবস্তু হিসাবে নববধূর স্থান খুব প্রকট করেই তালে। পরিস্থিতির চাপে যখন তার রূপ বা প্রয়োজনীয়তার অভাব ঘটত, তখন সহজেই তার জায়গায় অন্য কাউকে আনা যেত। তার সন্তানেরা বড় হয়ে যাওয়ার পরও তা ঘটতে পারত; তাদের পিতা একটি তরুণী ও অধিকতর সুন্দরী সপত্নীকে এনে তাদের মা-কে অপমান করতে পারত। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে আমরা সপত্নী বশ করার মন্ত্র পাই। পুরুষের সামাজিক সমৃদ্ধি বিচার হত তার পত্নীর সংখ্যা দিয়ে, যেমন তার পশু বা দাস তার সমৃদ্ধির প্রতীক। যে পুরুষেরা বহু পত্নী রাখার মতো সমৃদ্ধ ছিল না তারা বেশ্যালয়ে যেত; প্রাচীনতম যুগ থেকে সমাজে বেশ্যার উপস্থিতির প্রমাণ সাহিত্যে মেলে। পরিত্যক্তা পত্নী, ধর্ষিতা কুমারী, ক্রীতদাসী এবং লুপ্ততা মেয়েরা তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতে তারাই ছিল নারী সমাজের একটিমাত্র শ্রেণি যারা সরকারি খরচে আনন্দ দিত যা তাদের শিক্ষা-বঞ্চিতা পত্নীরা পারত না। নিজের বাড়ির বাইরে পুরুষদের আনন্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করে সমাজ পত্নীকে এমন এক অন্ধকার কোণে ঠেলে দিয়েছিল, যেখানে সে তার কর্তব্য পালন করত বিনা কৃতজ্ঞতায়, এবং যেখানে তার সামান্যতম ক্রটির কঠোর শাস্তি মিলত। কখনওই ভুলে গেলে চলবে না যে, 'সতী' শব্দটির বিশিষ্ট অর্থে কখনও পুংলিঙ্গ পর্যায় শব্দ নেই। সতীত্ব পুরুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হত না; তা শুধু নারীর একার বিশেষ কর্তব্যকর্ম।

যে প্রশ্নগুলি উত্তর দাবি করে, তা হল: কবে, কেমন ভাবে এবং কেন নারী তার মানবিক অধিকার ও সামাজিক সম্মান হারাল? কারণ বৈদিক যুগের প্রারম্ভে তার কিছুটা সম্মান ছিল। ঋগ্বেদে ঊষসকে সূর্যের পত্নী বলা হয়েছে, সে স্বামীর আগে আগে যায়। (১০৪) এ নিশ্চিত ভাবে বাস্তব সমাজের প্রতিবিশ্ব। তবে কি করে সে স্বামীর ছায়ারূপে তার অনুসরণ করে, কোনও রকম

ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র রহিত হয়ে? এর উত্তর দিতে হলে বৈদিক মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। তারা যাযাবর ও পশুপালক জাতি থেকে কৃষিতান্ত্রিক জীবনে স্থিতিলাভ করল, সেখানে উন্নততর প্রযুক্তি ও লোহার লাঙলের ব্যাপক ব্যবহার—যা অর্বাচীন বৈদিক যুগে দেখা যায়—তার ফলে, এবং মধ্যপ্রাচ্য, গ্রিস ও রোমের সঙ্গে নৌবাণিজ্য সূত্র পুনর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সংখ্যালঘু এক শ্রেণির হাতে প্রচুর উদ্ধৃতি ধন সংগৃহীত হল। এই সংখ্যালঘু শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা ছিল এই উদ্ধৃত্ত তার প্রকৃত সন্তান-সন্ততির হাতে, অর্থাৎ যে পুত্রদের সে তাঁর পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন করেছে, তাদের হাতে দিয়ে যাওয়ার। সন্তানপরম্পরা নির্দিষ্ট করতে এবং পুত্রদের তার উরসপুত্র বলে চিহ্নিত করতে স্ত্রীর অন্য পুরুষ সঙ্গ নিবৃত্ত করা আবশ্যিক ছিল। এটি সুনিশ্চিত করা যেত শুধুমাত্র আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করে। একটি আনুষ্ঠানিক আপাতযুক্তি অবরোধের কারণস্বরূপ দেখানো হয়েছে: ‘পত্নীকে পুরুষসঙ্গ করা থেকে নিরুদ্ধ করতে হবে, কারণ পরলোকে শুধুমাত্র জন্মদাতাই পিণ্ড-তর্পণাদি লাভ করে, স্বামী নয়।’ আসল কারণ অবশ্যই ইহলৌকিক। পিতা পুত্রকে সম্পত্তি দান করার আগে অবশ্যই নিঃসন্দেহে জানবে, সে তার নিজেরই পুত্র, অপর কারও নয়। এরই ফলে নারী বন্দি হল অবরোধে, যেখানে অনাত্মীয় পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

এই সব ঘটনার আগেই নারী তার শিক্ষার অধিকার, জীবিকার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, এমনকী নিজের শরীরকে আপনি বলার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। নারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার স্বামীর সম্পত্তি। আহার বেশভূষা এবং আচ্ছাদনের বিষয়ে সে তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে। মনে রাখতে হবে, ‘ভার্যা’ ও ‘ভৃত্য’ শব্দ দুটি একই ‘ভূ’ ধাতু থেকে নিম্পন্ন (অর্থাৎ ভরণ করা), এবং মূলগত ভাবে তাদের বিষয়ে একই ধারণা। নিছক জীবিকার প্রয়োজনে স্বামীর উপর নির্ভরশীল নারীর অর্থনৈতিক মূল্য এখন কোনও

ভাবেই আর্থিক দিক থেকে নির্ধারণ করা যায় না, কারণ অর্থনৈতিক দিকে তার গৃহকর্ম কোনও উপার্জন আনে না, তার ভূমিকা এখন শুধুই প্রজননমূলক ও সহায়কের। এর ফলে তাদের অবনমন তাদের নিজের কাছে এবং সাধারণ ভাবে সমাজের কাছে যুক্তিসিদ্ধ হয়েছে। উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে নারীকে সরিয়ে দেওয়ার ফলে তাকে সহজেই বোঝানো যেত যে, তার স্বামীই তার ভরণপোষণ যোগায়। তার গৃহকর্ম প্রচলিত অর্থে 'কাজ' নয়, যদিও তা পুরুষের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিক। বিবাহের সময়ে যেহেতু তাকে দান করা হয়েছে 'সমগ্র পরিবারের' হাতে, সে সমগ্র পরিবারের দায়ায় আছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, কারণ প্রায়ই তাকে আরও কমবয়সি, আরও সুন্দরী সপত্নীর সঙ্গে বাস করতে হয়েছে।

দাম্পত্য জীবনে আনুগত্যের একপেশে ব্যাখ্যা ছিল; স্ত্রী বিবাহের শপথের প্রতি অনুগত থাকবে, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে পুরুষ তা বিনা শাস্তিতে অবহেলা করতে পারে। নারীর বিবাহের কর্তব্যের অংশবিশেষ হচ্ছে পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া, এবং সে যদি এই কর্তব্য পালন করতে না পারে। তবে সমাজের অনুমোদন নিয়েই তাকে ত্যাগ করা যায়—শাস্ত্রের অনুশাসন মতে। ধর্মগ্রন্থে এমনও বলা হয়েছে, অসতী স্ত্রীকেও ত্যাগ করা উচিত নয়। অন্যান্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে, স্বামী পরিত্যক্ত মায়ের জন্যও পুত্র তর্পণাদি করবে। এখানে এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রগ্রন্থে স্বামী পরিত্যক্ত নারীর বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়।

অশিক্ষিতা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীর একমাত্র গতি দাসী বৃত্তি করা অথবা বেশ্যা হওয়া; কোনও ক্ষেত্রেই সম্মান বা সামাজিক নিরাপত্তার কোনও অবকাশ নেই। যদিও স্বামী বা পিতার উদারতায় কিছু কিছু নারী শিক্ষা পেয়েছে, সাধারণ ভাবে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিতই ছিল। অতএব তারা স্বাধীন ভাবে উপার্জন করার মতো জীবিকা থেকেও বঞ্চিত ছিল। তাছাড়া দক্ষিণ ও পূর্বদিকে আর্যদের আক্রমণের ফলে বিস্তার ঘটায় অনেক বন্দি দাস হয়ে এসেছিল—তারাই অধিকাংশ গৃহকর্মের ভার নেয় এবং চাষবাস ও

পশুপালনে সাহায্য করে। এখন আমরা দুটি মাত্র শ্রেণি পাচ্ছি, 'অজবল্ল' এবং 'পেসসবল্ল', হেরেনভোক ও হেলট, প্রভু ও ভৃত্য। এর প্রমাণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের জৈন গ্রন্থ অংগবাজা তে পাওয়া যায়। সুতরাং উচ্চতর শ্রেণির নারীরা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকেই উৎপাদনমূলক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, যে শ্রম ধনমূল্যে পরিণত করা যায়। এতে তাদের এক অবনমনের অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। তারা তখন পুরুষের অধীন: পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্র, যে আহাৰ্য সংগ্রহ করে, যাকে তাদের তুষ্ট রাখতে হয়। নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ছিল, কিন্তু ব্যতিক্রমই নিয়মের প্রমাণ। অর্থনৈতিক অবনমন, যা শিক্ষাগত বিভেদের সঙ্গে যুক্ত, একাধারে নারীর সামাজিক অবস্থানকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছিল।

পত্নী যখন স্বামীর আগে চলত, তার থেকে সমাজ অনেক দূরে চলে এসেছে। মনে পড়ে, কাটিয়ামা ভারতবর্ষে নারীযোদ্ধার উল্লেখ করেছেন (আনুমানিক ৩২৭ খ্রি.পূ.); এটি অর্বাচীন বৈদিক বা সূত্র যুগের সঙ্গে খাপ খায়। এর কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই নারী সম্পূর্ণ ভাবে তার মানবিক সম্মান হারিয়েছে। যদিও ভান করা হয় যে তার সম্মান ছিল, লিখিত তথ্য অন্য রকম প্রমাণ দেয়। সে কুমারী হিসাবে সাহিত্যে উপস্থিত নেই, বিধবা হিসাবে তাকে এক বিষন্ন অন্ধকার অস্তিত্বে ঠেলে দেওয়া হয়, তাকে নাগরিক বা সমাজের দায়িত্বশীল

অংশ হিসাবে দেখা যায় না; কন্যা বা ভগ্নি হিসাবেও তাকে তত দেখা যায় না। তাকে একটি মাত্র ভূমিকাই দেওয়া হয়, পত্নী ও মাতা রূপে, বিশেষ পুত্রসন্তানের মাতা। সেখানেও তার অস্তিত্ব না থাকারই মতো, কারণ তার ব্যক্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, তার চিন্তা ও অনুভূতি, তার আশা ও স্বপ্ন সমাজ সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে। সে বেঁচে আছে শুধু তার স্বামীকে তুষ্ট করতে এবং তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সেবা করতে। আমাদের সামনে এই পরিণতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক পটভূমিকা অনুসন্ধান

করার কাজ রয়েছে। নিঃসন্দেহে খ্রিস্টপূর্ব শেষ সাহস্রাব্দের শেষ কয়েকটি শতক এবং খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম কয়েকটি শতাব্দীতে বিদেশি আক্রমণে এ বিষয়ে কিছুটা অবদান আছে। জাতিগত সংকর এবং বর্ণপ্রথার বেড়ে ওঠা জটিলতাও বৈদিক ভারতে নারীর অবস্থার অবনমন ঘটাতে সাহায্য করেছে। আমাদের প্রয়োজন সার্বিক ভাবে প্রত্যেকটি গঠনমূলক বিষয়ে গবেষণা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, যাতে ছবিটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

প্রাচীন ভারতে মাতৃস্ব

আলতেকার লিখেছেন, 'মাতৃস্বের উপরে দেবস্বের আরোপ ভারতবর্ষে যেমন উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এমন আর কোথাও নয়।'(১) কিন্তু দেবস্বের আরোপ সমাজে নারীর অবস্থানের বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না-ও করতে পারে—তা হয়তো কেবলমাত্র ঋতিপূরণ, মায়ের প্রতি সমাজের নিষ্পৃহতার ঋতিপূরণ। তবে প্রাচীন ভারতের সমাজজীবনে মাতৃস্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মাতৃস্ব ছিল আবশ্যিক; একটি মেয়েকে শেখানো হত ভাল স্ত্রী, ভাল মা হতে। তাকে 'একাধিক পুত্রের জননী' হওয়ার জন্য আশীর্বাদ করা হত। মনে পড়ে অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকের চতুর্থ অঙ্কে গর্ভবতী মেয়েটিকে তপস্বিনীরা আশীর্বাদ করছেন, সে যেন বীরপ্রসবিনী এই দুর্লভ সম্মান লাভ করে। গর্ভাধান, গর্ভধারণ, প্রসব এবং প্রসব উত্তর অবস্থাগুলির আনুষ্ঠানিক দিক দেখা যাক।

বিবাহ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরে নবদম্পতি প্রার্থনা করত, অর্থাৎ বধু নীরবে সমর্থন করত স্বামীর উক্তি ঃ 'এস, আমরা মিলিত হই, যাতে আমরা

পুত্রসন্তান লাভ করতে পারি, সম্পত্তির বৃদ্ধির প্রয়োজনে পুত্রলাভ করতে পারি।’ বর আরও প্রার্থনা করত, ‘পুত্র, পৌত্র, দাস, শিষ্য, বস্তু, কাম্বল, ধাতু, পত্নী, রাজা, অন্ন, নিরাপত্তা’।(২) বিবাহের সময়ে বধুর পক্ষ থেকে প্রার্থনা হত, সে যেন কখনও শূন্য কোলে না থাকে (অশূন্যোপস্থ), অর্থাৎ তার কোলে যেন সব সময়ে সন্তান থাকে। অতএব বিবাহ মূলত পুত্রসন্তানের প্রয়োজনে এবং যেহেতু একটি মাত্র পত্নী যে পুত্রসন্তানই প্রসব করবে। তার স্থিরতা নেই, তাই বর কোনও কুঁকি নেয় না। সে বহু পত্নীর প্রার্থনা করে—তার নববিবাহিত বধুর উপস্থিতিতেই।—যে বধুর সামাজিক ভাবে প্রস্তুতি ছিল এ রকম প্রার্থনা মেনে নেওয়ার, কারণ পুত্র তো বংশরক্ষা এবং সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গর্ভাধান নামক অনুষ্ঠানে পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা আছে; অথর্ববেদ-এ(৩) পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা। পরবর্তীকালের এক উপনিষদে বিভিন্ন রকম সন্তান-স্ত্রী পুত্র, পণ্ডিতা বুদ্ধিমতী কন্যা, ইত্যাদি লাভের জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে কি কি খাওয়াবে তার নির্দেশ আছে।’(৪) প্রার্থনার শুরু: ‘এস আমরা দুজনে মিলে পুত্রসন্তান লাভের জন্য চেষ্টা করি।’ স্ত্রী এখানে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চেষ্ট গ্রহীতা; তার কোনও কথা নেই। তারপরে স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার দুটি অনুষ্ঠান করতে হয়: পুত্রসন্তান প্রসবের জন্য পুংসবন এবং সিঁথি ভাগ করার জন্য সীমস্তোল্লয়ন। পুংসবন নামটি থেকেই বোঝা যায় এটা পরিস্ফুট ভাবেই পুত্রসন্তানের জন্মের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। সব প্রার্থনাগুলিই অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে কন্যাসন্তানের জন্মে বাধা দেয়, যাতে শুধুমাত্র পুত্রসন্তানই জন্মায়।’(৫) সীমাস্তোল্লয়ন আরও জটিল একটি অনুষ্ঠান। যে নারীর স্বামী ও সন্তান বেঁচে আছে তারা গর্ভিণীর সামনে বীণা বাজাবে, গান গাইবে ও নাচবে। রান্না করা ভাতের একটি পিণ্ড তার সামনে ধরা হবে এবং তার স্বামী জিজ্ঞাসা করবে: ‘কি দেখছ?’ উত্তর, ‘সন্তান’। আশীর্বাদ, ‘বীরপ্রসবিনী হও, অবিধবা হও।’(৬)

ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্র-তে পড়ি, রান্না করা ভাতের তিনটি পাত্র তার সামনে রেখে জিজ্ঞাসা করা হয়: 'কী দেখছ?' সে উত্তর দেয়: 'পুত্র ও পশু।' (৭) আর একটি বৈচিত্র্য পাওয়া যায় জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র-তে, যেখানে একটি কঁচুসার পাত্রে জল ভরে তাতে এক টুকরো সোনা রাখা হয়। বন্ধুকে প্রশ্ন করা হয়: 'কী দেখছ?' সে বলে: 'সন্তান, পশু, আমার জন্য সৌভাগ্য ও আমার স্বামীর জন্য দীর্ঘ জীবন!' (৮) শাস্ত্রে কোথাও বধূর বা ভাবী মায়ের দীর্ঘ জীবনের জন্য কোনও প্রার্থনা নেই। এবং এই সময়ে প্রসবোত্তর মৃত্যুর হার এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। শুধু স্বামীর দীর্ঘজীবনের কামনাই শুনি। এর ব্যাখ্যা হয়তো প্রার্থনায় পল্লীশব্দের বহুবচনে পাওয়া যায়; যদি সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে পল্লীর মৃত্যু হয়, তবে আর একটি বিবাহ করা চলবে, কারণ শাস্ত্রে নির্দেশ আছে, স্ত্রী সংকারের পরদিনই স্বামী বিবাহ করবে। (৯) সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র নির্দেশ দেয়, যে নারীর স্বামী-সন্তান বেঁচে আছে সে নববধূকে নিরামিষ খাদ্য ও মদ দেবে এবং তারপরে তারা গান গাইবে, বীণা বাজাবে ও নাচবে। এ সবই পুত্রসন্তানের জন্মের প্রত্যাশায়। (১০) ঋগ্বেদ-এ গর্ভধারণের বিষয়টিকে নাম দেওয়া হয়েছে উদরামাময়ং। (১১) গর্ভের চতুর্থ মাসে স্বামী শজারুর কঁটা দিয়ে তার চুল আঁচড়ে দেয়—ভূমিতে হলকর্ষণের প্রতীক এবং জোড় সংখ্যার একগুচ্ছ কঁচা ফল দেয়, যা অসম্পূর্ণ ভ্রণের প্রতীক। তারপর বীণা বাদন ও নাচ হয়, যার ফলে আশ্বলায়ন বলেছেন, ভ্রাণ ধ্বংসকারিণী কিছু রাক্ষসীকে তাড়ানো হয়। তারপর তাকে ঘূতের দিকে তাকাতে বলে প্রশ্ন করা হয়: 'কী দেখছ?' সে উত্তর করে: 'সন্তান।' (১২)

অপর গুরুত্বপূর্ণ গর্ভধানের অনুষ্ঠান হল পুংসবন। তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদ-এ। (১৩) পরবর্তী সাহিত্যে অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খগুলি পাওয়া যায়। সেখানে আমরা জানতে পারি, গর্ভের তৃতীয় মাসে গর্ভবতী একদিন উপবাস করে থাকলে তারপর তার স্বামী তাকে খাবার দেয়; ভাত, দুটি সিম,

এক দানা যাব, এক এক গ্রাস দইয়ের সঙ্গে। তারপরে সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে: 'তুমি কী পান করবে?' সে উত্তর দেয়: পুংসবন।।(১৪) কখনও কখনও গর্ভাবস্থায় অনবলোভন নামে একটি ছোট অনুষ্ঠান করা হয়; তার উদ্দেশ্য গর্ভপাত নিরোধ করা। আশ্বিনায়ন গৃহ্যসূত্র-তে এর বর্ণনা আছে।(১৫)

প্রসবের সময় যখন এগিয়ে আসে, জন্মের ঠিক পূর্বে শোষ্যস্ট্রীকর্ম নামে একটি অন্তিম অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। এটি মনে হয় অত্যন্ত প্রাচীন অনুষ্ঠান, এবং নবাগতের আগমনের সময়ে পরিবার ও সমাজের মধ্যে যে নাটকীয় টান টান ভাব, তার চিহ্ন বহন করে। প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী স্ত্রীর উপরে জল ছেটাতো, এবং প্রসব হওয়া পর্যন্ত তা ক্রমান্বয়ে চালিয়ে যেত।(১৬)

শিশুর জন্মের পরে পরিবারের প্রধান লক্ষ্য মনে হয় দুষ্ট প্রেতদের দূরে রাখা: তারা নবজাতকের ক্ষতি করে বা তাকে নষ্ট করে। জাতকর্ম অনুষ্ঠানে সূতিকাগ্নি অর্থাৎ জন্মসংস্কারের জন্য বিশেষ ভাবে আহিত অগ্নিতে সর্ষে ও তুষ আহতি দেওয়া হত। এই আহতি এগারো বার দিতে হত।(১৭) তখন পিতা হোম করত এবং শিশুর সেই গোপন নাম অস্মৃটি ভাবে উচ্চারণ করত, যা শুধু পিতামাতাই জানে।(১৮) তার পরে পিতা সুবর্ণ ও অন্যান্য মাপুলিক দ্রব্য দিয়ে শিশুর মুখ ছুঁত এবং তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে ঘি ও মধু খাওয়াত। তার পরেই কেবল শিশুকে স্তন দেওয়া যেত।

গর্ভিণী নারীর খাদ্যের প্রয়োজন বিষয়ে কিছুটা সচেতনতা ছিল, কারণ আমরা শুনতে পাই, নববধূ, কুমারী কন্যা, রোগী ও গর্ভবতী নারীকে অতিথিরও আগে খেতে দেবে।'

পুত্রের জন্ম থেকে তার শিক্ষালাভের উপনয়ন পর্যন্ত বহু ছোট ছোট অনুষ্ঠান থাকত। প্রথম ছিল বিষ্ণুবলি, তার পরে মেধাজনন তার পরে নামকরণ। এর

পরে পিতা পুত্রকে ধরে গৃহের বাইরে নিয়ে আসে (নিষ্ক্রমণ); এর ফলে যেন তার বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংস্রব ঘটে। শিশুর প্রথম ভাত খাবার অনুষ্ঠান অন্নপ্রাশন; বর্ষবর্ধন তার দীর্ঘায়ু কামনা করে। প্রথমবার ন্যাড়া হওয়া চোল এবং শিশু শিক্ষা শুরু করলে বিদ্যারম্ভ। এই সব অনুষ্ঠানেই পিতা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে, মাতা শুধুমাত্র পটভূমিকায় থাকে। সে কোনও অনুষ্ঠানেই কিছু করেও না, বলেও না।

শিশুকে মানুষ করার ব্যাপারে তার ভূমিকা কী? কিছুই প্রায় শোনা যায় না, শুধু তির্যক ভাবে বলা হয়, চতুর্মাস্যের বরুণপ্রঘাস যজ্ঞে পুরোহিত যজমানের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, কার সঙ্গে ব্যভিচার করেছ?'(১৯) 'সেই স্ত্রী বকুণের শাসনীয়া, যে এক পুরুষের হয়েও অপর পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। পাছে সে হৃদয়ে শূল নিয়ে যাগ করে. সে যা স্বীকার করে না তা তাঁর আত্মীয়দের ক্ষতি করে।' (২০) সুতরাং সন্তানের মাতা সর্বসমক্ষে নিজের ব্যভিচার স্বীকার করে, যাতে তার স্বামী ও সন্তানদের ক্ষতি না হয়। 'সে মদ্যপান করে না; তার পুত্রদের জন্য এই তার ব্রত।' (২১) শিশুর লালন-পালনে মায়ের আনুষ্ঠানিক ছাড়া কোনও ভূমিকা যে ছিল তার কোনও ইঙ্গিত আমরা পাই না। আসলে শিক্ষা, শাসন, তদারক এবং পেশাগত বিদ্যা সম্পূর্ণভাবে পিতার অধীন। মায়ের একমাত্র অবদান কিছু ব্রত ও অনুষ্ঠান যা পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে গর্ভধারণ, প্রসব এবং কিছু প্রসবোত্তর অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়—সবই পিতার কর্তব্য। তারপর উপনয়ন হলে পুত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে পিতার যদি পিতা পেশাদার শিক্ষক হন।—না হলে গুরুর শিষ্য হয়ে যায়।

বৈদিক সাহিত্যেও পুত্রসন্তানের প্রতি সমাজের পক্ষপাত অত্যন্ত প্রকট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। বন্ধ্যা নারীকে পরিত্যাগ করা যায় (পরিবৃত্তি বা পুরিবৃত্তি),

কারণ নিষ্কৃতি তাতে ভর করেছে।'(২২) প্রজনন বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব প্রমাণের ফলে একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এক অশুভ ধারণা যা কিনা অত্যন্ত কুৎসিত ও সম্পূর্ণ অশুভ, যার বিশেষ কাজ হল সমস্ত রকম শুভ বিষয়কে ধ্বংস করা।(২৩) বন্ধ্যা নারীকে দশ বছর পরে পরিত্যাগ করা যেত; শুধু কন্যার যে জন্ম দেয় সেই নারীকে বারো বছর পরে, এবং মৃত্যুবৎসা মাকে পনেরো বছর পরে।(২৪) পুত্রহীন পত্নীর স্বামীর আবার বিবাহ করা উচিত।(২৫) ভাল নারীর লক্ষণ, 'যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্রের জন্ম দেয় এবং কখনও স্বামীর কথার উত্তর করে না।'(২৬)

পরবর্তী ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে সন্তানকামী নারীর জন্য বছরতের কথা বলা হয়েছে। ততদিনে নারীর সন্তানদাত্রী এক সম্পূর্ণ দেবীমূর্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে—তিনি ষষ্ঠী।(২৭) নারীদের ষষ্ঠী বিষয়ক ব্রতের উদ্দেশ্য তাদের গর্ভধারণের ক্ষমতা বাড়ানো, কারণ তিনি শিশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ দিনে সূচিকাগৃহে তাঁর পূজা হয়। তিনি সন্তান দেন এবং তাদের রক্ষা করেন।(২৮) তাকে তুষ্ট করতে নানা অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে, যাতে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদের মঙ্গল করেন, কারণ শিশু যত ছোট হবে অন্তরিক্ষচারী অসংখ্য বুভুক্ষু প্রেতি তাকে গ্রাস করার সম্ভাবনা ততই বেশি।(২৯) গর্ভস্থ শিশু সবচেয়ে ছোট, লুণাকরে আছে তাই তার বিপদের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। মানর গৃহ্যসূত্র-তে ষষ্ঠীকল্প (৩:১৩:৬) এবং বিনায়ককল্প (২:১৪) এই প্রেতগুলিকে দূর করে শিশুর মঙ্গল বিধান করে।

গর্ভধারণ, নির্বিঘ্নে পুত্র প্রসব ও তার নিরাপত্তা ও দীর্ঘায়ুর জন্য অনেকগুলি ব্রতের নির্দেশ আছে। তাই সেখানে মহাষষ্ঠী ব্রত আছে, সন্তানের জন্য কৃষ্ণাষ্টমী, আট পুত্রের জন্য লোকেশ্বরী বা কোটীশ্বরী, জীবিত পুত্রের জন্য জীবৎ পুত্রিকষ্টমী। বারো বছর ধরে পালনীয় জ্যেষ্ঠ ব্রত আছে; জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের সময়ে মেয়েরা সারা রাত জেগে জ্যেষ্ঠা দেবীর মূর্তিকে পূজা করে।

যে নারীর সন্তান মারা যায় অথবা যার দরিদ্র পুরুষের ঔরসে একটিমাত্র পুত্র আছে, এই ব্রত তারই জন্য।(২৯) হেমাঙ্গি পুত্রলাভের জন্য দুর্বাষ্টমীর নির্দেশ দেয়।'(৩০) হেমাঙ্গিতে পুত্রলাভের জন্য নাগব্রত আছে'।(৩১) পিতৃব্রতে পুত্রের পিতৃস্বই পুরস্কার।' আরও পরিস্ফুট পুত্রকাম,(৩৩) পুত্রবিধি, পুত্রপাণ্ডি,(৩৪) পুত্রীয়।(৩৫) এছাড়া ছোটখাট আরও অনুষ্ঠান আছে, যেমন কৌমব্রত, মরুদ্বন্দ্বত, মঙ্গলগৌরী, রুক্ষিন্যাষ্টমী, বরাহদ্বাদশী, বিষ্ণু, দেবকী, ব্রতরাজতৃতীয়া, শনি-প্রদোষ, সর্ষপসপ্তমী, সূর্য-সূর্য্যনাকৎ-সপ্তমী সবই ওই একই উদ্দেশ্যে।'(৩৬) মাতৃব্রতে মৃত্যুবৎসা বা একটি সন্তান আছে যার এ রকম নারীর মাতৃকার পূজার বিধান আছে; শ্রাবণকৃত্য এমন নারীর যার সন্তান শৈশবে মারা যায়। সংঘাতক ব্রত স্বামী ও পুত্রদের সঙ্গে বিচ্ছেদ রোধ করার জন্য। এগুলি এবং সহস্র সংখ্যক আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ষষ্ঠীপূজার জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে।

বন্ধাস্থের অপবাদ এড়াবার যে তীর বাসনা, সেটি সর্বজনীন ঘটনা। সারা পৃথিবীতে এবং যুগ থেকে যুগান্তরে মেয়েরা পুত্র কামনা করেছে এবং অবন্যাস্থি ঘোচাবার জন্য তপস্যা করেছে; ব্রত পালন করেছে, পূজা করেছে, প্রার্থনা করেছে। ভারতবর্ষে এই ব্রতগুলি সময়ের সঙ্গে সংখ্যায় বেড়েছে; পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থে পুত্রসন্তান ধারণ করা ও প্রসব করার জন্য আরও অধিকসংখ্যক বিধান আছে।

যে কোনও আদিম জাতির মানুষের মতো ভারতীয়রাও মনে করত যে জগৎটা বিশেষ করে অন্তরীক্ষা ও পাতাল ভূত-প্রেত-পিশাচাদিতে পরিপূর্ণ-তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে জীবিত প্রাণীদের ক্ষতি করা। কিন্তু তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য লুণ ও নবজাত শিশু; এই প্রেতগুলির অনেকেই এদের ভক্ষণ করে পুষ্ট হয়। যাতে তারা ক্রম ও নবজাতকের ক্ষতি করতে না পারে, তাই

সহস্র সংখ্যক বিচিত্র ব্রত আবিষ্কার করা হয়েছিল; ওষধি, ফল, মূল, ধাতু, প্রভৃতি নানা কার্যকর পদার্থ এই সব ব্রতে ব্যবহার করা হত; 'শামান'রা গোপন মন্ত্র আওড়াত। কিন্তু এত সব সত্বেও যখন মা মৃতসন্তান প্রসব করত অথবা গর্ভধারণই করতে পারত না, তখন তাকে বন্ধ্যা বা গর্ভধারণের পক্ষে অত্যন্ত অশুচি বলে অপরাধী করা হত। বোঝাই যায়, নির্বিঘ্ন প্রসবের পর এই কবচ প্রভৃতি এবং ব্রতগুলি মায়ের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তা সত্বেও যে মায়ের সন্তানেরা দীর্ঘায়ু হত, তাকে সম্মান করা হত।

প্রেতে বিশ্বাস তার যুক্তিযুক্ত অন্ত পর্যন্ত টেনে নেওয়া হত না, যার ফলে অভাগিনী বন্ধ্যা নারী বা যার সন্তান শৈশবে মারা যায় যে দোষমুক্ত হতে পারে। পুরুষের বন্ধ্যাস্থি আবছা ভাবে জানা ছিল, নিয়োগ প্রথা থেকে যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু 'বন্ধ্যা' পুরুষ কখনও দোষের ভাগী হত না। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে নিঃসন্তান রাজাদের কথা শোনা যায়, কিন্তু অশুভতর কোনও ইঙ্গিত সেখানে নেই। কৃষিকেন্দ্রিক মানুষ হিসাবে প্রাচীন ভারতীয়রা জানত যে মরা বীজ উর্বর ক্ষেত্রে ফলবে না; কিন্তু তারা সন্তানহীনতার এই দিকটা সম্বন্ধে রহস্যময় নীরবতা পালন করেছিল। সব সময়েই অপ্রসবের জন্য নারীকেই দায়ী করা হত। অবশ্যই প্রেত-পিশাচন্দের-ধ্বংসকারী অতিপ্রাকৃত শক্তির আবিষ্কারের ফলে কিছুটা দোষ স্বালন হত এবং তাদের কাছ থেকে বিপদ এড়াতে ব্রতের বিধান করা হত।

যদিও অবন্ধ্যাস্থি প্রধান ভাবে কাম্য ছিল, কিন্তু সেটাই শুধু এখানে যথেষ্ট নয়। পুত্র কন্যার চেয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। সোমযোগের সেই প্রাচীন যুগেও একটি অনুষ্ঠানে কিছু যজ্ঞের বাসন তুলে ধরা হত, কতগুলি আবার নীচে রাখা হত। তেমনই জন্মের সময়ে পুত্রদের উঁচুতে তুলে ধরা হবে, কন্যাদের মাটিতে শোয়ানো হবে। বলাই বাহুল্য, এটি সামাজিক বাস্তবের

আনুষ্ঠানিক প্রতিফলন। তাই শুধু কন্যার মায়েদের যে সামাজিক ভাবে পুত্রের
মায়ের চেয়ে নিচু চোখে দেখা হবে, তা বিচিত্র নয়।

কিন্তু মাতৃস্বলাভের পরই মা-কে ঠেলে দেওয়া হত। পিছনে, অন্তত পরের
প্রসব পর্যন্ত। সে পূজা করতে পারে, আহুতি দিতে পারে, সন্তানদের স্বাস্থ্য,
দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গলের কামনায় ব্রতপালন করতে পারে, কিছু কিছু স্বাদু খাদ্য
পানীয় পরিত্যাগ করতে পারে। (৩৭) কিন্তু এ ধরনের নেতিবাচক এবং
আপাত নিষ্ক্রিয় আচরণ ছাড়া মা হিসাবে তার ভূমিকা ধর্মগ্রন্থে আমাদের
মনোযোগ আকর্ষণ করে না। বাড়ির গৃহিণী হিসাবে নিঃসন্দেহে সে আহার্যের
তদারকি করত এবং সম্ভবত স্বামী, শ্বশুরকুলের আত্মীয় ও সন্তানদের
পরিবেশনও করত। কোনও কোনও মা পরিবারের জন্য রান্নাও করত এবং
সেই ভাবে সন্তানদের পুষ্টির বিষয়ে সরাসরি যুক্ত ছিল। সে সম্ভবত সন্তানদের
পোশাক-আশাক, খেলনা, গহনা ও অন্যান্য সম্পত্তির দায়িত্বে ছিল। রোগের
সময়ে পিতা নয়, সে-ই তাদের সেবা করত এবং তাদের আরামের ব্যবস্থা
করত। কিন্তু এ সবই অনুমান, কারণ শাস্ত্র এ বিষয়ে নীরব। যদিও সব শাস্ত্রই
শুধু পুত্রের কথাই বলে, মা অবশ্যই নিরপেক্ষ ভাবে সব সন্তানের প্রয়োজনই
মোটাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা স্পষ্ট যে সে পুত্রের প্রতি সামাজিক
পক্ষপাতের শরিক ছিল। তার সমস্ত সামাজিক সম্মান নির্ভর করত পুত্রের
জননী হওয়ার উপরে।

এতৎসত্ত্বেও পিতার তুলনায় মাতার কন্যার চেয়ে পুত্রকে পছন্দ করার কারণ
কমই ছিল, যদি না এমন হত যে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত না হয়ে সামাজিক
এবং এই কারণে নিয়ন্ত্রিত এবং প্রথাগত। পিতার সম্পত্তির মালিকানা ছিল।
সে চাইত। তার নিজের (অর্থাৎ ঔরস) পুত্রকে সম্পত্তি এবং সম্ভবত কাজ,
ব্যবসা বা পেশা দান করে যেতে; মায়ের সম্পত্তির মালিকানা ছিল না, এবং
মনে করতে ভাল লাগে যে অনুভূতির দিক দিয়ে তার পছন্দ ছিল মেয়ে-খুব

অল্পদিন, বিবাহ পর্যন্ত, যার সঙ্গে সে উপভোগ করতে পারবে। তাছাড়া তার অনুভূতি ও কল্পনা দিয়ে সে কন্যার মধ্যেই নিজেকে দেখতে পাবে। পরবর্তী সাহিত্যে আমরা মাঝে মাঝে দেখি মেয়ের সুখের জন্য মা বাবাকে অনুন্নয়ন করছে। কিন্তু মূলত সমাজ কন্যাকে দেখত অভিশাপরূপে। 'পত্নী বন্ধু, কন্যা দুঃখের আধার, পুত্র স্বর্গের আলো', (৩৮) অথবা 'পুত্র নিজস্বরূপ, পত্নী বন্ধু, কন্যা পুরুষের দুঃখমাত্র।' (৩৯)

যেহেতু রুচির ব্যতিক্রম ঘটে, কোনও কোনও পিতা কখনও কখনও বুদ্ধিমতী এবং পণ্ডিত কন্যার কামনা করত। তাই আমরা একটি অনুষ্ঠানের কথা পড়ি: 'যে চায় তার কন্যা পণ্ডিতা হোক, সে তিল দিয়ে ভাত রাধবে এবং দু'জনে তা খাবে।' (৪০) মনে করলে মজা লাগে যে, শঙ্করাচার্যের টীকায় পণ্ডিতা শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 'গৃহকর্মের ব্যাপারে নিপুণা'। ফলে কন্যাদের শাস্ত্রাধ্যয়ন বিষয়ে প্রচলিত নিয়মের পোষকতা করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি মিথ্যা, পঞ্চপাতদুষ্ট এবং ভ্রান্ত; পণ্ডিতা শব্দটি গৃহকর্ম বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়নি।

মায়ের পুত্র সম্বন্ধে মনোভাব বা সম্বন্ধ বিষয়ে কোনও বিবরণই তাই আমরা পাই না। সব শাস্ত্রই কিন্তু 'পুত্র প্রিয়ের চেয়েও প্রিয়তর' (৪১) নিয়েই ব্যাপ্ত। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'পুত্র পুরুষের ধন।।' (৪২) শাস্ত্রগুলি একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুত্রের উপকারিতার প্রশংসা করেছে। 'পুত্র দিয়ে পৃথিবী জয় করা যায়, পৌত্র দিয়ে অমৃতলাভ করা যায়।' (৪৩) পুত্র জন্মালেই পিতা পূর্বপুরুষের ঋণ থেকে মুক্ত হয়।' (৪৪) পুত্র মাতার কাছে কতখানি তা স্পষ্ট হয় যখন কুন্তী পুত্রদের অনুপস্থিতির জন্য আক্ষেপ করেন: মাধব! বৈধব্য, সম্পদহানি বা শত্রুতা কিছুই আমাকে তত দুঃখ দেয় না। যা দেয় পুত্রগণের বিরহ। (৪৫)

পিতামাতা সন্তানদের ভালবাসে, কিন্তু বিপদের সময়ে যখন তাদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না তখন তাদের দওক নেওয়ার জন্য অপরকে বিলিয়ে দেয়। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পিতামাতা দুজনে অথবা তাদের মধ্যে একজন এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। (৪৬) অপর এক গ্রন্থে বলা হয়েছে পিতা অথবা মাতা পুত্র দওক নিতে পারে। (৪৭) অতএব পুত্রের ভাগ্যবিষয়ে অত্যন্ত গুরুতর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুঁথিগত ভাবে মায়ের কিছু বলার আছে। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে দেখা যায়, এক পিতাই এ রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পুত্রের কাছ থেকে সম্মান মাতার প্রাপ্য। অধ্যাপক দশ শিক্ষকের সমান, পিতা অধ্যাপকের সমান এবং মাতা সম্মানে সহস্র পিতার অধিক। (৪৮) 'মাতাকে শ্রদ্ধা করলে পৃথিবী জয় করা যায়, পিতাকে শ্রদ্ধা করলে অন্তরীক্ষ জয় করা যায় এবং গুরুকে শ্রদ্ধা করলে ব্রহ্মলোক জয় করা যায়।' (৪৯) 'পুত্র মাতার সেবা করবে, যদি মাতা সমাজ পরিত্যক্ত হয় তাহলেও, কারণ তারই জন্যে মাতা বহু কষ্ট সহ্য করে।' (৫০) 'পুত্র মাতাকে ভরণপোষণ করবে, সমাজপরিত্যক্তা হলেও, তবে তার সঙ্গে কথা বলবে না। (৫১) সমাজপরিত্যক্ত পিতাকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু মাতাকে নয়। মাতা কখনও পুত্রের পরিত্যাজ্য নয়।' (৫২) এখানেই শঙ্খ ও লিখিত বলেছেন, 'পুত্র পিতামাতার বিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করবে না, যদি করে, তবে মাতাই পক্ষই নেবে, কারণ মাতাই তাকে গর্ভে ধারণ, প্রসব ও লালন-পালন করেছে।' (৫৩) পুত্র মাতার ঋণ থেকে কখনওই মুক্তি পায় না, একমাত্র মুক্তি পায় যদি সে (জটিল ও প্রচুর অর্থসাপেক্ষ) সেন্ট্রামণি যাগ করে। 'কোনও গুরুই মাতার চেয়ে উচ্চ নয়।' (৫৪) পাণ্ডবেরা বলেন 'অন্য সব অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, মাতার অভিশাপের থেকে মুক্তি নেই।' (৫৫) তখনই কেবল তার বার্ধক্য আসে, তখনই কেবল তার শোক হয়, তখনই কেবল তার জগৎ শূন্য হয়ে যায়, যখন কেউ তার মাকে হারায়। (৫৬) অজাতশত্রু তার পিতাকে তার আদেশ অমান্য করে

কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাঁর মাতাকে হত্যা করতে চাইলে তাঁর মন্ত্রীরা তাকে বলেন: 'এমন আঠারো হাজার মন্দ রাজার বিবরণ পাওয়া যায় যাঁরা পিতৃহস্তা। কিন্তু মাতৃহস্তার কোনও বিবরণ মেলে না।'(৫৭) কিন্তু পরশুরাম তার পিতার আদেশে মাতাকে হত্যা করেছিলেন, যদিও পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রথম বরে তিনি মাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

মাতা যদি যৌন ব্যভিচারের দোষে দোষী হয়, পুত্রের উপর নির্দেশ আছে, শ্রাদ্ধের সময়ে তার জন্য প্রার্থনা করতে: 'যদি আমার মাতা কোনও পাপ করে থাকেন, কর্তব্যে অবহেলা করে থাকেন, পিতা যেন সেই বীজ নিজের বলে গ্রহণ করেন।'(৫৮) পুত্রের কর্তব্য মায়ের প্রতি সম্মান দেখানো(৫৯) এবং কখনও মাকে শাস্তি বিধান না করা। যদি তা করে তবে তাকে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে।(৬০)

পুত্র নানা শ্রেণির হতে পারত। তার মধ্যে মাতার সাফাৎ যোগ ছিল ঔরস (স্বামীর থেকে জাত), কানীন (বিবাহের পূর্বে গর্ভধৃত), সহোঢ় (বিবাহের সময়ে গর্ভধৃত), পুত্রিকাপুত্র (কন্যার পুত্র, যাকে কন্যার পিতা নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করতেন), গুঢ়োৎপন্ন (গোপনে পরপুরুষের দ্বারা উৎপন্ন) এবং নিয়োগ। এর মধ্যে কানীন, সহোঢ় এবং গুঢ়োৎপন্ন বিষয়ে সমাজের আপত্তি ছিল। অন্য দুটি প্রকট ভাবেই সমাজ দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। দত্তক নেওয়ার সময়ে পুথিগত ভাবে পিতামাতা উভয়েরই সম্মতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অনুমান হয়, পুরুষশাসিত সমাজে মায়ের অনুমতি আছে এটা গ্রহণ করেই নেওয়া হত। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে দুস্থ ব্যক্তির সন্তান বিক্রয় করত; এ রকম 'ক্রীত' পুত্র পিতামাতা দুজনেরই হত, কিন্তু বিক্রয় বা ক্রয়ের মূল সিদ্ধান্ত পুরুষেরই—মহাকাব্য, পুরাণ ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনাগুলি তারই প্রমাণ দেয়।

মাতৃহ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত জটিলতাগুলি সাহিত্যে প্রকাশ পায়। সব কিছু যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সহজ সরল ছিল না তা মহাকাব্য, পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য এবং প্রাচীন মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে উদঘাটিত হয়। এমনকী বৈদিক সাহিত্যেও পিতা এবং কন্যার মধ্যে (ব্রহ্মা ও বাক) অবৈধ সম্পর্ক দেখতে পাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে মাতা-পুত্রের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের একটি নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিশ্বান্তর জাতকে পিতা পুত্রকন্যাকে বিলিয়ে দেয় মাতার অনুমতি ছাড়াই। যদিও শাস্ত্রে নির্দেশ আছে, পুত্রেরা বার্ষিক্যে মায়ের দেখাসশোনা করবে। তবু কুন্তী পুত্রদের ছেড়ে বনে গিয়েছিলেন। গর্ভবতী স্ত্রী স্বামীর কাছে বিশেষ দায়িত্ব ও যত্নের বিষয়, কিন্তু গর্ভবতী অবস্থায় সীতা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন বিনা শাস্তিতে। শাস্ত্রে প্রায়ই বলা হয়, 'ন স্ত্রী দুশ্যতি জারেণ-স্ত্রী উপপতির দ্বারা দূষিত হয় না'।(৬১) কিন্তু সীতাকে এ বিষয়ে শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। এই অপরাধে অহল্যা অভিশাপ পেয়ে পাষাণমূর্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। বিবাহিত রমণী ব্যভিচার করলে এক মাসের পর তাকে শুদ্ধ বলে গণ্য করতে হবে।(৬২) কিন্তু রামচন্দ্র বা গৌতম কেউই এই বিধি মানেননি। আরও অসংখ্য এ রকম নিদর্শন মহাকাব্যে ও পুরাণে পাওয়া যায়, যেখানে, যে নারীর পদস্থলন ঘটেছে তাকে কঠোর শাস্তির দ্বারা দণ্ডিত করা হয়। তার মধ্যে কয়েকটি এত বীভৎস যে সেগুলি উচ্চারণ করা যায় না। যাই হোক, বিবাহিত রমণী শুধু তার স্বামীর থেকেই গর্ভধারণ করবে এবং স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর জন্ম দেবে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল।

মাতৃহ্বের বিষয়ে বা পুত্রের সম্বন্ধে মাতার মনোভাব বিষয়ে কতকগুলি বিচিত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। গঙ্গা তার সাত পুত্রকে জলে বিসর্জন দেন। অবশ্য এরা ছিল বসু (স্বর্গবাসী), অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল। এবং, তাদের শাপ কিছুটা হ্রাস করার একমাত্র উপায় ছিল। সদ্য মৃত্যু, যাতে তারা

অবিলম্বে স্বর্গে ফিরে আসতে পারে, এবং গঙ্গা তাই করতে অঙ্গীকৃত ছিলেন। কিন্তু পিতা যখন সদ্যোজাত পুত্রদের তাৎক্ষণিক মৃত্যুতে শোকাবিষ্ট, তখন যে মা তাদের গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসব করেছেন এবং স্বয়ং ডুবিয়ে মেরেছেন, তাঁর দিক থেকে কোনও অনুশোচনা বা বেদনার কথা শুনতে পাই না। দিব্যাঙ্গনা মেনকাও তাঁর সদ্যোজাত শিশু কন্যা শকুন্তলাকে তীর ঋষি স্বামীর সঙ্গেই পরিত্যাগ করেছিলেন। ইন্দ্র তাকে আদেশ দিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে, যে তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল। মেনকা ঋষির সঙ্গে বাস করলেন একটি সুন্দরী কন্যার জন্ম পর্যন্ত। তারপরেই তিনি স্বর্গে চলে গেলেন, কারণ তাঁর কার্য সমাধা হয়েছে। হর্ষচরিত-এ সরস্বতীও সারস্বতের জন্ম দিয়ে তৎক্ষণাৎ স্বর্গে প্রস্থান করেছিলেন। এমনকী হর্ষের মাতা যশোমতীও আসন্ন বৈধব্যের আশঙ্কায় পুত্র হর্ষের করুণ মিনতি। অবহেলা করে চিন্তারোহণ করলেন। সীতাও দুই শিশুপুত্র ফেলে তাঁর মায়ের কাছে চলে গেলেন। মাদ্রী দুই পুত্রকে কুন্তীর কাছে রেখে স্বামীর চিন্তারোহণ করলেন, কুন্তীও পুত্রদের ফেলে চলে গেলেন। পুরুরবার প্রতি উর্বশীর কামনা এতই তীব্র এবং যে কোনও রকম বাধার প্রতি এতই অসহিষ্ণু যে, তিনি নবজাত শিশুকে আশ্রমে লালিত হতে পার্ঠিয়ে দিলেন। মর্ত্য গণিকার প্রতীক হিসাবে উর্বশী স্বাভাবিক ভাবেই কামসর্বস্বতা এবং অপত্যস্নেহহীনতার প্রতিনিধি।

এমনকী গণিকাদেরও কোনও কোনও সময়ে সন্তান জন্মাত। ছেলেদের বলা হত বঙ্কুল এবং তাদের গীতবাদ্য ও নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হত, যাতে তারা গণিকদের রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ে যোগ দিতে পারে। মেয়েদের গান, বাজনা, অভিনয় ও অন্যান্য সুকুমার কলা শেখানো হত, কিন্তু অধিকাংশই তাদের মায়ের জীবিকাই অবলম্বন করত, যদি না কোনও সদয় পৃষ্ঠপোষক তাদের নিষ্কর করে নিতেন। তখন সেই পুরুষেরা তাদের রক্ষিত রাখত অথবা বিবাহ করত। যাই হোক, এই সন্তানেরা মায়ের কাছেই মানুষ হত, এবং

যুক্তিসঙ্গত ভাবে ধরে নেওয়া যায়, মায়ের সঙ্গে তাদের ভাবগত যোগ থাকত।

অনেক সময়েই অনিচ্ছুক নারীদের উপর মাতৃস্ব চাপিয়ে দেওয়া হত। মহাভারত-এ অশ্বিক ও অম্বালিকা ব্যাসকে দেখে শিউরে উঠেছিলেন, কিন্তু ব্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এবং তাঁর সন্তান ধারণ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন। কোনও কোনও যাগে কুমারী, নিঃসন্তান বধু ও সন্তানবতী রমণী— এই তিন প্রকারের দক্ষিণা ছিল; তিন শ্রেণই গ্রহীতার সন্তান ধারণ করত। কুলজাতকে নিবীৰ্য ইক্ষাকু রাজার পাঁচশো মহিষীকে প্রতি মাসে তিন রাত্রি করে যে কেউই দাবি করত। তার অধীন হতে হত; এই সব রাত্রে রাজার আদেশে প্রাসাদের তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হত। অবশ্যই অনেক অনিচ্ছুক নারীর উপরে গর্ভধারণ আরোপিত হত, গল্পে আছে, তারা বিলাপ করেছিল, বাধা দিয়েছিল এবং অবশেষে অসহায় ভাবে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। মহাকাব্য ও পুরাণে এমন বহু কাহিনি আছে যেখানে বহু অনিচ্ছুক রমণীর উপরে মাতৃস্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতিথিদের আমোদের জন্য গৃহিনীকে দান করা হত, কখনও বা কুমারী কন্যাদের দান করা হত এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা যায়, তাদের সকলেই সেই সঙ্গীর জন্য আগ্রহী ছিল না। কোনও কোনও গল্পে বলা হয়েছে, তারা ঘৃণা করেছে, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

মাতৃস্বের জন্য যে সরল কামনা, তা কুমারী কুন্তীর নবপ্রাপ্ত বর নিয়ে খেলা করার মধ্যে প্রকাশ পায়। তিনি যে কোনও দেবতাকে আহ্বান করতে পারতেন, এবং তাঁর আহ্বানে দেবতা আসতেন। সূর্য এসে তাকে একটি পুত্র দিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে তাঁর নিবীৰ্য স্বামী পাণ্ডুই তাঁকে প্ররোচিত করেন তিন ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীর কাছ থেকে প্রথম তিন পাণ্ডবকে লাভ করতে। মাদ্রীও প্ররোচিত হয়েছিলেন এবং কুন্তীর কাছ থেকে মন্ত্র শিখেছিলেন। তিনিও এই

একই উপায়ে দুই পুত্র লাভ করেন। সমাজ পুত্রের উপর এতটাই গুরুত্ব দিত যে, যে ভাবেই হোক পুত্রলাভ করতে হত। সেই পুত্রেরা যে শুধু আইনসঙ্গত ছিল তা নয়, তার জন্য তাদের কোনও কলঙ্ক ছিল না, এবং উরসপুত্রের সমান অধিকারই তাদের ছিল। নিয়োগ প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। মৃত বা নিবীৰ্য পুরুষের সম্পত্তির জন্য পুত্ররূপ উত্তরাধিকারী লাভের কামনাই ছিল এই প্রথার মূলে।

জরৎকার মুনিকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা বলেছিলেন, তিনি পুত্রের জন্ম না দিলে স্বর্গে যেতে পারবেন না। তিনি তা করলেন, কিন্তু পত্নীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে তিনি শর্ত রাখলেন যে, সামান্যতম ছল ধরে তিনি পুত্র ও মাতাকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। অতএব পুত্র সম্পূর্ণ ভাবে মায়েরই দায় হয়ে দাঁড়াল। পিতা পুত্রের ভরণপোষণের পর্যন্ত ব্যবস্থা করলেন না। অনুরূপ পরিস্থিতিতে শকুন্তলা তার ছেলেকে নিয়ে দুস্যন্তের সভায় গিয়ে রাজাকে পিতৃ-কর্তব্যে অবহেলার জন্য তিরস্কার করলেন। দুই রাজকুমারের মা সীতা তাদের তপোবনে প্রসব করলেন এবং ভিক্ষুবকরূপে লালন করলেন, কেননা তাদের পিতা পুত্রদেরও তাদের মাতার কোনও উদ্দেশ্যই করলেন না।

সুখী পরিবারের প্রতীক শিব, পার্বতী, গণেশ ও কার্তিকেয়, পরে যেখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে যোগ করা হয়েছে। কিন্তু পরিবারের শুরু কীর্তিকেয়ের জন্ম দিয়ে। শিব ও পার্বতীর মিলনের কাহিনির ভূমিকায় বলা হয়েছে, তারকাসুর দেবতাদের উত্তাক্ত করছিল; তখন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে দল বেঁধে যান উপায় জানতে। ব্রহ্মা তাদের বলেন, কেবলমাত্র শিব-পার্বতীর পুত্রই অসুরদের বিরুদ্ধে দেবতাদের উপযুক্ত সেনাপতি। কিছু দৈব ষড়যন্ত্রের পর মহাদেব ও পার্বতীর মিলন ঘটল।

এই কাহিনির একটি অন্য রূপ হল 'রুদ্র অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে স্কন্দকে সৃষ্টি করলেন।' (৬৩) আর একটিতে বলা হয়েছে কার্তিকেয়কে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের জন্য উমা অগ্নির স্ত্রী স্বাহাতে প্রবেশ করেছিলেন। (৬৪) আবারও একটিতে বলা হয়েছে, শিবের বীজ অগ্নিতে পড়েছিল, তিনি তা ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে তা গঙ্গায় নিষ্ক্ষেপ করেন এবং গঙ্গাও অসহ্য তেজ সহ্য করতে না পেরে কুশের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করেন এবং সেখানে কৃত্তিকা ভগ্নিগণ তা লালন করেন। (৬৫) এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপের সমান ধর্ম দুটি; অগ্নি যদিও পৌরাণিক মতে শিবের অপর স্বরূপ, বীজের উৎস শিবের থেকেই। কিন্তু পার্বতীর মাতৃত্ব নিশ্চিত ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। এই কাহিনিতে এবং এর অন্যান্য রূপে যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তা হল কোথাও পার্বতীকে কার্তিকেয়ের মাতা বলে স্বীকার করা হয়নি। আমরা যে ভাবে জানি গণেশ আংশিক ভাবে হস্তী-তাই পার্বতী যাকে জন্ম দিয়েছিলেন, ঠিক সেই পুত্র নন। সরস্বতী এথেনার মতো ব্রহ্মার মস্তক থেকে এবং লক্ষ্মী ভিনাসের মতো মথিত সাগর বেরিয়েছেন। তাই আমাদের সামনে এই বিস্ময়কর তথ্য থাকে—পার্বতী তার সন্তানদের কারওরই সম্পূর্ণ ভাবে মা নন। এই ইতস্তত ভাব কেন, কেন এই ব্যাখ্যাশীলত্ব দ্বিধা? বীজ যখন শিবের, তখন কার্তিকেয়ের ক্ষেত্রে তাঁর পিতৃত্ব অবিসংবাদিত—যে কার্তিকেয় সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, মহাসুর তারকের নিহস্তা, দেবসেনার সেনাপতি। কিন্তু বীজের পিতৃত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেও তা কোনও নারীর গর্ভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি। সোজা কথায় বলতে গেলে, কার্তিকেয়ের মা হওয়ার গৌরব কোনও নারীই লাভ করেনি। লোক পরম্পরা পার্বতীকে কার্তিকেয়ের সঙ্গে যুক্ত করলেও পুরাণ তা করেনি। মনে রাখতে হবে, ইন্দ্র-শচী ও জয়ন্ত, কৃষ্ণকৃষ্ণিণী এবং তাদের পুত্রেরা—এই সব দৈব পরিবারগুলিও শিব, পার্বতী ও তাদের সন্তানদের তুলনায় নিতান্তই ফিকে। কিন্তু জীববিদ্যাগত দিক দিয়ে এটি যথার্থ পরিবার নয়।

মনে হয়, এর কারণ নিহিত আছে প্রজননে যৌনসঙ্গীর ভূমিকা বিষয়ে সমাজের অবচেতন ধারণায়। বৈদিক আর্যেরা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে, তখন তারা নিজেরা পশুপালক যাযাবর মানুষ ছিল। তারা তাদের পশুপালের মধ্যে প্রজনন ক্রিয়া দেখত এবং জীবতন্ত্রগত প্রজননের মৌলিক জ্ঞান তাদের ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষদেশীয় কৃষিজীবী মানুষেরা ছিল। আর্যেরা তাদের কাছ থেকে কৃষিশিক্ষা করেছিল, যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করেছিল এবং শিকার ও পশুপালন আহাৰ্য সংগ্রহের একটি পরিপূরক উৎস হিসাবে বজায় রেখেছিল। পশুপালক সমাজে সমগ্র পশুপালক, তা পুরুষই হোক বা স্ত্রী, প্রভুর সম্পত্তি এবং নবজাত বৎসগুলিও স্বাভাবিক ভাবে তারই হত। কৃষিতে যৌথ প্রভুত্ব আছে; ভূমির প্রভু সব সময়ে বীজের প্রভু নয়। তাছাড়া ভূস্বামী সব সময় নিজের জমি চাষ করে ফসল তোলে না। সমাজের অর্থনীতির নানা স্তরে ভূমির, বীজের এবং শ্রমের ভিন্ন ভিন্ন প্রভু ছিল। মহাভারত-এ একটি উপাখ্যান আছে, এখানে পৃথিবী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঈশ্বরের কাছে আসেন, বিক্রয় এবং হস্তান্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে। মনে হয় প্রাচীন যুগে ভূমির প্রভুত্ব অপরিচিত ধারণা ছিল; ভূমি কর্ষিত হত মানুষের খাদ্য যোগাতে। (৬৬)

পার্বতীকে কার্তিকেয়ের মাতৃত্ব প্রদান করার বিষয়ে পুরাণবিদের অনীহা হল কার্তিকেয়ের একমাত্র পৌরাণিক জনক হিসাবে শিবকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি পন্থা। যে বীজ পার্বতীর গর্ভে আগুন ছিল তা তিনি ছুড়ে ফেলতে সোনা হয়ে গেল; তা গঙ্গাকে তীর ভাবে দহন করল। যতক্ষণ না তিনি তা কুলের ঘাসের উপর ছুড়ে ফেললেন, এবং দেবমাতা কৃত্তিকারা তা লালন করলেন। ভাষার ইঙ্গিত ভেঙে বোঝা যায়, শিবের বীজের উন্নততম শক্তি, অসহনীয় সৃষ্টির উত্থাপ, পার্বতী, গঙ্গা-এমনকী কৃত্তিকারা, যাঁরা ধারণ করেনি-ঐদের নিষ্ফল প্রয়াস। অবশেষে তা প্রায় স্বকীয় ভাবেই কুশের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যদিও দেবমাতারা প্রায় দাসীর মতোই তাকে লালন পালন করেছিলেন। এই

উপাখ্যান পিতা-মাতার ক্রমিক অবস্থান সম্বন্ধে সমাজের মনোভাবের বিষয়টিকে আমাদের কাছে সরাসরি নিয়ে আসে। বীজটি যদিও অবিসংবাদিত ভাবে শিবের, গর্ভ পার্বতীর নয়, অন্য কোনও নারীরও নয়। পার্বতী বীজটিকে নিষ্ক্ষেপ করেন; গঙ্গা, যিনি পৌরাণিক মতে মহাদেবের অপর ভার্যা, তা ধারণ করতে পারেননি, এবং কৃতিকারা ধাত্রীমাত্র।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে আর্যেরা কৃষিজীবী হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি কৃষিজীবীরই দৃষ্টিভঙ্গি। পিতামাতা বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত ভাবেই পুরুষতান্ত্রিক। নারী ক্ষেত্র, পুরুষ তার মধ্যে বীজ বপন করে। এই দৃষ্টি প্রধান ভাবে পিতৃতান্ত্রিক, যেহেতু ক্ষেত্র ও বীজ উভয়েই পুরুষের, অতএব পুত্র প্রধানত পিতারই। মনু এ ব্যাপারে নির্ভুর ভাবে স্পষ্টবাদী: বীজ এবং গর্ভের মধ্যে বীজই উৎকৃষ্ট। সব প্রাণী বীজের ধর্মগ্রহণ করে।'(৬৭) 'গর্ভের ধর্ম বীজের হয় না।'(৬৮) তবে সন্তান কার? এ ব্যাপারেও মনু স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন: 'যেমন গবাদি পশু, অশ্ব, উট, দাসী, মহিষ, ছাগ ও মেয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গীরা বৎসের অধিকারী হয় না, নারীর ক্ষেত্রেও তাই।'(৬৯) 'স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষ যদি পুত্রের জন্ম দেয়, তখন ক্ষেত্র বীজের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং পুত্র তখন স্বামীর, জন্মদাতার নয়।'(৭০) এখানে অবশ্য জন্মদাতা না স্বামী, কে পুত্রের অধিকারী সে বিষয়ে মতভেদ আছে।(৭১) 'নারী ক্ষেত্র, পুরুষ বীজ।'(৭২) পত্নী থাকার উদ্দেশ্য কী? 'পুত্রের জন্ম, শিশুর লালন-পালন, দৈনন্দিন সেবা, সব কিছুই পত্নীর উপর নির্ভর করে।'(৭৩) আর সবচেয়ে বড় কথা, মনু স্পষ্ট ভাবে বলেছেন: 'নারীর সৃষ্টি কেবলমাত্র জন্ম দেওয়া, তাই তারা পূজ্যা, গৃহের আলো।'(৭৪) সুতরাং নারীর সৃষ্টি জন্ম দিতে, পুরুষের সৃষ্টি বংশ রক্ষা করতে।

এই সব ধারণাগুলো যেহেতু সমাজ চেতনায় গভীর ভাবে প্রোথিত ছিল, অতএব মাতৃস্বের ভাবনা কয়েকটি বিশেষ ব্যঞ্জনার অধিগ্রহণ করে: শিশুর জন্মবিষয়ে, কেবলমাত্র প্রসবের সময় ছাড়া, নারীর ভূমিকা কৃষিক্ষেত্রের মতোই নিষ্ক্রিয়। যেমন কর্ষণের পর উদ্ভ বীজ। আপন্যা। থেকেই বৃদ্ধিলাভ করে ক্ষেত্রের দৃষ্ট ও সক্রিয় প্রচেষ্টা ছাড়াই, তেমনই মাতাও নিষ্ক্রিয় ভাবে বীজ ধারণ করত। (৭৫) ভ্রূণ নিজে নিজেই বাড়ত। ফসল কাঁটার সময়ে যেমন ক্ষেত্রের মালিক, যে সম্ভবত বীজ বপনকারীও বটে, এসে ফসল সংগ্রহ করে নিয়ে যায়, তেমনই স্বামী শিশুকে দাবি করে। ক্ষেত্রের মূল্যবোধও এই ধারণায় সমর্থন পায়: গোবৎস, মহিষ, উট, ঘোড়া, ছাগ, মেষ, এদের বৎসরা তাদের জন্মদাতার নয়, পালের মালিকের। এই তালিকায় দাসীর অন্তর্ভুক্তি সমাজে তার যৌন অবস্থান সম্বন্ধে যে মনোভাব তা মর্মদ্রুদ ভাবে পরিস্ফুট করে। সে তার প্রভুর পরিবারের সব পুরুষ সদস্যের সহজ ভোগ্য। তার পুত্র যদি তার স্বামীর সন্তানও হয়, সে তারও নয়, তার স্বামীরও নয়, তার প্রভুর-ক্ষেত্রে বা কারুকর্মে উৎপাদনমূলক শ্রমে বাড়তি বাহুবল হিসেবে।

মানুষের উৎপাদনের উপায় নিয়ন্ত্রিত করতে এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সেই উপায়গুলি নিবেদন করতে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছিল তার (নারীর) শরীরের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার বিস্তৃত করতে। তাই সে তার নিজের শরীরের উপর প্রভু হারিয়েছে।' নারীর নিজের দেহের উপর অধিকার হারানোর যুগ্ম প্রমাণ হল, দাসীই হোক আর পত্নীই হোক, তাকে তার প্রভু বা স্বামীর যৌন দাবি মেটাতে হত এবং তার গর্ভের ফলের প্রভু হত সে নয়, তার স্বামী বা প্রভু। তাকে প্রায়ই যৌন সংসর্গে বাধ্য হওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে হত, দীর্ঘ মাসের পর মাসব্যাপী গর্ভধারণের কষ্ট সহ্য করতে হত, তীব্র গর্ভযন্ত্রণা, লালন-পালন, উদ্বিগ্ন, শিশুকে স্তন্যপান করানো, অসুস্থতায় ও

আঘাতে তার সেবা করা সবই করতে হত। কিন্তু শেষ পর্বে শিশু তার নয়, তার স্বামী অথবা প্রভুর।

তা সত্ত্বেও কিন্তু মাতৃস্বের মহিমা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগল; যে বাস্তবকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হত, এ তারই ভাবগত এবং মানসিক ক্ষতিপূরণ। এখানে, ভারতবর্ষে, মাতৃস্বকে ততটাই মর্যাদা দেওয়া হত, যত পরিমাণে সমাজে নারীর অবস্থার অবনতি ঘটছে। ঋগ্বেদ-এর দেবমণ্ডলী প্রধানত পুরুষবহুল। (৭৭) ক্রমশ পরবর্তী শতাব্দীগুলি ধরে দেবতাদের বিবাহিত রূপে দেখানো হতে লাগল, যেহেতু ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সময় থেকেই সমাজে বিবাহ আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু মহাকাব্য ও পুরাণ-সাহিত্যে তাঁদের পুত্রসন্তান জন্মাতে লাগল। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমাজে সর্বব্যাপী প্রয়োজন হয়ে উঠল, যে সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্রদের নানা প্রকারভেদ স্বীকার করা হত। তখন দেবী মাতারাও তাদের স্বামীদের নামে পরিচিত হতে লাগলেন। সামাজিক বাস্তব তত দিনে নারীকে সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ জননীর ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছে। নারী হিসেবে, সামাজিক জীব হিসেবে, স্বাধীন চিন্তা, কর্ম ও ভাবনা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে তার যে নিজ সত্তা, তা সে খুঁইয়েছে। যদি সামগ্রিক ভাবে নাও হয়, অন্তত প্রধান ভাবে সে শুধুই মা, পুত্রসন্তানের জন্মদাত্রী।

ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীর আশপাশে তন্ত্রের প্রভাব ভারতে অনুভূত হতে লাগল। তন্ত্রে আবার নারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই সপ্তম শতাব্দীর এক প্রধান গদ্য কবি বাণভট্ট যে দেবী চণ্ডীর উদ্দেশে গদ্যে স্তুতি রচনা করেছেন, তা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। অন্যেরাও তাঁর অনুসরণ করলেন এবং একটি সম্পূর্ণ স্তোত্রসাহিত্য সৃষ্টি হল, যা দেবীদের স্তুতি করে। সপ্তমাতৃকাকে মূর্তিতে পূজা করা হত। তাদের কীর্তিকলাপ সৃষ্টি করা হল এবং এই দেবীদের যে সাম্প্রদায়িক পূজা, তার উদ্দেশ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ উপকথা তৈরি

হল। এই ভাবে মাতৃকারা কেমন ভাবে তাদের সন্তানদের লালন-পালন ও উদ্ধার করেন, তারই গুরুত্বহীন কিছু উপকাহিনি সৃষ্টি হল। দৈবস্বরে মাতৃস্বের এই উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলেছিল মানবিক স্বরে। নারীর অস্তিত্বের একমাত্র হেতু ছিল মাতৃস্ব। 'নারীদের পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভূমিকায় এবং তারই মাধ্যমে জীবন কাটাতে অনুপ্রেরিত করা হত এবং মাতা হিসেবেই সর্বাগ্রে তাদের স্তুতি করা হত।'(৭৮) এই ব্যাপার অন্যত্রও ঘটেছিল। 'ভিক্টোরীয়রা অশান্তি বোধ করে অনেক সময়ে এই অনুভূত শক্তিকে যুক্তিসম্মত করত-মাতৃস্বের আত্মত্যাগমূলক ও লঘু পাক পূজনীয়তায় নারীস্বকে গুলে।'(৭৯)

শুধু যে নারীর উপর অনেক সময়ে মাতৃস্ব আরোপিত হত, তাই নয়, নারীরা বাধ্য হত। মাতৃস্বকে তাদের জীবনের মূল তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে; তারা বন্ধ্যাস্বের নিন্দা করত এবং গর্ভকে ফলপ্রদ করার জন্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করত। পুরুষের বীৰ্যহীনতা আবছা ভাবে মাত্র জানা ছিল, নারীরাই সব সময়ে সন্তানহীনতার জন্য সামাজিক ভাবে ও মানসিক ভাবে মূল্য দিত। নারীরাই আবার দুর্ভাগিনী বন্ধ্যা রমণীকে দোষ দিত ও ব্যঙ্গ করত, কারণ নারীরা পুত্রধারণের গুণ বিষয়ে পুরুষের সামাজিক মূল্যবোধ অন্তঃসার করেছিল। তাই প্রতিটি বালিকাকে দেখা হত পুত্রসন্তানের ভাবী মাতা হিসেবে, তাকে এই দৈব কর্তব্য পালন করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হত এবং তৈরি করা হত এবং যদি সে এ কাজ সম্পন্ন করতে না পারত, তবে সেটা তারই দুর্ভাগ্য; সে নিজে এবং সমাজ তাকে মনে করত সম্পূর্ণ রূপে অশুভ, অসম্পূর্ণ এবং নিষ্ফল জীব। 'নারীর মাতৃস্ব ছিল লিঙ্গগত কর্ম বিভাগের প্রধান হেতু এবং নারীর উপর পুরুষের শাসনেরও প্রধান হেতু।'(৮০)

নারীর প্রতি এবং মাতা হিসেবে তার ভূমিকার প্রতি যে মনোভাব, সেটা যে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত, তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। যখন কৃষিপ্রধান সমাজে কৃষিকর্মের জন্য আদিম যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হয় এবং কৃষিকর্মের নানা প্রাকৃতিক বিপাকের কারণে ভাল ফসল হওয়ার কোনও স্থিরতা থাকে না, তখন সেই সমাজে চাষবাসের জন্য অনেকগুলি জাতের প্রয়োজন হয়। সেখানে সম্পত্তি রেখে যাওয়ার জন্য পুত্রেরও প্রয়োজন হয়। প্রাসঙ্গিক ভাবে, সেখানে কন্যাসন্তানেরও প্রয়োজন আছে, যে কন্যারা বিবাহ করে সন্তানের জন্ম দেবে। তাই মূলত নারীর উর্বরতার উপরে বিশাল গুরুত্ব দেওয়া হত এবং এ কথা অনুমান করলে ভুল হবে না যে, নারীরা নিজেরাই প্রথম পর্বে উর্বরতাকে শক্তিরূপে ব্যবহার করেছিল। বহুবিবাহের পরিবারে সন্তানের মাতা তার বন্ধ্যা বা নিঃসন্তান সপত্নীর তুলনায় সামাজিক উৎকর্ষ ভোগ করত এবং তার গর্ব করত। বহু অনুষ্ঠানে যে নারীর স্বামী-সন্তান বেঁচে আছে, তারই শুধু অধিকার ছিল। সন্তানবতী নারী কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করত, যা থেকে নিঃসন্তান নারী বঞ্চিত হত। মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যে অনেক পুরুষই তার মায়ের নামে পরিচিত। কিন্তু যে সমাজে বহুবিবাহ আছে, সেখানে মাতৃনামের ব্যবহার পুত্রের স্পষ্ট পরিচয়ের একটি পদ্ধতি। তাহলেও তা মায়ের সঙ্গে পুত্রের যোগ নির্দিষ্ট করত এবং অন্তত বুদ্ধিগত ভাবেও তাদের ও মাতৃত্বের সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করত। কিন্তু মায়ের সামাজিক বন্দিত্ব তার শক্তিকে হরণ করে নিয়েছিল এবং স্বার্থসাধনে তার উর্বরতাকে ব্যবহার করেছিল। তাই এর পক্ষে মাতৃত্ব মানে সহজ সরল যন্ত্রণাভোগ, কারণ সে শেষ পর্যন্ত তার গর্ভের সন্তানকে নিজের বলে দাবি করতে পারত না। এই প্রক্রিয়ায় সে কষ্ট পেত, কিন্তু অবশ্যই ভাবগত ভাবে কিছু সুখ পেত, তার উর্বরতা এবং তার থেকে উদ্ভূত তার পবিত্রতার সামাজিক স্বীকৃতি রূপে।

'নারীর মাতৃস্ব এবং তার থেকে সুখ পাওয়ার ক্ষমতা প্রবল ভাবে অন্তঃসারকৃত হয়েছে এবং মনস্তাত্ত্বিক ভাবে চাপানো হয়েছে ও বিবর্তনমূলক ভাবে নারীর মনস্তাত্ত্বিক গঠনে গ্রথিত হয়েছে।'(৮১) এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি মায়ের ব্যবহারের কাঠামো গঠিত করে। নারীর উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক অনুরপ্রেরণা পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের অজান্তে অন্তঃকৃত করেছিল নারীরাই। এই অন্তঃকৃত করার আর একটি সহায়ক ছিল। বিবাহিতা নারীর শিক্ষার সুযোগ অস্বীকার করা হয়েছিল। নিজস্ব কোনও পেশা, স্বাধীন সামাজিক বা রাজনৈতিক অস্তিত্ব অধিকাংশ সুকুমার কলা এবং বহু বিনোদন থেকে সে বঞ্চিত ছিল। গর্ভধারণই একমাত্র পথ যা তার কাছে খোলা ছিল, যার মাধ্যমে সে তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে পারে এবং পারিবারিক ও সামাজিক আবেষ্টনে কিছু সম্মান পেতে পারে। জীবিকা উপার্জনের সুযোগ থেকে নারীকে বঞ্চিত করে তাকে অবদমিত করে রাখা সম্ভব হয়েছিল। তার স্বামী তার প্রভু।'(৮২) তাই তারা তাদের রুটি-রোজগারকারীর উপর নির্ভরশীল ছিল, মনে করত, স্বামীর সন্তান ধারণ করে তারা প্রভুর কিছুটা ঋণ শোধ করছে।

আর্যরা যখন উত্তর ভারত জয় করেছিল, সেই দেশের কিছু মানুষকে দমন করা বা ক্রীতদাস বানানো হয়েছিল, বাকিরা বিক্র্য অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল। যারা পালিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে দাসে পরিণত হয়। নবোদ্ভূত সমৃদ্ধ শ্রেণিতে দাসেন্দ্রের ব্যবহার করা হত গৃহে কর্মে, গ্রিস ও রোমের মতো সামাজিক উৎপাদনমূলক কাজে নয়।

গৃহকর্মের অনেকটা অংশ দাসেন্দ্রের হাতে যাওয়ায় এই সব গৃহের নারীরা সমস্ত উৎপাদনমূলক কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং কিছুটা নিম্প্রয়োজন হল, ফলে তাদের একমাত্র সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়াল সন্তানের জন্ম দেওয়া, যা কোনও প্রাচীন কালে সামাজিক উৎপাদনমূলক ছিল। কারণ,

আমরা দেখেছি, সমাজে এই পর্বে অর্থনীতি চালু রাখার জন্য বেশি সংখ্যক হাতের প্রয়োজন হত এবং উদ্ধৃত তৈরি করার জন্যও তার প্রয়োজন ছিল।

পুরুষ সমাজ শাসন করত, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা নির্ধারণ করত। নারীর প্রধান কাজ যখন হয়ে দাঁড়াল সন্তানধারণ, তখন তারা যন্ত্রণারই ভাজন হল এবং পরিবর্তে সম্মান বা ক্ষতিপূরণ সামান্যই পেল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ নারীর কাছে মাতৃস্থ ছিল যন্ত্রণা ও বঞ্চনা 'বস্তুত মাতৃস্থ ছিল 'পুরুষের নিয়ন্ত্রণের যে সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তারই ভিত্তিপ্রস্তর। নারীর বন্দিত্বের তথ্য শুধু নয়। কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই তথ্য অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল নারীর ওপর পুরুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবস্থায়।'(৮৩)

প্রাচীন ভারতে মাতৃস্থের ট্রাজেডি ছিল, বিকল্পহীন যে জোর নারীর উপর খাটানো হয়েছিল সেইটা। আর এই জোর ছিল সমাজে সেই সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির ফলে যে শক্তিগুলির উপরে নারীর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পুরুষ উত্তরোত্তর লাভবান হচ্ছিল এবং তার প্রত্যক্ষ সহকারী হিসেবে নারীর তদনুযায়ী ক্ষতি হচ্ছিল। মাতৃস্থ যে আনন্দময় হতে পারে, যখন নারী নিজে তা চায় এবং গর্ভধারণ ও প্রসবের কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয়। এই আশায় যে দম্পতির কিছুটা যৌথ নিয়ন্ত্রণ থাকবে সন্তানের উপর, কন্যাসন্তান যে পুত্রের মতোই সুখকর এবং আনন্দদায়ক হতে পারে, মা যে নিজের ইচ্ছায় কষ্ট সহ্য করেছে একটি জীবনকে পৃথিবীতে আনার জন্য, তাই কিছু সম্মান তার প্রাপ্য— এ সব কথা প্রাচীন ভারতে কোনও মা ভাবতেই পারত না। সে শুধু তার উর্বরতার গর্ব করত— যে শক্তি মানবের প্রাণীরও আছে—কিন্তু তার কষ্টের জন্য কোনও স্বীকৃতি প্রত্যাশা করত না। তার আনন্দ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার স্বপ্ন, সবই শিশুর মধ্যে বদ্ধ। যতদিন সে সাবালক হয়ে

না। ওঠে এবং তার পরেও ভিন্ন স্তরে। সন্তানকে আনার ইচ্ছা' থেকে সে বঞ্চিত, শিশুর মানসিক লালন-পালন ও শিক্ষাদান থেকে সে বঞ্চিত, সে শুধুমাত্র গর্ভধারণের যন্ত্রে পর্যবসিত। যাঞ্জুবন্দ্যু-র স্ত্রী শাসনের বিধানের কথা আগেই বলেছি। এই পুরুষেরাই সমাজের চরিত্র গঠন করে। এই ধরনের শাস্ত্র যৌন সংসর্গে নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তাকে স্বামীর যেমন খুশি ব্যবহারের যন্ত্র করে তোলে। তাই গর্ভাবস্থা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে কি এমন গর্ভাবস্থা উপভোগ করতে পারে, সে কি সামান্যতম আনন্দের সঙ্গে সন্তানের জন্মের প্রতীক্ষা করতে পারে? সত্য কথা, সব গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে এটা ঠিক নয়, কিন্তু মহাকাব্য ও পুরাণে বহু অংশে অনিচ্ছুক নারীকে পুরুষের যথেষ্ট ব্যবহারের কথা বলা হয়। এ রকম মাতৃস্ব আপনা থেকেই বোঝা হয়ে উঠত, অত্যাচার হয়ে উঠত। যুগ্ম ভাবে প্রাণ সৃষ্টি করা সন্তানকে লালন-পালন করা, সমস্যা ভাগ করে নেওয়া, দুজনে মিলে বাধা ডিঙানো, এ সব গ্রন্থে নেই। মায়েরা শৈশবে শিশুর কাছাকাছি আসতে ও থাকতে বাধ্য হত যেহেতু পিতারা তাদের বাইরের জীবিকা ও দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তাই সন্তানেরা স্বভাবতই মাকে বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনত। 'সন্তান পালনের ব্যাপারে নারীর সামগ্রিক অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে পিতা অনেক পরে উল্লেখযোগ্য এবং পরিচিত একটি সত্তা হয়ে উঠত।'(৮৪)

তা সত্ত্বেও কিন্তু যে মুহূর্তে পুত্রের দৈনন্দিন শারীরিক প্রয়োজনে মায়ের উপর নির্ভরশীলতা শেষ হত, তখন থেকেই সে তার পিতার উত্তরাধিকারী এবং কন্যা যখন শারীরিক ভাবে মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকত না, তার অল্প পরেই তাকে বিবাহ দেওয়া হত। তখন মা একা হয়ে যেত, যদি না সে একটি গর্ভ থেকে আর একটি গর্ভে চলে যেতি-যা প্রায়ই ঘটত। তারপর একটা সময় আসত যখন পরস্পর সন্তান ধারণ এবং গৃহকর্মের ফলে তার যৌবন ও রূপ চলে যেত; তখনই তার স্বামী আরও তরুণী, আরও সুন্দরী এক নারীকে ঘরে আনত, যে স্বামীকে খুশি করবে এবং তার সন্তান ধারণ এবং রক্ষা করবে।

পূর্ব স্ত্রীর কোনও কোনও সন্তান, বিশেষ করে পুত্রসন্তান, ঘরে থাকবে এবং পিতার আচরণ থেকে দাম্পত্য জীবনের একটি ছক অন্তঃস্থ করবে। তারা বুঝবে এবং তাদের বৃদ্ধা মা বুঝবে, যে মা হওয়ায় মানসিক কোনও নিরাপত্তা আসে না, সে শুধুমাত্র সন্তান জন্মের যন্ত্র, যাকে অনায়াসে ত্যাগ করা যায়, যখন তার প্রধান উৎপাদনমূলক কাজে সে ব্যর্থ হয়। তাই মাতৃস্বের মধ্যে ছিল সংশয়, উদ্বেগ, অনিরাপত্তা এবং শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, তার পরিবর্তে সামান্যই ক্ষতিপূরণের সুখ। এ কথা সত্য যে তাকে খেতে পরতে দেওয়া হত আশ্রয় দেওয়া হত, এমনকী যৌন বিষয়ে তার স্বলন হলেও তার পুত্র তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করত এবং তার জন্য প্রার্থনা করত। স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রেরা ধর্মগত ভাবে মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিত। কিন্তু তার স্বামীর জীবদ্দশাতেও যেহেতু সে সামাজিক সম্মান অল্পই পেত, তাই পুত্রেরা যে তাকে সম্মান দেখাতে বাধ্য ছিল না, এমন অনুমান কিছু উদ্ভট নয়। এটাই প্রাচীন ভারতে মাতৃস্বের প্রধান ব্যঙ্গাত্মক দিক। নারীকে মানুষ করা হত এই ভাবনায় যা তাকে শিক্ষা দিত, সে ভাবী মাতা। বালিকা কাল থেকে তাকে এই সামাজিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করা হত।

তা সত্ত্বেও, যেমন কৃষিকর্মে থাকে, তেমনই ক্ষেত্র কর্ষনের জন্য অনুষ্ঠান থাকত—পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, ইত্যাদি। কিন্তু কোনওটিতেই গর্ভবতী নারীর সুস্বাস্থ্য, সুখ বা দীর্ঘজীবনের জন্য কোনও প্রার্থনা নেই। এ রকম প্রার্থনা করা হয়। পিতার জন্য, যার এ সবার প্রয়োজন নেই, এবং ক্রুণের জন্য, যার অবশ্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু মাতা, ক্ষেত্র, তার পরে অবজ্ঞাত হয়, যত দিন না তার প্রসব হয়। মা শুধু গর্ভধারণের যন্ত্র, বেশিও নয়, কমও নয়। শিশুর আবির্ভাবের জন্য সে অত্যাবশ্যিক, কিন্তু শিশু তার পিতার, যার একটি প্রার্থনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'আমার থেকে জন্ম, অঙ্গ থেকে অঙ্গ, তুমি আমার হৃদয় থেকে জন্মেছ, পুত্র, তুমি আমারই স্বরূপ।' এখানে ক্রুণের বৃদ্ধির ব্যাপারে

মায়ের অবদান সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত এবং শিশুর মানসিক বৃদ্ধির বিষয়ে তার ভূমিকার কোনও স্থানই নেই। এতে তার সঙ্গে শিশুর মানসিক যোগসূত্রও ছিন্ন করা হয়, অন্তত ভাবগত ভাবে। নবজাতকের হৃদয় শুধু তার পিতার এটাই দাবি। ক্ষেত্র। যেমন ফসল উৎপাদন করে, কিন্তু তার উপর তার অধিকার নেই, তা ভোগ করতেও পারে না, তেমনই মাকে দেখা হত তেমনই অসার। তাই ফসল তোলার পর অনায়াসে তাকে ভুলে যাওয়া যেত।

দুটি ভাবগত অসাধারণ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। প্রথমটা হল 'মাতা সহস্র পিতার সমান' এই ধরনের বক্তব্য। যে শারীরিক জনন ছাড়া পিতা তার সম্পত্তি হিসেবে পুত্রকে পান না, এ সেই তথ্যেরই উদ্দেশ্যে স্তুতি। কতকটা ক্ষতিপূরণও বটে, কারণ আরও উক্তি আছে, 'মাতৃভক্তির দ্বারা পুত্র পৃথিবী লাভ করে, পিতৃভক্তির দ্বারা স্বর্গলাভ করে।' এর মধ্যে পিতা-মাতার ভিতরে সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। তাছাড়া মায়ের তুলনায় বাবাকে উচ্চাসনে বসাবার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে বাস্তবজীবনে মায়ের নিঃ স্বার্থ সেবা নিঃসন্দেহে তাকে তার সন্তানদের কয়েকজনের কাছে অন্তত অনেক উঁচুতে তুলে দিতে বাধ্য এবং এরই প্রকাশ ঘটেছে মাকে সম্মান দেওয়ার বিধানে।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল মাতৃকাদের অস্তিত্ব, যা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ মাতৃগণের সামাজিক বিড়ম্বনার ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করেছে। এই মাতৃকাদের অধিকাংশের সন্তান আছে, কিন্তু উপকাহিনিতে মাতা ও শিশুর রূপ বিশেষ দেখানো হয়নি, কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গিতে ছবি ও মূর্তিতে ছাড়া। এই মাতৃকারা সর্বশক্তিময়ী, অসুর হাননে শ্রেষ্ঠ; অন্তত যে অশুভ শক্তি ক্ষতি করে বলে ভাবা হয়, তারা তাকে খর্ব করেন। স্তোত্রে তাদের স্তুতি করা হয় সন্তানদের রক্ষা করার জন্য। যখন আর্ত তাঁদের কাছে আসে, তারা বর দেন এবং আর্তি দূর হয়। অর্থাৎ তাঁরা তাদের মর্ত্য সন্তানদের কাছে সাফাৎ কাঙ্ক্ষিত চেয়ে বরং

ঘাটয়িত্রী। তারা বর ও শাপের মাধ্যমে কাজ করেন, অর্থাৎ ইচ্ছামূলক উক্তির দ্বারা। এ দিক দিয়ে তাঁরা মর্ত্য মায়েদের থেকে ভিন্ন, যে মায়েদের ইচ্ছা ও উক্তি সাধারণত সম্পূর্ণ নিস্মফল। তারা তাদের সন্তানদের জন্য যা চান তা ঘটে না, যখন মায়েরা সক্রিয় ভাবে সন্তানের মঙ্গল চেষ্টা করছেন, তখনও না। প্রধান পার্থক্য অবশ্যই এই মাতৃকারা পুরোপুরি মুক্ত, স্বাধীন কর্তা, কিন্তু মর্ত্য মায়েরা স্বামী, স্বশুর-শাশুড়ি ও অন্যান্য গুরুজনের অধীন, এমনকী বার্ধক্যে পুত্রেরও অধীন। এছাড়া এবং এরই ফলে, মর্ত্য মায়েরা মাতৃকাদের অতিলৌকিক শক্তির অধিকারী নন, এমনকী লৌকিক শক্তিরও অধিকারী নন। স্বামী ও গুরুজনের অধীন, প্রত্যক্ষ কর্ত্রী হিসেবে সম্পূর্ণ শক্তিহীন মর্ত্য মায়েরা ক্ষমতাহীনতার বেদনা ভোগ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাতৃক পূজকেরা দেখান, তারা ভাবগত ভাবে মাকে কত উষ্ণে তুলেছেন যা তারা সত্যি সত্যি তুলেছেন, তা হল 'মাতৃস্নেহের ভাবনা'। একে সেই স্তরে তুলেছেন যেখানে তারা অসুরদমন করেন, প্রলয় রোধ করেন, যেমন পূর্বে পুরুষ দেবতারা করেছেন।

অভাগিনী মর্ত্য মায়েরা কি মাতৃকার মূর্তি ও উপকাহিনি থেকে কোনও সাস্কনা বা মানসিক পুষ্টি পেতে পারেন, যে মূর্তি পুরুষ দেবতাদের শক্তিরূপে সৃষ্টি করেছেন। মূল কল্পনাটি আসে সাংখ্যদর্শন থেকে, যেখানে পুরুষ নিষ্ক্রিয় ভাবে তার সঙ্গিনী প্রকৃতিকে দিয়ে কাজ করায়। তন্ত্র এই দর্শনকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে, যখন শক্তি একই উল্লেখযোগ্য এবং শক্তিময়ী দেবী হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে মাতৃকাদের উন্নয়ন ও মর্ত্য-মায়েদের অবস্থার ক্রমিক অবনমনের মতো বিরাট পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে। এই দুটি ঘটনা। কুড়িটি ধর্মশাস্ত্র এবং শাস্ত্রগ্রন্থনিবন্ধের মাঝখানে ঘটেছে। সমাজে নারী হিসেবে, স্বাধীনচেতা কাঙ্ক্ষিনী হিসেবে সামাজিক সত্তা হিসেবে, মুক্ত যৌনসঙ্গী হিসেবে, শিশু পালনে সম-দায়িত্বশীল মাতা হিসেবে, সন্তানের গড়ে-ওঠা ও বৃদ্ধিতে সব

সিদ্ধান্তে সহযোগী হিসেবে তাঁর অবস্থান সমানেই নেমে গেছে। মর্ত্য-মা সন্তানের জন্য যা করে দেবী তা করে না: মর্ত্য-মানটি কষ্টদায়ক মাস ধরে ভূগকে গর্ভে ধারণ করে এবং প্রবল যন্ত্রণায় তাকে প্রসব করে; সে শিশুকে স্তন্য দান করে, খাওয়ায়, তার কাপড় বদলায়, তাকে ঘুম পাড়ায়, তার সব শারীরিক প্রয়োজন দেখাশোনা করে, রোগে সেবা করে। অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এই শারীরিক কাজগুলি থেকে মাতৃকারা দেবী হিসেবে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত। কিছুদিন পরে যখন পিতা দায়িত্ব নেয়, মা তখন নীরব ও কতকটা সুদূর দর্শক হয়ে থাকে, পরিবর্তে খুব কমই দাবি করে: ঋচিৎ আনুষ্ঠানিক সম্মান, বার্ষিক্যে ভরণপোষণ এবং প্রয়োজন মতো পৌত্রপৌত্রীদের দেখাশোনা। মাতৃকা কিন্তু ভাবগত ও মানসিক স্তরে তার সন্তানদের সঙ্গে যুক্ত হয়, প্রায়ই সম্মান ও পূজা পায় এবং বিপদের সময়ে তারা বিপদ দূর করতে শক্তিময়ী বররূপা বাণী উচ্চারণ করে। অপর দিকে তারা দৈবস্তরেও সক্রিয়। যেখানে পুরুষ দেবতারা প্রলয় রুখতে নিৰ্ম্মফল হয়। মাতৃকারা সেখানে সফল। এই মহতী মূর্তিগুলির সঙ্গে কি কোনও মর্ত্য মাতা সম অনুভূতি বোধ করতে পারে, না নিজেকে এই দেবী রূপে প্রকাশ করতে পারে?

এদের স্থান দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিতে: একজন তার গুরুতর রূপে সীমিত সাংসারিক প্রদেশে, যেখানে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পিতার আয়ত্তে বলে তার সন্তানদের মঙ্গলের জন্যও নিজের ইচ্ছা খাটাবার স্থান নেই; তাকে কোনও পর্যায়ে তার মত জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করা হয় না, কিন্তু দেবী মায়ের ইচ্ছা মহাবিশ্বের স্তরে সৃজনশীল। মাতৃকা তার কাজ করে কোনও ব্যথা ছাড়াই, দৈব আনন্দে; মর্ত্য মাতা মাতৃত্ব শুরু ও শেষ করে ব্যথার মধ্যে। পুত্র তার শিক্ষা ও জীবিকা শুরু করলে, কন্যার বিবাহ হয়ে গেলে, মা ফিরে যায়। তার একাকিত্বের বাঁধা গুটিতে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আবার গর্ভধারণ না করে। তার মাতৃত্ব তাকে কয়েক মাস আনন্দ দেয়, যতদিন তার শিশু খুব ছোট আছে,

তার প্রতি নির্ভরশীল আছে। কিন্তু শীঘ্রই-বড়বেশি শীঘ্র, এই সংক্ষিপ্ত মুক্তির কাল শেষ হয়ে যায় এবং মাতৃস্বের উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে নিশ্চিত ভাবে মিলিয়ে যায়।

প্রাচীন ভারতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

বৈদিক সাহিত্য (বিশেষ করে ঋগ্বেদ সংহিতা) সাধারণ ভাবে সে যুগে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে নীরব। যদিও পুরুষের অর্থনৈতিক অবস্থান, তাদের জীবিকা ও সম্পদ সম্বন্ধে কিছু তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু নারীর সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। আমরা জানি বৈদিক নারীরা পশম পাকাত ও সম্ভবত বুনত, জল আনত, পশুপালন করত, কিন্তু কেবলমাত্র খোরপোষ বাদে তারা এই সব কাজের জন্য কিছু উপার্জন করত কি না তা জানতে পারি না। নিঃসন্দেহে নারীরা গৃহকর্ম করত; রান্নাঘর ও শিশুপালন তাদেরই এক্তিয়ারে ছিল, কিন্তু এখনও যেমন হয় তখনও সেই কাজগুলির অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোনও হিসেব হত না, ফলে কোনও মাইনে দেওয়া হত না। কুমারীর কোনও পৃথক সত্তা ছিল না; সে তা এক ভাবে পেত। কেবল বিবাহের পরে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে স্পষ্ট ভাবে পুত্রকে বর এবং কন্যাসন্তানকে অভিশাপ বলে অভিহিত করা হয়। তাই স্নেহশীল পিতামাতা বাদে অন্য সকলে কন্যাকে, খুব কম করে বললেও, উৎপাত মনে করত। বিবাহের সময়ে দান করে দেওয়ার আগে পর্যন্ত গৃহে তার উপস্থিতি কোনও রকমে সহ্য করা হত।

পরবর্তী এক সংহিতায় কিন্তু অত্রি বলেছেন, পিতার, ভ্রাতার বা পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তিতে কুমারীর অধিকার আছে।'(১) এই সম্পত্তি বিক্রি করার, বাঁধা দেওয়ার বা নিজের বলে ভোগ করার সম্পূর্ণ অধিকার তার

ছিল। অবশ্যই আমরা এখানে প্রৌঢ়া কুমারী-কুলপা কুমারী, আমাজু বা অমাজুরার কথা চিন্তা করছি। 'সাংকৃত্যয়নী' বা 'পণ্ডিত কৌশিকী', উপনিষদের ব্রহ্মবাদিনীর আধ্যাত্মিক মানসকন্যা, যাদের কাছে সম্পত্তির অধিকার, বিক্রয় বা বন্ধকের কোনও গুরুত্ব ছিল না তাঁরা সাহিত্যে উল্লিখিত। হয়তো আরও কোনও কোনও প্রৌঢ়া কুমারী থাকত, যারা না ছিল পণ্ডিত, না করত ধ্যান, যাদের অর্থের প্রয়োজন ছিল জীবনধারণের জন্য, হয়তো ভাল ভাবে ও স্বাধীন ভাবে জীবনধারণের জন্য। এমনও হতে পারে যে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের সম্পত্তির উপর অধিকার ছিল। কিন্তু অত্রিও সম্পত্তি দান করার অধিকারের কথা কিছু বলেন না। আমরা পরে এই বিষয়ে আসব।

'যে কুমারীকে বিক্রি করা বা কেনা হয়েছে, তাকে কখনও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা যায় না।'(২) এর থেকে প্রমাণ হয়, কুমারীদের বেচা-কেনা চলত। কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের মতে, অত্যন্ত দুর্গতির অবস্থায় পিতামাতা উভয়ের সম্মতিতে তা সম্ভব হত। কুমারী হিসেবে যে স্ত্রী কেনা হয়েছে, তার গর্ভস্থ পুত্রসন্তান পিতার শ্রদ্ধাদিকর্মের অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হত। বিবাহের কারণে কুমারীর সতীত্ব, অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিতে তার কৌমার্যের অক্ষমতা, যথেষ্ট ভাবে কলুষিত করা যেত না। যে ঈর্ষাবশত তা করে তাকে ২২৫ পণ দণ্ড দিতে হয়।'(৩) অতএব তার সামাজিক মর্যাদার অর্থমূল্য ছিল। যে দোষযুক্ত কন্যার দোষগুলি ঢাকা দিয়ে বিবাহ দেয়, তার বরকে ৯৬ পণ দণ্ড দিতে হত।(৪)

'যে দ্বিজ তার পত্নীর বান্ধবীকে (মনে হয় কুমারী) জানে... তাকে সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করতে হবে এবং একটি দুগ্ধবতী ধেনু দান করতে হবে।'(৫)

মনু অনুষ্ঠা দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ ভাইয়েরা তাদের পৈতৃক সম্পত্তির তাদের যে ভাগ তার এক চতুর্থাংশ করে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের অবিবাহিতা ভগ্নিকে দেবে। তা না করলে তাদের সর্বনাশ হবে।(৬) গৌতম বলেছেন, অবিবাহিত কন্যারা যদি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তারা মায়ের মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।(৭) অবিবাহিত কন্যার ভাইয়েরা মাতার মৃত্যুর পূর্বে না। পরে তার স্ত্রীধন দেবে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্র এবং তাঁর বহু পূর্বে তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী) অনুসারে: 'স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া আদায়াদীঃ'(৮), অর্থাৎ সাধারণ ভাবে নারীরা (বিশেষ করে ভগ্নির) পারিবারিক সম্পত্তির ভাগে অনধিকারী।(৯)

কুমারীর বাগদত্ত পতি মারা গেলে সে শুধু তার পিতারই। কুমারী যদি বলপূর্বক অপহৃত হয় এবং অপহরণকারী তাকে বিবাহ না করে, তবে আইনত অপরের সঙ্গে তার বিবাহ হতে পারে।(১০) 'নববধূ কুমারী কন্যা, রুগ্না অন্তঃপুরিকা, গর্ভিণী-গৃহস্থ অতিথিকে ভোজন করাবার পূর্বে এদের ভোজন করাতে পারে।'(১১) কন্যাদের কখনও কখনও কিছু শিক্ষা দেওয়া হত, যদিও বৈদিক শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল; ভরদ্বাজ গৃহ্য সূত্র-তে কোনও কন্যাকে বিবাহ করার বিষয়ে চারটি আগ্রহের কারণ দেখানো হয়েছে—ধন, রূপ, বুদ্ধি ও বংশ।(১২) বুদ্ধির পরিবর্তে মানব গৃহসূত্রে বিদ্যা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বৃহদারণাকোপনিষদ-এ পণ্ডিত কন্যালাভের জন্য অনুষ্ঠানের নিয়ম আজ।(১৩) এই সব শাস্ত্রগ্রন্থের থেকেই গার্গী, সুলভা, প্রমুখ বিদুষী নারীদের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু যদিও বৈয়াকরণ শিক্ষয়িত্রী নারী বোঝাতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তৈরি করার নিয়ম করেছেন,(১৪) তারা শিক্ষার দ্বারা উপার্জন করতে পারতেন কি না তা জানিবার আমাদের কোনও উপায় নেই। খুব সম্ভব না, কিন্তু ব্যতিক্রম

থাকতে পারে। একটি অত্যন্ত অর্বাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থ বলে, 'গৃহস্থের উচিত পুত্রের মতো কন্যাদেরও সমান শিক্ষা দেওয়া।'(১৫)

আট ধরনের বিবাহের কয়েকটিতে বধুর পিতা বরের আত্মীয়দের অর্থ দিত; কেবলমাত্র আসুর বিবাহে বরের পিতা মাতা পণ দিত। আসুর বিবাহে বর নিজের কামনা চরিতার্থ করতে বধুর পিতাকে এবং বধুকেও পণ দেয়।(১৬) ব্রাহ্ম, দৈব ও আর্ষ বিবাহে বধুর পিতা নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ধন, অলংকার, একজোড়া বলদ এবং অন্যান্য উপহার দেবে। ব্রাহ্ম বিবাহে প্রসাধিতা ও সুসজ্জিত কন্যাকে দান করা হত, আর্ষ বিবাহে বধুকে সম্প্রদান করা হত বরকে একটি বলদ ও একটি গরু বা দুটি বলদ ও দুটি গরু দান করার পরে।(১৭) এই প্রথার প্রতি তৎকালীন সামাজিক জুগুপ্সার প্রকাশ হয় আসুর নামটায়। কিন্তু বিবাহের সময়ে যখন অর্থদান হত তখন বন্ধু বা তার পিতামাতাই তার সুযোগ পেত। যাকে স্ত্রীধন বলে, তা তিন প্রকারের: পণ, যা দিয়ে বন্ধুকে কেনা হত; যৌতুক, অর্থাৎ বিবাহের সময়ে আত্মীয়-বন্ধুরা বধুকে যে উপহার দিত এবং সৌদায়িক অর্থাৎ বধু বা বরের গৃহে আত্মীয় বন্ধুদের বধুকে বা দম্পতিকে দেওয়া উপহার। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন: নারীকে তার বন্ধু, মাতা, স্বামী বা ভ্রাতা যা দেয়, তা হল স্ত্রীধন।(১৮) তার আত্মীয়স্বজন (অর্থাৎ তার পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধীয় ব্যক্তির) এবং তার স্বামী অথবা পিতার পরিবার তাকে বিবাহের পর শুষ্ক স্বরূপ যা দেয়, তাও স্ত্রীধন।(১৯) স্পষ্টতই সে সময়ের সমাজ বরের কাছ থেকে বধুর পিতা যে অর্থ নেবে এটা পছন্দ করত না। মনু বলেছেন, স্ত্রী পিতা কখনওই কন্যাশুষ্ক নেবে না, কারণ লোভাবশত কন্যাশুষ্ক নিলে সে তার সন্তানকে বিক্রি করছে।(২০) এমনকী গেমিথুন বা বলীবর্দয়ুগল (কন্যার পিতা বরের কাছ থেকে গ্রহণ করলে) তাও কোনও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে পণ বলে গণ্য হয় (পাণ গ্রহণ করা, তা বহুমূল্যই হোক বা অল্প মূল্যই হোক কন্যা বিক্রয়ের

সমান')। লক্ষ্য করা যায়, বরকে পণ দেওয়ার প্রথা ছিল-স্পষ্ট ভাবেই হোক বা গুঢ় ভাবেই হোক; কিন্তু বরের পিতার পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে কোনও শাস্ত্র নেই, কেউ এই আদান-প্রদানকে বিক্রি বলে না, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা বিক্রয়ই।

'কন্যাশুঙ্কের বিরুদ্ধে এই যে নির্দেশ, তার দ্বারা সূচিত হয়। বরপণের সপক্ষে পুরোমাত্রায় স্টোক। এটা কুশাণ যুগের সংস্কৃতায়নের একটি অবশ্যস্বাভাবী লক্ষণ-যে সময়ে মনুসংহিতার প্রথম সংস্করণ রচিত হয়েছিল। আধুনিক পণ সম্পূর্ণ ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কর্তৃক শৃঙ্খলমুক্ত শক্তিগুলির কার্য।'(২১)

'পাণপ্রথা অসাম্য, অনিশ্চয়তা ও আকস্মিকতার দ্বারা নিরূপিত।'(২২) বরের জন্য পণ হল hypergamy (উচ্চতর বিবাহ প্রথা), যা ক্রমিক স্তর বিশিষ্ট বর্ণগুলির মধ্যে ব্যাপক; উচ্চতর শ্রেণিগুলিতে প্রধানত পণ এবং নিম্নতর শ্রেণিগুলিতে প্রধানত কন্যাশুঙ্ক এবং পণ ও কন্যাশুঙ্ক দুটাই সামাজিক প্রতিষ্ঠাকামী মধ্যস্তরের পরিবারগুলিতে ব্যাপক।'(২৩)

পণই হোক বা কন্যাশুঙ্কই হোক-তা সমাজে সম্পন্নতার পরিচায়ক, কিন্তু বরাপণ কন্যাশুঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু কন্যাশুঙ্ক গ্রহণের এই যে অনিচ্ছা, তা মনে হয় অনেকগুলি সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। সম্পন্নতা যার ফলে বধুর পরিবার পণ দিতে পারে, তা তো বটেই, এটি ইঙ্গিত দিতে পারে ব্যাপক যুদ্ধের অবসানের, যে যুদ্ধ পুরুষের সংখ্যা হ্রাস করছিল, উচ্চতর বিবাহ প্রথার কামনা, সম্পদ দিয়ে সামাজিক সিঁড়িতে উপরে ওঠা এবং শেষ পর্যন্ত এর ভিত্তি হয়তো এমন কোনও ধারণা, যাতে বধুর পিতা বুঝতে পারছিল যে সে যা পণ হিসেবে খরচ করেছে তা তার পুত্রের বিবাহের সময়ে আদায় করতে পারবে। এই প্রথা অবশ্যই ইঙ্গিত করে নারীর সামাজিক অবনমনের, কারণ যখন একজন পুরুষ একটি কুমারীকে বিবাহ করে এবং

তাকে চিরকৌমার্যের লজ্জা থেকে উদ্ধার করে, তখন কন্যার পিতার তাকে কিছু মূল্য দিতে হয় এই উপকারটুকুর জন্য। আড়ম্বর এবং জাকজমক দেখাবার বাসনাও এখানে ছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলির সময়ে সমাজের উপর যাঁর প্রভাব ভগবদগীতা এবং বাৎস্যায়নের সঙ্গে সমান ভাবে প্রবল ছিল সেই মধু দুই সহস্র বছর ধরে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিবাহের বিবরণ দিয়েছেন, যার প্রথম তিনটিতে কন্যার পিতা পণ দেয়, বরকে উপহার দেয়; কেবলমাত্র আসুর বিবাহে এর বিপরীতটাই ঘটে। এর নিচ অর্থে ব্যবহৃত নাম 'আসুর' হয়তো দ্রাবিড় অঞ্চলে এর উদ্ভবের সূচনা করে—যেখানে দুশো বছর পূর্ব পর্যন্তও এটি ব্যাপক প্রচলিত প্রথা ছিল।

কিন্তু 'কন্যাশুল্ক' অর্বাচীন বৈদিক যুগ থেকে নিয়মিত প্রথা হিসেবে গৃহীত হয়ে এসেছে। আমরা শুনি, ইন্দ্র তুমি ঈশং ত্রুটিগ্রস্ত জামাতা বা শ্যালকের তুলনায় অনেক বড় দাতা।'(২৪) অতএব ত্রুটিযুক্ত বরেরা অর্থমূল্য ঋতিপূরণ দিত। কন্যাশুল্কের সঙ্গে পণকে মেলানোর এক প্রচেষ্টা দেখা যায় আপস্তুম্ব ধর্মসূত্রে (২:৬:১৩:১০:১১)। সেখানে বলা হয়েছে, 'এ বিষয়ে ক্রয়-বিক্রয় বলে কিছু নেই। বিবাহকালে একশত মহারথী দিতে হবে, এবং তারপর তাদের দাতার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।' এখানে ক্রিয় শুধুমাত্র প্রশংসার উক্তি; সম্বন্ধের মূল ধর্ম। কৌটিল্য বলেছেন, 'শ্লেচ্ছদের পক্ষে কন্যাবিক্রয় নিন্দনীয় নয়।' (২৫) যাঞ্জবল্য খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলেছেন, পুত্র বা কন্যা, কাউকেই বিক্রয় করা যায় না। (২৬) এই অংশের উপর মিতাক্ষরা টীকায় বলা হয়েছে 'যদিও কেউ তার পত্নী বা কন্যাকে বিক্রয় করতে পারে না, তবুও সে তাদের প্রভু।' মনে পড়ে, পুত্র শূনঃশেফিকে পিতা বিক্রয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু কন্যা বিক্রয়েরও উদাহরণ আছে।

পনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বধুর ভরণপোষণের মূল্য হিসেবে। এই মত যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ বধু তার সংসারের কাজকর্মে সাহায্য করে এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও উপাদান করে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটি কন্যাদানের দক্ষিণা। এ কথাও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তথাকথিত দক্ষিণা সামাজিক অস্তিত্বহীন নারীর দানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। এসথার বোসরাপ বলেন যে, বাইরের জগতের উপাদানশীল শ্রমশক্তির থেকে নারীকে সরিয়ে নেওয়ার পর পণ এল ক্ষতিপূরণ হিসেবে, কারণ তাদের জায়গায় পুরুষদের পারিশ্রমিক দিয়ে আনতে হল। (২৭) এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের কিছুটা উপাদান থাকতে পারে। পণ স্ত্রীধন নয়, কারণ এটি বরের পিতার প্ররোচনায় দেওয়া হয়। এম এস শ্রীনিবাস বলেন, 'ভারতীয় উপদ্বীপ ছিল ব্রাহ্মণদের নিয়ে কন্যাশুঙ্ক এলাকা; সেখান থেকে তা উচ্চতর বিবাহ প্রথার প্রতি এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি আকাঙ্ক্ষাবশত উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।' (২৮)

এখন বধুর পিতা যে পণ দিত তা বর ও তার পিতাকে দেওয়া হত, ফলে তা স্ত্রীধনের অংশ কোনও মতেই হত না; তার ব্যবহার বা অপব্যবহার সম্বন্ধে স্ত্রী কোনও কথাই বলতে পারত না। যদি বর কন্যাশুঙ্ক দেওয়ার পরে ভাবী বধু মারা যেত, তাহলে সে যা দিয়েছে তা ফিরিয়ে নিত। (২৯) অপরাধের একটি অর্বাচীন গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা হয়েছে 'সৌদায়িকের উপর স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার'—এমনকী স্বাবর সম্পত্তি হলেও সে তা বেচিতে বা দান করতে পারে। সে তা অবিকৃত রাখতে পারে; তার স্বামী, পুত্রেরা, তার বা তার স্বামীর ভাইয়েরা তা গ্রহণ করতে বা দান করতে পারে না; তার উপর নারীর সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু তার আত্মীয়-বন্ধুরা বিবাহের সময়ে তার পিতৃগৃহে যা দেয় তা নির্বাচিত ভাবে যৌতুক, এক শ্রেণির স্ত্রীধান, এবং যা দম্পতিকে বধু বা বরের গৃহে দেওয়া হয় তা সৌদায়িক এবং তার অন্তত অর্ধেকের উপর

বধুর অধিকার। মনু আরও বলেছেন, 'যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করে, তার সমান পরিমাণ ধন (প্রথমা স্ত্রীকে) উচ্ছিন্ন করার জন্য ঋতিপূরণ স্বরূপ দিতে হবে, যদি তাকে স্ত্রীধন না দেওয়া হয়ে থাকে। যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে অর্ধেক দিতে হবে।' (৩০) কিন্তু 'পুত্রহীনা পুত্রিকার মৃত্যুর পরে তার স্বামী তার সমস্ত সম্পত্তি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে। (৩১) বিষ্ণু কিন্তু বলেছেন যে অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি তার স্ত্রীগামী হয়, তারপর তার কন্যারা, তারপর তার ভ্রাতারা এবং তারপর তার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তা পায়। (৩২)

এই সব গ্রন্থে আমরা সামাজিক নিয়ম ও মনোভাবের নানা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও কালিক ব্যতিক্রম পাই। কোনও কোনও শাস্ত্রকার অপরদের চেয়ে একটু বেশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। কিন্তু সাধারণ চিত্রটা স্ত্রীদের পক্ষে। আশাহীন ও নির্মম। স্বামী তার পরবর্তী বিবাহের সময়ে তাকে যা দেয় তা সম্পূর্ণ ভাবে তার নিজস্ব। নারদ বলেন, দ্বিতীয় বিবাহের সময়ে স্বামী তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ তার স্ত্রীকে দেবে এবং সেই সম্পত্তি তার নিজের মতো ব্যবহার করার স্বাধীনতা স্ত্রীর আছে—অন্তত পুথিগত ভাবে। যাঙ্গুবল্ক্য বলেছেন, দুর্ভিক্ষ, অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রোগ বা তা নিজের কারারুদ্ধ থাকার সময়ে ছাড়া স্বামীর স্ত্রীধন স্পর্শ করার অধিকার নেই। (৩৩) যদিও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিগুলি যথেষ্ট নিরীহ শোনায়, সেগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সুবিধা মতো ব্যাখ্যা করার অনেক ফাঁকফোকর রেখে দেয়। আর এক জায়গায় যাঙ্গুবল্ক্য বলেছেন, 'স্বামী দুর্ভিক্ষের কালে, কর্তব্যপালনের জন্য, রোগে অথবা বন্দিদশায় যদি স্ত্রীধন ব্যবহার করে তবে তা ফেরত দিতে সে বাধ্য হবে। না। (৩৪) অপর এক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ বা প্রজাপত্য বিবাহে নিঃসন্তান নারীর স্ত্রীধন তার স্বামী পায়।' তাই নারী তার নিজস্ব সম্পত্তি ব্যবহার করবে, সমাজ এটা দেখতে পারত না বা মেনে নিতে পারত না। বশিষ্ঠ খুব স্পষ্ট ভাবেই তা প্রকাশ করেছেন: 'স্বামীর পুনর্বিবাহের সময়ে তাকে যা দেওয়া হয়েছে, যা তাকে তার

আত্মীয়স্বজন দিয়েছে (সৌদায়িক বা যৌতুক হিসাবে) এবং তার শুষ্ক অর্থাৎ যা তাকে বিবাহের পর দেওয়া হয়েছে, তা নারীর সম্পত্তি, তার স্ত্রীধন। (৩৫) মনু বলেন মাতার স্ত্রীধন কন্যার প্রাপ্য এবং কন্যার পুত্র অপুত্রক পুরুষের সমস্ত সম্পত্তি নেবে। (৩৬) কিন্তু মনু আরও বলেছেন, 'কোনও নারীর বন্ধু বা আত্মীয়েরা মূঢ়তা বা লোভাবশত যদি তার সম্পত্তি ভোগ করে, বা সে সব পাপীরা তার নিজের সম্পত্তি বস্ত্রাদির ভোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে, তাহলে তারা নরকে যায়। (৩৭) প্রথমত, পুথিগত ভাবে নারীর সম্পত্তি বস্ত্রাদি' ছাড়াও আরও অনেক বেশি কিছু কোন্ডাতে পারে। কেননা, গ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে। এ সম্পত্তি এমন হতে পারে, যা 'বন্ধু এবং আত্মীয়েরা লোভাবশত ভোগ করতে পারে।' একটি খুব প্রাচীন গ্রন্থ, মৈত্রায়ণী সংহিতা, যা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর বৈদিক গ্রন্থ, সেখানে বলা হয়েছে, 'নারীর যে আত্মীয়েরা তার স্ত্রীধন গাড়ি, কাপড়-চোপড় এবং স্বর্ণালংকার বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করে, তারা পাপ করছে এবং পরলোকে তারা আরও দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে।' (৩৮) সুতরাং 'বস্ত্রাদি' কেবলমাত্র চোখে ধুলো দেওয়া; স্বশুরবাড়ির লোকেরা কখনও কখনও, খুব সম্ভব প্রায়শই নির্লজ্জ ভাবে নারী যে সম্পত্তি নিয়ে এসেছে তা ভোগ করত। তাই ধনী পিতার কন্যাও— যা তার স্ত্রীধন থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়—স্বশুরবাড়িতে সত্যকার কোনও নিরাপত্তা পেত না। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং সেই কারণে অর্থকরী জীবিকা থেকে বঞ্চিত, অসহায়, স্বশুরবাড়ির প্রবল ভাবে সংখ্যাগুরু লোভী মানুষগুলির মধ্যে আশাহীন সংখ্যালঘু নারীর তার নিজস্বের যা কিছু তা রক্ষণ করার সত্যিকারের কোনও উপায় ছিল না— তা ভোগ করা তো দূরস্থান। সুতরাং এ ধরনের ঘটনা ঘটত—শাস্ত্রকার শূন্য কল্পনা করছেন না, নিম্পাপ মস্তিষ্কে কুবুদ্ধিও ঢোকাচ্ছেন না। নরকে যাওয়ার বা পরকালে গুরুতর দুর্ভাগ্য ভোগের ভয় সেই বেচারি মেয়েটির স্ত্রীধন ভোগ করা থেকে তাদের কতটা বাধা দিত সেটাই চিন্তনীয়। অনুপার্জিত ধন ভোগ করা বেশির

ভাগ ক্ষেত্রেই বেশ লোভনীয়। দেবল অবশ্য দাবি করেছেন যে, কন্যাশুল্ক এবং সুন্দ থেকে পাওয়া লভ্যাংশ নারীর নিজস্ব সম্পত্তি, স্বামীর তার উপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। জৈমিনিও বলেছেন, নারী বিশেষ কোনও কোনও ধরনের সম্পত্তির অধিকারিণী। কিন্তু কাতায়ন বলেন, নারী তার শিল্পকর্মের দ্বারা যা উপার্জন করে এবং যা আপরে ভালবেসে তাকে দেয়, স্বামী তার অধিকারী। বাকি যা থাকে, তা স্ত্রীধন।(৩৯) এটা পরিষ্কার যে, বিশেষ কিছুই আর বাকি থাকে না, কারণ কাতায়নের নির্দেশ নারীর উপার্জন এবং উপহার স্বামীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। অন্য কোনও রকম স্ত্রীধন কল্পনা করা দুষ্কর।

গৃহস্থলির অর্থ এবং সম্পত্তি ব্যবহারে স্ত্রীর ভূমিকা কী? আপস্তুষ্ব বলেছেন, 'দম্পতি পারিবারিক ধন ব্যবহার করত।'(৪০) এমনকী দার্শনিক গ্রন্থ পূর্বমীমাংসাও বলেছে: দম্পতি যৌথ ভাবে সম্পত্তির অধিকারী।'(৪১) মনে পড়ে সংস্কৃত দম্পতি' শব্দের ইন্দো-ইউরোপীয় মূল শব্দটি এসেছে দোমোস+পতি— গৃহস্বামী থেকে। স্পষ্টতই আপস্তুষ্ব এবং পূর্বমীমাংসা দুইয়েই শব্দের মূল অর্থের সূচনা আছে।

স্বামী যদি কাজের জন্য বাড়ি ছেড়ে যায়, তাকে আগে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে রেখে যেতে হবে।'(৪২) 'তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী যদি মদ্যপান করে বা প্রকাশ্য নৃত্যানুষ্ঠানে যায়, তাকে ছয় কৃষ্ণল দণ্ড দিতে হবে।'(৪৩) কিন্তু স্বামী বা পুত্রের ঋণ শোধ করতে নারী বাধ্য নয়।(৪৪) গোয়ালা, সুরাবিক্রেতা, অভিনেতা, রাজক ও শিকারীর স্ত্রী যে ঋণ করবে তা তাদের স্বামীরা শোধ করবে, কারণ তাদের জীবিকা তাদের স্ত্রীর উপার্জনের উপর নির্ভর করে। যে ঋণ সে নিজে শোধ করবে বলে প্রতিশ্রুত, যে ঋণ সে তার স্বামীর সঙ্গে করেছে এবং যা সে নিজে নিয়েছে, এ সবই নারীকে শোধ করতে হবে: অন্য কিছু শোধ করতে সে বাধ্য নয়। 'ঋণী ব্যক্তির স্ত্রীকে নিলে

তার স্বামীর ঋণ শোধ করতে হবে।'(৪৬) ঋণ শোধের প্রশ্নটিই নারীর শোধ করার ক্ষমতা উত্থাপিত করে। কিন্তু সে রকম ক্ষেত্রে শোধ করা হয় যৌথ পারিবারিক কোষ থেকে এবং যদি নারীর অধিকার না থাকে তাকে সম্ভবত তার নিজস্ব স্ত্রীধন থেকে। এই ধারণার পিছনে এই অনুমান কাজ করে যে, নারীর সম্পত্তিতে অধিকার থাকা উচিত নয়, তাই তা নেই। মেধাতিথি বলেন, নারী যা উপার্জন করে তা তার স্বামীর।(৪৬) আপস্তুশ্ব বলেন, 'কোনও কোনও পূর্বাচার্য মনে করেন, অলংকারগুলি স্ত্রীর নিজস্ব এবং যে সম্পত্তি তার পিতৃকুল থেকে লব্ধ তাও তার নিজস্ব।'(৪৭) মনে হয় স্ত্রীর অলংকারের উপরেও তার স্বত্ব বিষয়ে মতভেদ ছিল—যে অলংকার সে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে এনেছে! বৌধায়ন বলেছেন, 'কন্যা মাতার অলংকার ও আর যা নিয়মসঙ্গত, তা পেয়ে থাকে।'(৪৮) মনু স্ত্রীধনের একটি উর্ধ্বসীমা ধার্য করেছেন— ২০০০ পণ পর্যন্ত।(৪৯) কিন্তু ভূমি বা গৃহ স্ত্রীধন হতে পারে না। এই শাস্ত্রকাররা এটা বলেন, সম্ভবত এই কারণে যে, সেগুলি শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। জৈমিনি এ বিষয়ে একমত যে নারী কিছু কিছু সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারে এবং হয়ও। মনু বলেছেন স্ত্রীধনের উৎস দুটি: বিবাহের সময়ে, যাত্রার সময়ে, প্রীতির কারণে দান, ভ্রাতা ও পিতামাতার দান। কাত্যায়ন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যোগ করেছেন: যা সে শিল্পকার্য দ্বারা উপার্জন করে এবং যা তাকে ভালবেসে দেওয়া হয় তা তার স্বামীর অধীন, বাকিটুকু স্ত্রীধন।(৫০) এক নির্ভুর উপলব্ধি হয় যে, তার নিজস্ব উপার্জন তার নিজের নয়। 'যৌতুক' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ, যা একত্র উপবিষ্ট যুগলকে (যুতক) দেওয়া হয়।(৫১) দুষ্টা অমিতব্যয়িনী স্ত্রীর স্ত্রীধনের উপর অধিকার নেই।'(৫২) দুষ্ট ও লোভী শ্বশুরবাড়ির লোকেদের পক্ষে স্ত্রী যে অমিতব্যয়িনী এ কথা প্রমাণ করা এবং যা আইনত তার নিজের তা কেড়ে নেওয়া খুব কঠিন ছিল না। 'স্বামীর প্রতিশ্রুত স্ত্রীধন স্ত্রীকে অবশ্যই দিতে হবে'(৫৩)—এ কথা বলার পরও আইনের ফাক খুঁজে নেওয়াটা সমস্যা ছিল না।

কন্যাশুঙ্ক দেওয়া স্ত্রীর উপরে একটা বোঝা চাপানো, কারণ সে এবং অন্য সকলে তাকে পণ্যদ্রব্য বলে মনে করত। প্রাচীন গ্রন্থ মৈত্রায়ণী সংহিতায় বলা হয়েছে, 'স্বামী যে স্ত্রীকে ক্রয় করেছে, সে যখন অপরের সঙ্গে ব্যভিচার করে, তা মিথ্যাচার।' কিন্তু মনে রাখতে হবে, যখন পণপ্রথার প্রচলন ঘটল, তখন বর। কখনওই নিজেকে পণ্যদ্রব্য মনে করত না, যদিও সে স্ত্রীর তুলনায় অনেক বেশি পণ্যদ্রব্য কারণ পণের তুলনায় কন্যাশুঙ্ক প্রায় কিছুই না, পণ হল সামাজিক প্রতিষ্ঠার লক্ষণ ও অন্যায়্য এবং নির্লজ্জ ভাবে অর্থ আদায়।

মনু বলেন, 'স্ত্রীকে জোর করে বশে রাখা যায় না; নিম্নোক্ত উপায়গুলি প্রয়োগ করে তাকে বশে রাখতে হয়। স্ত্রীদের নিযুক্ত করতে হবে অর্থ সঞ্চয় ও ব্যয় করার কাজে (অর্থাৎ পরিবারের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণে) এবং নিজেদের দেহ, গৃহ, বিছানাপত্র, বস্ত্র, আসবাবপত্র পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে। গৃহে বন্দি থাকলে এবং পুরুষ আত্মীয়দের পাহারায় থাকলেও (দুষ্ট) নারী যথেষ্ট রক্ষিত নয়।'(৫৪) তাহলে স্ত্রীকে বশে রাখা, যা কি না বৈধ পুত্রসন্তান লাভে আবশ্যিক, তার একটি উপায় হল, তাকে নানা রকম গৃহকর্মে নিযুক্ত রাখা, যেগুলি আর্থিক মূল্যে কখনওই রূপান্তরিত করা যায় না, যার ফলে সর্বদাই তার নিজেকে পরিবারের আর্থিক বোঝা বলে মনে হত।

স্বামী হারাবার পর সমাজ তাকে দেখতে শুরু করত। আর্থিক বিপদ এবং ভার হিসেবে। কৃষিপ্রধান সমাজে যৌথ পরিবার ছিল মূল, সেখানে পরিবারের সম্পত্তি কর্ষণীয় ভূমি ভাগ করার আশঙ্কা খুবই বাস্তব ছিল। এ ব্যাপার ঘটতে পারত যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ভূমি পেত এবং সে পুনর্বিবাহ করলে তার নতুন স্বামী তার ভূমির ভাগ পেত। দুটি ধারণাই অন্য ভাইদের কাছে নিশ্চয়ই জুগুলাজনক ছিল। দু-একজন বাদে পরবর্তী বৈদিক স্মৃতিকারেণা নিয়ম করলেন যে, বিধবাকে স্বামীর শবদেহের সঙ্গে দাহ করা হবে। অথবা তাকে যদি আদৌ বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়, তাহলে স্মৃতিকারেণা তার

জীবনকে জীবনমৃত্যুতে পরিণত করেছিলেন—তার যে কোনও অর্থনৈতিক আশ্রয় নেই এ বিষয়ে তার দৈনন্দিন জীবনে সহস্র খোঁচা দিয়ে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'যে নারীর স্বামী নেই তার দেখাশোনা করবে তাঁর পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্বশুর বা শাশুড়ি; না হলে সে নিন্দার ভাজন হবে।' (৫৫) তার অভিভাবকের তালিকায় শেষ দুজন বাদে বাকি সকলে তার নিজের পরিবারেরই সদস্য, যারা তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। আপস্তুশ্ব, মনু এবং নারদ একমত যে অপুত্রক স্বামীর বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না। কিন্তু গৌতম বলেছেন, সে তার সপিণ্ড ও সগোত্রদের সঙ্গে সমান ভাবে উত্তরাধিকারী। (৫৬) অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য নিয়ম করেছেন যে, অপুত্রক ব্যক্তির বিধবা প্রথম উত্তরাধিকারিণী। (৫৭) এ ব্যাপারে বিষ্ণু ও কাত্যায়নও যোগ দিয়েছেন। কোনও নারীর স্বামীর যদি আট থেকে দশ বছর কোনও সংবাদ না পাওয়া যায়। তবে সে পুনর্বিবাহ করতে পারে। (৫৮) স্বামীর যদি পৃথক ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে এবং এক বা একাধিক পুত্র থাকে তাহলে বিধবার শুধু ভরণপোষণের অধিকার আছে। নিয়োগ প্রথায় পরপুরুষের বিধবা নারীতে পুত্রোৎপাদন বিষয়ে মনু খুব স্পষ্ট নন। তিনি এর নিন্দা করেন। (৫৯) বিধবা, এমনকী সাধারণ ভাবে নারী নিজে সন্তান পোষ্য নিতে পারে না, কারণ তারা প্রয়োজনীয় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না। তাই তারা স্বাধীন ভাবে এমন সন্তান পোষ্য নিতে পারত না। যার উপরে তারা অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভর করতে পারত।

নারদ বিধবার যে সাত রকম ব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম বিদেশির দ্বার ক্রীত হওয়া। (৬০) পরাশর নারীর বিষয়ে যে পুনর্বিবাহের বিধান করেছেন তার ফলে সে পুনর্ভূব হয় এবং স্বামীর সম্পত্তির অধিকার হারায়। স্মরণ করা যেতে পারে, দায়ভাগ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিধবা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত, যা মিতাক্ষরা নিয়ন্ত্রিত

অঞ্চলে সম্ভব ছিল না। ফলে দায়ভাগ নিয়ন্ত্রিত বাংলায় ১৮১৫ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে সামগ্রিক ভাবে ২৩৬৬ জন বিধবাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, যার মধ্যে শুধু কলকাতাতেই এ রকম নৃশংসতা ঘটে ১৮৫৮টি। ঋগ্বেদের সময়েও বিধবা করুণার পাত্রীই ছিল, নচেৎ আমরা অবৈধব্যের প্রার্থনা পেতাম না। কিন্তু মহাকাব্যে এবং এমনকী মনুও তাদের মৃত্যুর বিধান দেননি। কুন্তী ও গান্ধারী এবং দশরথের তিন মহিষী এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বিধবারা বেঁচেই ছিল এবং সম্মানের সঙ্গেই বেঁচে ছিল। নিম্নতর শ্রেণির মধ্যে, যতদিন না সংস্কৃতায়নের দুর্ভাগ্যজনক মিশ্রণ ঘটেছিল, ততদিন পর্যন্ত সতীদাহ ছিল না; তা শুরু হয় সংস্কৃতায়নের সঙ্গে সঙ্গেই। তথাকথিত নিম্নতর শ্রেণিতে বিধবাদের উদাহরণ সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বিধবাদের অর্থনৈতিক সমস্যা আরও জটিল হয়েছিল বহু বিবাহ এবং পুত্রের মাতার বিষয়ে সামাজিক গুরুত্বের কারণে। শুধু কন্যা আছে যার এ রকম বা নিঃসন্তান বিধবারা অর্থনৈতিক ভাবে উৎপীড়িত ছিল এবং সাধারণ ভাবে তাদের পিতামাতা বা ভ্রাতার উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বশুরবাড়িতে তাদের আরোপিত দায়িত্ব হিসেবে দেখা হত। তাছাড়া যে পুরুষের বিভিন্ন বর্ণের পত্নী থাকত, সে তার বিষয় সম্পত্তি আরও জটিল পরিস্থিতিতে রেখে যেত, কারণ বিধবাদের ভাগ্য বিষয়ে স্মৃতিকারদের পরস্পর মতভেদ ছিল। কেউ ভরণপোষণে বিধবার দাবি সমর্থন করতেন, কেউ আবার নামমাত্র ভূতির পক্ষপাতী ছিলেন। কখনও কখনও আবার শাস্ত্রের বিধি এবং সমাজব্যবহার, যা সাহিত্যে পাওয়া যায়, এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। গৌতম বলেছেন, 'নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্পত্তি তার স্ত্রীগামী।'(৬১) কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ আমরা শুনি এ রকম একটি বিষয় দুস্যন্তের কাছে বিজ্ঞাপিত হলে তিনি বলেন যে, শাস্ত্রমতে এই সম্পত্তি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হবে।(৬২) সম্ভবত অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ বা আঞ্চলিক ব্যবহার দ্বারা তিনি উপদিষ্ট ছিলেন।

বিবাহ বিচ্ছেদ পাশ্চাত্য অর্থে স্বীকৃত ছিল না। যদিও এমন শাস্ত্রগ্রন্থও আছে, যেখানে নিয়ম আছে যে, প্রতিকূল পত্নীকেও ত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু পারস্পরিক দ্বेष থাকলে দম্পতি বিচ্ছিন্ন হতে পারে। অর্থশাস্ত্র-তে আছে 'স্বামী যদি স্ত্রীর দোষে বিচ্ছেদ চায়, তবে সে স্ত্রীর কাছ থেকে যা পেয়েছে তা ফেরত দেবে। যদি অনুরূপ কারণে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি চায়। তবে স্বামী তার কাছ থেকে যা পেয়েছে তা ফেরত দেবে না। ধর্মবিবাহে বিবাহ বিচ্ছেদ নেই।' (৬৩) এই গ্রন্থে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্বেষের কারণে উভয়পক্ষকে বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে, কিন্তু বিচ্ছেদের বিষয়ে পুরুষের স্বাধীনতা সম্মান পেলেও নারীকে অর্থনৈতিক দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে, কারণ সে তার স্ত্রীধন হারাচ্ছে।

সব সমাজেই সাধারণ ধর্ষণ কতকটা ক্ষমার চোখে দেখা হয়েছে। যাঞ্জবল্ল্য বলেছেন। দাসীকে ধর্ষণ করলে পুরুষের দশ পণ দণ্ড হবে। (৬৪) সে যদি ভিক্ষুণীকে ধর্ষণ করে তবে তার দণ্ড ২৪ পণ। (৬৫) প্রভু দাসীকে ধর্ষণ করার বিষয়ে প্রথমেই যে প্রশ্ন মনে আসে, তা হল, সে কি করে পুরুষকে দণ্ড দিতে বাধ্য করবে? কে তাকে বিশ্বাস করবে, কে তার পক্ষ নেবে? বরং ভিক্ষুণীর কথা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং সে হয়তো জোর করলে অর্থ পাবে, কিন্তু গোটা বাস্তবটাই কতকটা অবাস্তব শোনায়।

সাহিত্যে ধর্ষণকারীর বেকসুর খালাস পাওয়ার অসংখ্য উদাহরণ আছে। তাছাড়া আইন ও সামাজিক প্রথা উচ্চবর্ণের পুরুষের প্রতি এতটাই ক্ষমাশীল ছিল যে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের নারীরা তাদের কাছে বিনা মূল্যেই সহজলভ্য ছিল। সুতরাং শাস্ত্র বাধা দেবে এমন প্রত্যাশা ছিল না। সমাজে নারীর অতি নিম্নস্তরের অবস্থানের কারণে সে পুরুষের লালসার কাছে অত্যন্ত অসহায় ছিল এবং সেই পুরুষেরা ধর্মশাস্ত্রকারদের সাহায্যে সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে বিনা শাস্তিতে এই আচরণ করত।

অসতী স্ত্রীদের ভয়াবহ রকম নির্ধূর ভাবে শাস্তি দেওয়া হত; যে সব ধর্মশাস্ত্রে এই শাস্তির বিধান আছে, সেগুলি ধর্মকাম লেখকদের রচনার মতো লাগে। অন্যান্য শাস্ত্রে বিধান আছে: অসতী স্ত্রীকে তার সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে এবং তাকে কষ্টে থাকতে বাধ্য করতে হবে, এক গ্রাস মাত্র অন্ন দিয়ে। তাকে সব সময়ে তিরস্কার করতে হবে, মাটিতে শুতে হবে, কিন্তু তার স্বামীর বাড়িতেই থাকতে হবে। (যাতে সে তার পপকর্ম থেকে বিরত হয়)।(৬৬)

এখন প্রশ্ন হল, সে যখন তার কার্যকলাপ সংশোধন করবে, তখন কী হবে? তখন কি তাকে ভরপেট খেতে ও স্বামীর শয্যা় শুতে অনুমতি দেওয়া হবে? যদি স্বামী তার আঞ্জোনুবর্তিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করে, যে স্ত্রী কর্মপটু এবং বীর পুত্রের জননী, তাহলে সেই স্ত্রীকে (স্বামীর) সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এবং ভরণপোষণ দিতে হবে।(৬৭) স্ত্রীর জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ঘটায় এই নিয়মে নির্দোষ স্ত্রীকেও শুধুমাত্র স্বামীর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দিয়ে ত্যাগ করা যায়। সমাজে। শুধু পুরুষ ও নারীর জন্য দ্বিমুখী বিচারব্যবস্থা ছিল তাই নয়, যে স্ত্রী তার স্বামীর অপ্রিয়, তার পক্ষে তার আইনত যে অধিকার তা পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। অসতী স্ত্রীকে দৈনন্দিন আহাৰটুকু দিয়ে ঘরে বন্দি করে রাখতে হবে। সতীত্বের কর্তব্য যে লঙ্ঘন করেছে, সেই স্ত্রীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাকে বন্দি করে রাখতে হবে এবং খেতে দিতে হবে।'(৬৮) 'ব্যভিচারিণী নারীকে তার অধিকার (ভূত্যাতির উপরে) থেকে বঞ্চিত করতে হবে, ময়লা কাপড় পরতে দিতে হবে, নামমাত্র খেতে দিতে হবে। যদি সে পরপুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হয়, তবে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।(৬৯) বশিষ্ঠ বলেন, 'উচ্চতর তিন বর্ণের স্ত্রীরা শূদ্রের সঙ্গে ব্যভিচার করলে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। স্ত্রী যদি স্বামী বা গুরুকে হত্যা করতে চেষ্টা করে, তবে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।' গৌতম বলেছেন, 'যদি

উচ্চতর তিন বর্ণের স্ত্রী নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে তবে তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে।'(৭১)

অপর দিকে আপস্তু ও বৌধায়ন দুজনেই বলেন মা যদি গুরুতর অপরাধের জন্য সমাজে একঘরে হয়, তাহলেও পুত্র তার সঙ্গে কথা না বলে তার সেবা করবে।(৭২) একঘরে পিতাকে ত্যাগ করা যায়, সম্ভবত সে নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে পারে এবং সে-ই পরিবারের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে বলে, কিন্তু মায়ের পতন ঘটলেও পুত্র তাকে কখনওই ত্যাগ করতে পারে না। অসতী স্ত্রীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান এবং পুত্রের মাকে ত্যাগ না করার মধ্যে মৌলিক ও নৃত্যনতম মানবিকতার নিষ্কর্য, এই শাস্ত্রবিধানের মধ্যে স্বাভাবিক স্ববিরোধিতা আছে। সাহিত্যে কিন্তু ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়, 'পতিতা' নারীদের অভিশাপ দেওয়া হয়, শাস্তি দেওয়া হয় এমনকী মেরেও ফেলা হয় (যথা, সীতা, অহল্যা ও রেণুকা)।

বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে গণিকাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রতিশব্দ সম্ভবত নন শ্রেণি বা স্তুর বোঝায়, তার মধ্যে সর্বোচ্চ গণিকা, যাকে সরকারি ব্যয়ে নানা কলায় শিক্ষণ দেওয়া হত; তার মূল্যও সর্বাপেক্ষা অধিক। বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে, রাজগৃহে সালাবতী প্রতি রাতে একশত কার্যাপণ দাবি করত, এবং আম্রপালীর দক্ষিণা নিয়ে রাজগৃহ ও বৈশালীর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। মৃচ্ছকটিকনাটকে ঋগ্বেদ-এর গণিকার অনুগ্রহের জন্য সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পাঠানোর বিবরণ পাই; অর্ধকাশীর কাহিনি তো সুপরিচিত। গণিকা থাকত প্রাসাদে প্রাচুর্যের মধ্যে, তার বহু দাসদাসী, কুউনি, বিট, পীঠমর্দ, পুরুষ সেবক ও সঙ্গীতকারী থাকত। কোটিল্য বলেন, গণিকা রাজকোষ থেকে মাসোহরা পেত এবং তার প্রতিনিধি প্রতিগণিকা তার অর্ধেক বেতন পেত। সম্ভবত গণিকার প্রাসাদ, দাসদাসী, সংসার সবই ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি।(৭৩) এর অর্থ হল, গণিকার যে শুধু স্বহ্ম ছিল না। তাই নয়, তা

বেচবার, বাঁধা দেওয়ার বা দান করারও তার অধিকার ছিল না। এই নিয়ম গণিকালয়ে যারা থাকত। তাদের জন্য কার্যকর। কিন্তু অপরূদ্ধা, অর্থাৎ যারা কিছু সময়ের জন্য পুরুষের রক্ষিতা হত, এবং নিজেই গৃহ পরিচালনা করত, আমরা অনুমান করতে পারি— এই নারীরা যা উপার্জন করত, তা রাজকোষে প্রয়োজনীয় করা দেওয়ার পরে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যেত।

রাজকোষ থেকে গণিকাদের ১৫০০ থেকে ২০০০ পণ বার্ষিক বেতন দেওয়া হত। যদি কেউ কোনও গণিকার নিষ্ক্রয় দিয়ে তাকে মুক্ত করতে চাইত বা বিবাহ করতে চাইত, তার রাজকোষে ২৪০০০ পণ নিষ্ক্রয় মূল্য দিতে হত। এ অনেক টাকা, কিন্তু গণিকার বেতনও অনেক টাকা। রাষ্ট্র যে গণিকার শিক্ষার ভার নিত, তার একটা কারণ হল, রাজা এবং তার সভাসদরা অনেক সময়েই বিনোদনের জন্য যুবতী ও সুন্দরী গণিকাদের ডাকতেন। আর একটা কারণ হল, গণিকারা সুকৌশলে তাদের খদ্দেরদের কাছ থেকে নানান রাজনৈতিক ভাবে প্রাসঙ্গিক সংবাদ আদায় করত। সেগুলি সংগ্রহ করার জন্যই অধিকাংশ সময়ে গণিকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হত।

কিন্তু গণিকারা প্রায় স্বাধীন ভাবেই ধনী হত; অধিকাংশ নগরে তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের নগরশোভিনী বলা হত এবং তারা ধনী নাগরদের আকর্ষণ করতে পারত। ধর্মপদের টীকায় সালাবতীর কন্যা সিরিমার প্রতি রাতে ১০০০ পণ উপার্জন করার বিবরণ পাই। গণিকার তুলনায় সামাজিক ও পরিশীলনের দিক থেকে নিকৃষ্ট রূপাজীবী, যে সাধারণত মদ মাংস ব্যবসায়ীর সঙ্গে বাস করত। তার উপার্জন ছিল মাত্র ৪৮ পণ। কোনও পুরুষ গণিকার কন্যার উপরে বলাৎকার করলে তার ৫৪ পণ দণ্ড হত এবং মায়ের প্রাপ্যের ১৬ গুণ দণ্ডও দিতে হত, হয়তো তার বিবাহের সময়ে মুখবন্ধ করার উপায় হিসাবে। পুংশচলী ছিল এই উপজীবিকার শেষ ধাপে, তার কোনও বাঁধা প্রাপ্য ছিল না। কৌটিল্য বলেছেন, বৃদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্তা

বেশ্যাদের রাঁধুনি, ভাণ্ডারী, পশম ও তসর বয়নকারিণীরূপে এবং অন্যান্য কায়িক শ্রমের কাজে নিয়োগ করতে হবে। তাদের ধাত্রী বা মাতৃকারূপে বেশ্যালয়ে অথবা বেশ্যাদের শিক্ষা দেওয়া কাজেও নিযুক্ত করা যেত, যাতে তারা কিছু উপার্জন করতে পারে। কিন্তু কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র-তে তাদের যে অবসর ভাতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অন্য ভাবে অসহায় এই নারীদের খুব অল্পই নিরাপত্তার আশ্বাস দিত। বেশ্যাকে তার আয়-ব্যয় বিষয়ে বেশ্যালয়ের রক্ষককে জানাতে হত। (৭৪)

দেবদাসী বা মন্দিরের গণিকাদের শস্যে বেতন দেওয়া হত—অন্যান্য কিছু রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর মতো। দেবদাসীদের উপার্জন কোথাও স্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি এবং তাদের বিশেষ কর্তব্যও উল্লিখিত হয়নি। যে সব ধনী পৃষ্ঠপোষক পরলোকে পুণ্য অর্জনের জন্য মন্দিরে দাসী কিনতেন, তাঁদের সদিচ্ছাতেই এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ্যালয়েই হোক বা মন্দিরেই হোক, কোনও বারাদ্দনাই নিজস্ব নিরাপত্তা পায়নি; গৌতম ধর্মসূত্র-তে স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'বেশ্যার হত্যা অপরাধ নয়।' (৭৫)

আমরা দেখেছি, সাধারণ ভাবে নারীর উপার্জন বা সম্পত্তির অধিকার ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণ-এ (সম্ভবত অষ্টম-সপ্তম খ্রিস্টপূর্ব শতক) বলা হয়েছে পত্নীর সম্পত্তির উপরে কোনও অধিকার নেই, এমনকী নিজের শরীরের উপরেও নয়। (৪:৪:২:১৩)। শতপথ ব্রাহ্মণ-এ এর আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞে লাঠি দিয়ে হবিকে পেটানো হয় যেমন তেমনি স্বামীও স্ত্রীকে পেটাবে, যাতে তার নিজের শরীর বা সম্পত্তির উপরে কোনও অধিকার না থাকে। (৭৬) কিন্তু সমাজে দানকর্ত্রীর বহু নিদর্শন পাই: শুধু রানিরা নয়, শ্রদ্ধেয় জয়সেনের জৈন শিষ্যা, অথবা সীহমিত্রের জৈনধর্মাবলম্বনকারিণী শিষ্যা, সখিসিহ ও পুষ্যমিত্রের শিষ্যা, ইত্যাদি উদাহরণ আছে। (৭৭) সার্থিবাহপত্নী ধর্মসোমা বা শ্রমণদের গৃহস্থ শিষ্যা কোচ্ছা ধার্মিক

জৈন ব্রাহ্মগণকে নানা উপহার দিয়েছিলেন। বৃহৎকল্পভাষ্যসূত্র-তে গণিকা আম্রপালীর উদ্যান দানের কথা আছে। অনাথাপিণ্ডের কন্যা বুদ্ধ ও তার হাজার শিষ্যকে আহার দিয়েছিলেন। এ ছাড়া গণিকা ও অন্যান্য বৌদ্ধ নারীদের মঠ, চৈত্য, বিহার, উদ্যান, সেতু, কুপ,, জলাধার ও অর্থ দানের কথা শুনি। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা মহিষী প্রভাবতী নানা মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন। ওড়িশার ভীমক রাজবংশে সতেরো জন রাজার মধ্যে ছ' জন মহিষীর বিবরণ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিনীতে দিদা খেমা প্রথমে রাজপ্রতিভু হিসেবে এবং পরে স্বয়ং রানি হিসেবে রাজত্ব করেন। একই গ্রন্থে মহিষী চুদা ও ডামারী যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই মহিষীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু এর অধিকাংশই তন্ত্র পরবর্তী কালের প্রমাণ, যখন ব্যাপক ভাবে নারীকে দেবী ভাবে দেখা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে রানিদের মান্য করা হত, অতিমানবিক শক্তির নিয়ন্ত্রা হিসেবে, যেমন রাজাদেরও মনে করা হত—তারাও ইতিহাসে আগাগোড়াই সম্মানিত হয়েছেন। (৭৮) তেমনি ভাবে যে রানি তাঁর নিজ ক্ষমতায় অর্থের নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনিও সম্মানিত।

প্রথম যে প্রশ্নটা আমাদের মনে জাগে, তা হল: নারীর যদি অর্থ না থাকে, তবে তারা এমন মূল্যবান দান করতে কি করে পারত? একটি উত্তর হল, যে সব ধনী গণিকা নিজেদের গৃহ পরিচালনা করত, তাদের রাজকোষে কর দিয়ে বাকি উপার্জনের অর্থের উপর স্বত্ব ছিল। অনেক সময়েই পাপবোধের কারণে তারা তাদের অর্থের একটা বড় অংশ ধর্মকর্মে ব্যয় করত। দ্বিতীয়ত, সমাজে সবাই শাস্ত্রের অনুশাসন হুবহু পালন করত না, কিছু নারীর স্ত্রীধনের উপর অধিকার ছিলই। বিশেষ করে যদি তারা রাজ পরিবার বা সম্রাট পরিবার বা বণিক পরিবারের নারী হত, তাহলে তা বেশ ভাল পরিমাণ হতে পারত, এবং প্রায়ই তার নিন্দা বা তিরস্কারকে নীরব করিয়ে দেওয়ার অবস্থায় থাকত, কারণ টাকা কথা বলে। তাই তারা দান করতে পারত এবং করতও।

তৃতীয়ত, পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন অনুশাসনের আইন সমান্তরাল ভাবে থাকত, বিশেষ করে মাতৃতান্ত্রিক অঞ্চলগুলিতে। চতুর্থত, নারী, সন্ন্যাসী, পত্নী, বিধবা অথবা গণিকার দান বলে যেগুলি লিপিবদ্ধ আছে, তা সব সময়ে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়, প্রায়ই ভক্ত বা শিষ্যেরা ধার্মিক, ক্ষমতামালিনী বা খ্যাতিনামা নারীর নামে দান করত। তাছাড়া দাতা স্বামীরাও এ রকম দানে উৎসাহ দিত, যদিও আপস্বস্ত্ব বলেছেন, 'স্বামী গৃহে না থাকলে স্ত্রী সাধারণ ব্যয়াদি করবে; তা চৌর্য বলে গণ্য হবে না।' (৭৯) এর থেকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, সে যদি অসাধারণ ব্যয় করে তবে সে স্বামীর অর্থ চুরি করেছে বলে মনে করতে হবে! কিন্তু সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে ফাঁক রেখেছিল যার সাহায্যে অসাধারণ পরিস্থিতিতে নারীরা তাদের নিজের ধন দান করতে বা ব্যয় করতে পারত।

তৃতীয়-চতুর্থ খ্রিস্টপূর্ব শতকে স্পার্টার সম্বন্ধে শুনতে পাই যে, 'সমগ্র দেশের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ নারীদের অধীন; এটা এই জন্য যে অনেক ধনী উত্তরাধিকারিণী আছেন, এবং প্রচুর যৌতুক দেওয়া হয়।' (৮০) এখানে যৌতুক দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনে বলত যে, বিবাহ শেষ হয়ে গেলে সেটা ফেরত দিতে হবে। (৮১) রোমান আইনে বধু কেনা যেত। (৮২) স্বামী যদি (ব্যভিচার ছাড়া) অন্য কোনও কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করত, তাহলে তাকে তার সম্পত্তির অর্ধাংশ দিতে হত, বাকিটা দেবী সেরেস-এর কাছে বাজেয়াপ্ত হত। এই পিকিউলিয়াম' তারা নিজেদের মতো ব্যবহার করতে পারত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা পিতার সম্পত্তি (৮৩) ভোকেনিয়ান আইন অনুসারে আদমসুমারির প্রথম শ্রেণিতে যে ব্যক্তি আসে, অর্থাৎ যে সম্পন্নতম, সে নারী উত্তরাধিকারিণী নিয়োগ করতে পারে না। (৮৪) ক্রীট-এ 'পিতার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করেই কন্যাকে তার ভাগ দেওয়া যাবে। (৮৫) পুত্রহীন পিতার সম্পত্তি কন্যাগামী হত, তার নাম প্যাট্রিওথস (অথবা এপিক্লোরস)। (৮৬) তাই

দেখা যায়, ভোকেনিয়ান আইন, যা সমাজের সর্বাঙ্গীণ ধনী অংশের জন্য নিয়ম করেছে, তা বাদে গ্রিস ও রোমে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আইন অনুসারে নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে পারত এবং পেতও।

গর্তিন আইন অনুযায়ী 'বিবাহিত ক্রীতদাসীর নিজস্ব সম্পত্তি থাকতে পারে, কারণ বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়মে বলা হয়, সে তার অস্থাবর সম্পত্তি (সম্ভবত নিজের জিনিসপত্র) এবং ছোটখাটো প্রাণী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।' (৮৭) ফলে উদার গর্তিন আইন অনুসারে দাসেরও সম্পত্তির অধিকার ছিল। কিন্তু গ্রিস ও রোমেও সাধারণ চিত্রটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক-পুরুষের সম্পত্তির স্বত্ব ও ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে, যদিও ভারতবর্ষের তুলনায় আইন অনেক বেশি উদার। নারীর সম্পত্তির উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ তার উপরে সার্বিক নিয়ন্ত্রণের একটা অঙ্গ। 'মানুষের প্রজননের উপায় নিয়ন্ত্রণ করতে এবং এই উপায়গুলি তৎকালে কার্যকরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থে প্রয়োগ করতে রাষ্ট্র বাধ্য হয় তার নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার নারীর নিজের দেহের উপরে বিস্তৃত করতে। সুতরাং, সে তার দেহের উপর সত্যিকার স্বত্ব হারায়।' (৮৮) মনে পড়ে যজ্ঞের ঘি-কে লাঠি দিয়ে মারার যে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা ব্রাহ্মাণ্ডে দেওয়া হয়েছে, তা হল 'এই ভাবে মারলে স্ত্রী তার নিজের দেহ ও সম্পত্তির উপর অধিকার হারায়।' দেহ ও সম্পত্তির পারস্পরিক স্থানপরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ দেহও সম্পত্তির অংশ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে অপমান করতে সভায় টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে দুঃশাসনের প্রতি তাঁর প্রশ্ন: 'রাজা যুধিষ্ঠির কি আমাকে জুয়ায় বাজি রেখে হেরে যাওয়ার আগে নিজেকে বাজি রেখেছিলেন?' প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি ইঙ্গিত করছেন যে, যুধিষ্ঠির যদি আগে নিজেকে হারিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর দ্রৌপদীকে বাজি রাখার কোনও অধিকার নেই।

অর্থাৎ তিনি মুখে না বলেও স্বীকার করছেন, তিনি কৌরবদের অধিকারভুক্ত, তার মানে, তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বামীর সম্পত্তি, এবং স্বামী তাঁকে বাজি রাখতে পারেন। এর বছ পূর্বে ঋগ্বেদের জুয়াড়ি আক্ষেপ করে যে, সে তার স্ত্রীকে বাজিতে হেরেছে। সুতরাং স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হিসেবেই ব্যবহৃত হত। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর যৌতুকের অংশবিশেষ ছিলেন; কিন্তু যযাতি দেবযানীকে বিবাহ করে গোপনে শর্মিষ্ঠাকে উপভোগ করেন এবং তাঁর গর্ভে অনু, পুরু ও দ্রুতুর জন্ম দেন। সুতরাং যৌতুকের অচেতন অংশ যেমন স্বামী দখল করতে পারত। তেমনই বধুর মানুষ সহচরদেরও সে তা করতে পারত। নারী যে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত, মাধবীর কাহিনি তার প্রমাণ:

‘গালিব যখন গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করতে না পেরে রাজা যযাতির কাছে যাত্রা করলেন, তখন যযাতি শূন্য রাজকোষের অজুহাত দিলেন। কিন্তু তিনি গালিবকে একটি অন্য সুযোগ দিলেন, রাজার সুন্দরী তরুণী কুমারী কন্যাকে ধার নিয়ে এক বছর রাজাদের কাছে ভাড়া দেওয়া যাবে, যতদিন না সেই রাজাদের একটি করে পুত্র হয় এবং তাঁরা কৃতজ্ঞতাবশত গালিবকে কিছু অর্থ দেন। গালিব মাধবীকে পরপর তিনজন রাজার কাছে ভাড়া দিলেন এক এক বছর করে, যতদিন না তার গুরুদক্ষিণার খরচ উঠল। যযাতি, গালিব বা এই রাজারা, কেউই এই ব্যবস্থাকে নোংরা বা ঘৃণ্য মনে করলেন না এবং শুরুও দক্ষিণা গ্রহণ করলেন—মনে হয় সানন্দেই। একমাত্র মাধবীই এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতি গভীর জুগুপ্সা প্রকাশ করলেন এবং পরে দৃঢ় ভাবে বিবাহ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁকে একটি অর্থকরী পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তার অন্তরাত্মা এতে ঘৃণা বোধ করেছিল। তিনি তপস্যা করতে গেলেন।’

প্রাচীন ভারতের নারীদের অর্থ উপার্জন, অধিকার বা ব্যয় করার থেকে এবং অর্থ বা অন্য সম্পত্তি বিক্রি, বাধা দেওয়া, গচ্ছিত রাখা বা দান করা থেকে

বঞ্চিত করার ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি কারণ দেখতে পাই। আর্যরা উত্তর ভারতীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ দখল করে নেওয়ার পর তাদের অল্প মূল্যের দাসের এক সরবরাহ ছিল। পূর্বে পরিবারের মেয়েরা বাইরের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে পুরুষের সহায়তা করত এবং তাই তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃত হত। তারা উপার্জনকারী বা উপার্জনকারীর সহায়ক হিসেবে কিছুটা মানবিক সম্মান পেত। কিন্তু যখন বিশাল এক দাস শ্রেণি আর্যদের ব্যবহারে লাগল তখন নারীদের আর বাইরের শ্রমসাধ্য কাজে যোগ দিতে হত না। ততদিনে দেশের ভিতরে এবং সাগরপারে উৎপাদন ও বাণিজ্যের উদ্ধৃতি সঞ্চিত হয়েছে শ্রেণিবিভক্ত এক সমাজে অল্পসংখ্যক সুবিধাভোগীর হাতে। ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে শুরু করে আমরা সমাজের উপরের স্তরে মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের পরিস্ফুট ভোগের উল্লেখ পাই। সেই সময়ে আইনসম্মত উত্তরাধিকারীর হাতে সম্পত্তি রেখে যাওয়ার উৎকণ্ঠায় অন্তঃপুরেও পুরুষের আরও সজাগ পাহারায় নারীর আরও কঠিন বন্দিত্ব উপস্থিত হল। তাছাড়া এই ভাবে ঘরে থাকায় নারীর রূপের সৌকুমার্য বজায় রইল, যা সম্পত্তির পুরুষ অধিকারীদের কাছে প্রিয়। তখন এ কথা স্পষ্ট হল যে নারীরা, যাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষর এবং কেবলমাত্র গৃহকর্মে নিপুণা, তারা অর্থনৈতিক ভাবে তাদের স্বামীদের উপর বোঝা এবং এই থেকেই তাদের ভোগ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করার পদ্ধতি সহজ হল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বাৎস্যায়ন নারীর সম্বন্ধে দুই পরিপ্রেক্ষিতে— কুমারী হিসেবে ও গণিকা হিসেবে—পরিষ্কার বলেছেন, 'তাদের সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় ভাবে সাজগোজ করতে হবে, কারণ নারী পণ্য।'(৮৯)

এখন নারীদেরই যদি পণ্য বলে মনে করা হয়, সম্পত্তি বা পদার্থ হিসেবে, তাহলে তাদের সম্পত্তি বা ঐশ্বর্য ব্যবহার করার স্বাধীনতা কেউ আশা করে না। সমাজ তাদের ব্যক্তি মানব হিসেবে স্বীকার করতে ভয় পেত।

গৃহকর্মে নারীর অবদান কখনও অর্থের নিরিখে পরিমাপ করা হয়নি, তাই যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই অনেক গৃহকর্ম করত, তাদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য পুরুষের উপরে অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল বলেই মনে করা হত। উৎপাদনের কাজে যুক্ত থাকলেও তা যথেষ্ট নয়, তাকে তবুও বোঝা বলেই গণ্য করা হয় এবং প্রত্যাশা করা হয়। সে তার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনে থাকবে। যখন তার হাতে টাকা এবং সঞ্চয়কারের সম্পত্তি আছে, যা সে নিজের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারবে, তখনই তার অর্থনৈতিক সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। আইনেই স্বীকৃতি এবং ব্যয়, সঞ্চয় বা যথেষ্ট ভাবে নিজের অর্থ ব্যবহার করার সচেতন স্বাধীনতাই তাকে সম্পন্ন নারীর স্থান দিয়েছে। স্ত্রীধন বা সৌদায়িক বা যৌতুক পুথিগত ভাবে একান্তই তার নিজস্ব; কিন্তু সমাজের অনুভূতি ও তার নিজের অনুভূতি হল যে, সে 'ভার্যা' বা 'ভরণীয়া', অর্থাৎ যাকে ভরণ করতে হয় এবং সেই কারণেই ভরণপোষণের জন্য স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অধীন, যেমন ভৃত্য, দাস, তেমনই এবং এতে স্ত্রীধন লুণ্ঠ করায় শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সুবিধা হয়। কেবলমাত্র খুব ধনী নারীরা, যেমন রানি, যাদের ঐশ্বর্য রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত, তারাই সত্যি করে নিজেদের অর্থের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখত। অথবা যে গণিকা তার নিজের অর্থ 'উপার্জন' করে করা দেয় এবং কখনও এতই সম্পন্ন হয় যে রাজা এবং বণিকরাও তার ক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সে-ই সময়বিশেষে সমাজে অর্থবল প্রয়োগ করার স্বাধীনতা পায়। তাছাড়া সর্বত্রই ধনী দাতারা সম্মানিত হয় এবং লোভী প্রার্থীদের কাছে অর্থে কোনও কলঙ্ক নেই। ধর্মকর্ম সর্বত্র এবং সর্বকালে অর্থের পাপ স্বলন করে।

কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলি বাদ দিলে সাধারণ ভাবে দাসী, গৃহবধু বা বিধবারা পুরুষ ও তার পরিবারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকত, কারণ গৃহে তাদের শ্রম

যতই গুরুতর হোক না কেন, উৎপাদনমূলক বলে গণ্য হত না। তেদের একমাত্র মূল্য তাদের প্রজননের ভূমিকায়। কিন্তু সেখানেও তাদের ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হত, ফসল হল বপনকারীর নিজের। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে সমাজ ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে নারীর পায়ের তলা থেকে তার আত্মসম্মানের শেষ অবলম্বনটুকু সরিয়ে নিয়েছে, তাকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে এবং গৃহে তাকে এমন এক নিশ্চতন ভূমিকা দিয়ে যাতে তার সাধারণ বুদ্ধি সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং পুরুষ ঘোষণা করতে পারে যে, নারীর অর্থের প্রয়োজন নেই এবং অর্থ পেলেও তার উপরে নির্ভর করা যায় না।

শান্ত্রে পণপ্রথা ও স্ত্রীধন

বধূদাহন ও অন্যান্য নানা প্রকার পণপ্রথার কারণে হত্যা আজকাল সংবাদপত্রে এতই দৈনন্দিন ব্যাপার যে শান্ত্রে তার মূল খোঁজার এবং এই সব দুষ্ট ধারণা ও কার্যকলাপের অবসান ঘটানোর তাগিদ বাড়ে। এই সব হত্যার প্রধান কারণ অসন্তুষ্ট শ্বশুর-শাশুড়ি, তাদের অপূরণীয় অর্থলগসা, যা প্রাথমিক ভাবে বর ও তার পরিবারকে বিবাহের সময়ে দেওয়া পণের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। কিন্তু পরিতুষ্ট হয় না। এর বৃদ্ধি ঘটে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও লোভকে কেন্দ্র করে এবং এর অবসান নির্ভর করে পুরুষের আত্মমর্যাদার উপরে, যা অনুপার্জিত যে কোনও রকম অর্থ গ্রহণ করে নিজেকে বিক্রিয়ে দিতে অস্বীকার করে।

সর্বপ্রাচীন ঋগ্বেদ-এর সংহিতায় বধু বা বরের কারও পক্ষ থেকেই অর্থ বা অন্য কোনও রকম ধনের আদান-প্রদানের উল্লেখ নেই। বিবাহের সর্বপ্রথম উল্লেখ হচ্ছে 'কুমারী নিজের সঙ্গী বেছে নেয়।' (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০:২৭:১২)

বোঝাই যায়, পুরুষ ও তার সঙ্গী বেছে নিত; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এটা স্বাধীন নির্বাচন, কোনও পক্ষের কোনও অর্থদানের উপর নির্ভর করে না। এক জায়গায় ঋগ্বেদ-এ অবশ্য দোষযুক্ত বরের বধুর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আছে। (১:১০৯:২) ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডল থেকে শুরু করে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বিবাহের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, যেমন সূর্যকে বলদের গাড়িতে করে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া। এই সূক্তে বলা হয়েছে, বধুর পিতা বরের গৃহে উপহার পাঠিয়েছিলেন (প্রাগুক্ত ১:৮৫:১৩)। এই উপহার স্পষ্টতই কন্যার উদ্দেশ্যে পিতামাতার স্নেহোপহার। এটা প্রকৃতপক্ষে পণ নয়। '

পরবর্তীকালের একটি বৈদিক গ্রন্থ, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর আশপাশে সংকলিত তৈত্তিরীয় সংহিতা-য় বলা হয়েছে, নবদম্পতি যখন বরের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তখন বন্ধু'ধরে থাকে' (শকিটাট), কারণ বধু সব 'গৃহ সম্পত্তির কর্তা'। (৬:২:১:১)। মনু গৃহসম্পত্তির অর্থে 'পরিবাহ্য' শব্দটি ব্যবহার করছেন এবং এই মন্ত্রটি ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বলেছেন, 'বধু সম্পত্তির তদারকের দায়িত্ব পেয়েছে।' (মনু সংহিতা৯:১)। এই ভাবে সাংসারিক সম্পত্তির উপর স্ত্রীর স্বত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। যদিও জৈমিনি বলেছেন নারীদের কোনও কোনও বিশেষ সম্পত্তির অধিকার থাকতে পারে ও থাকে। মনু সংহিতা (৮:৪:১৬)-র উপরে টীকা করতে গিয়ে মেধাতিথি বলেছেন, নারী যা উপার্জন করে তা সবই তার স্বামীর। স্পষ্টতই সামাজিক মনোভাব হল নারীর নিজস্ব ধন-সম্পত্তিতে অধিকার নেই। দুঃখের বিষয়, আধুনিক ভারতবর্ষেও বহু পরিবারে এমন মনোভাব এখনও দেখা যায়। পুরুষের যেমন সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ অধিকার, নারীর তা নয়।

তা সত্বেও বিবাহের সময়ে নারীকে তার পরিবার ও বন্ধুবর্গ উপহার দিত এবং পরে তার স্বামীর পরিবারও দিত। পারিভাষিক ভাবে বিবাহের সময়ে অগ্নির সামনে তাকে যা দেওয়া হত (অধ্যাগ্নি) এবং স্বামীগৃহে যাওয়ার সময়ে পথে তাকে যা দেওয়া হত (অধ্যাহবনিক)— যা স্নেহবশত (অপারে) তাকে দিত বা তার ভাই বা মাতা পিতা তাকে যা দিত— এই দুটি হল স্ত্রীধান, নারীর ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি। (মনু, সংহিতা ৯:১৯৫) মনু যে কেবল বধুর নিজস্ব সম্পত্তি স্বীকার করেন তা নয়, তিনি বলেছেন, কন্যাপণ শুধুমাত্র সর্বনিকৃষ্ট আসুর বিবাহেই গ্রহণযোগ্য (প্রাগুক্ত ৩:৩৯)। অন্যান্য আচার্যদের মতো উদ্ধৃত করে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে আর্য বিবাহে কন্যার পিতা বাধ্য হয় বরকে একটি গরু এবং ষাঁড় দিতে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নিন্দ করে তিনি বলেছেন, এটি মিথ্যা, কারণ ছোট হোক বা বিশাল হোক, পণ হল আনুষ্ঠানিক ভাবে বরের বিক্রয়।’ (প্রাগুক্ত ৩:৫৩) এর উপর জোর দিতে মনু আরও বলেছেন ‘যে সব বিবাহে কন্যার ক্ষতিপূরণ মূল্য গ্রহণ করা হয়, সেখানে (বরের) বিক্রয় হয় না, সেখানে কন্যা সম্মানিত হয় এবং তার প্রতি সদয় আচরণ করা হয়।’ (প্রাগুক্ত ৩:৫৪)

যদি কোনও কারণে স্বামী বধূকে কোনও স্রন্ধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার জীবদ্দশায় তা পূরণ করতে না পারে, তার পুত্রদের তখন তা তাদের মাকে দিতে হয়। অপরার্ক নামে এক টীকাকার বলেছেন, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, এমনকী পিতারও স্ত্রীধান কেড়ে নেওয়ার বা দান করার অধিকার নেই। কেবলমাত্র দুষ্ট ও অপব্যয়ী পত্নী স্ত্রীধানের উপর অধিকার হারাতে পারে। তবে এখানে একটা ফাকি থেকে যাচ্ছে, কারণ স্বামী এবং/অথবা তার পরিবার স্ত্রীকে অপব্যয়ের অপবাদ দিলেই স্ত্রীধান থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে। এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা মনে করি যে জুয়া খেলে, সুরা ও নারীতে, এমনকী কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপে সম্পত্তি উড়িয়ে দিলে স্বামীকে নিয়ন্ত্রিত করার স্ত্রীর কোনও আইনগত অধিকার নেই। পরাশর তাঁর

গৃহ্যসূত্র-এ পরিষ্কার বলেছেন, মাতার মৃত্যুর পর স্ত্রীধন কন্যাদের কাছে যায়। কেবলমাত্র কন্যা না থাকলেই পুত্র তা পেতে পারে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এখানে উদ্দেশ্য হল স্ত্রীধনের সঙ্গে একক ভাবে বধূকে এবং সাধারণ ভাবে তাঁর আত্মীয়দের যুক্ত করা, বোধহয় এই কারণে যে স্ত্রীধনই নারীর একমাত্র সম্পত্তি। কাত্যায়ন স্ত্রীধনের উপরে আরও পরিস্ফুট: সাতাশটি কারিকায় তিনি বধুর এই একমাত্র সম্পত্তির লক্ষণ করেছেন। বিবাহে যা সে তার পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নি, অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে পায়, যা সে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের কাছ থেকে লাভ করে, প্রথমবার পিত্রালয়ে ফেরার সময়ে তাকে তার পরিবার থেকে যা দেওয়া হয়, তা সবই তার নিজস্ব। কাত্যায়ন বলেন, শুষ্ক হল মূল্য, যা বর বধূকে দেয়, বিবাহের সময়ে বা তার গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময়ে। স্মৃতিচন্দ্রিক বা ব্যবহার ময়ূখ-এর মতো পরবর্তী গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করা হয়েছে। বরদরাজ কিন্তু তার ব্যবহার নির্ণয়ে বলেছেন, শুষ্ক দুই প্রকার হতে পারে: (১) বধুর শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁর পিতামাতাকে যা দেন, যা তার মৃত্যুর পরে তার মা এবং/অথবা ভাইয়েরা পায়; এবং (২) তাকে অলংকার বা গৃহস্থলীর সামগ্রীর মূল্য বাবদে বর যা দেয়। কাত্যায়ন যোগ করেছেন যে, তার শিল্প' দিয়ে সে যা উপার্জন করে এবং অপরের কাছ থেকে যা পায় তা তার স্বামীর প্রাপ্য, কিন্তু অবশিষ্ট সবই স্ত্রীধন। এতে করে বধূকে প্রায় সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু আর এক স্মৃতিকার দেবল বলেন, ভরণপোষণ, শুষ্ক এবং সুদ থেকে যে লাভ হয় তা পুরোপুরি স্ত্রীধান, যার উপরে বধুর সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। মনুর প্রখ্যাত টীকাকার মেধাতিথি বলেছেন অলংকার যদিও সাফাং ভাবে বধূকে দেওয়া হয়নি, কিন্তু সে স্বামীর অনুমতি নিয়ে তা পরে, তাই তাও স্ত্রীধনেরই অন্তর্ভুক্ত।

আর এক ধরনের স্ত্রীধনকে বলা হয় সৌদায়িক। যা কিছু যে কেউ দেয়, তা সে তার নিজের পরিবারের হোক, বন্ধু লোক, স্বামীও তার পরিবার বা তাদের বন্ধু হোক—তা সৌদায়িক। (দায়ভাগ ৪:১:২১) অপরার্ক বলেছেন, এই সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বধুর; সে তা দান করতে পারে, বন্ধক রাখতে পারে, যদি তা ভূসম্পত্তি হয়, তাহলেও।

পরবর্তী গ্রন্থ স্মৃতিচন্দ্রিকা স্ত্রীধন হিসেবে বধু কত দূর পেতে পারে তার সীমা নির্দেশ করে। সব রকম উৎস এক করলে সে দু'হাজার পণ পর্যন্ত পেতে পারে, কিন্তু সে ভূমির অনুদানও পৃথক ভাবে পেতে পারে। (২:২৮১) ব্যবহারমন্ত্র-এ। কিন্তু বলা হয়েছে, সে বাৎসরিক দু'হাজার পণ উপার্জন হয় এ রকম সম্পত্তির অধিকার পেতে পারে। কিন্তু এককালীন উপহার হিসেবে তার আরও বেশি অধিকার ছিল। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, পূর্বাচার্যগণ বলেছেন অলংকার এবং অন্যান্য যা ধন তার আত্মীয়রা উপহার হিসেবে দেয় তা পত্নীর নিজস্ব। (২:৬১৪:৯) বৌধায়নের মতো কন্যা মায়ের অলংকার এবং অন্যান্য প্রথাগত উত্তরাধিকার পায়। (ধর্মসূত্র ২:২:৪৯) বশিষ্ঠও বলেছেন, যা মায়ের স্ত্রীধন ছিল, তা তার কন্যাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, তা তখন তাদের নিজস্ব স্বাধীন সম্পত্তি (১৭:৪৬)। ভিন্ন ধরনের বিবাহের উপহার হল যৌতুক। বৃৎপত্তিগত ভাবে তার অর্থ বিবাহের সময় দম্পতি (যুতিক)কে যা দেওয়া হয়। (কাতায়ন ধর্মসূত্র: ১৯০৫, ৯০৭, ৯১১) এই বিশেষ উপহারটিতে সম্ভবত দম্পতির যৌথ অধিকার ছিল। পুথিগত ভাবে অন্তত এই সম্পত্তির উপর পুরুষের নারীর মতোই অধিকার ছিল।

মনু স্ত্রীধনের একটি রক্ষাকবচের কথা উল্লেখ করেছেন: যে আত্মীয়েরা মুখতাবশত (বধুর) দাসী, রথ বা বস্ত্র ব্যবহার করে, তাদের সর্বনাশ হয়। (৩:৫২) তাই বোঝা যায়, নারীর স্ত্রীধনকে বেআইনি ভাবে তার স্বশুরবাড়ির

লোকেদের ব্যবহার করার ঘটনা ঘটত, এবং তাকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। বধু মনে হয় সম্পূর্ণ ভাবে অসহায় এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারত না। এ নিয়ম কিন্তু শুধু ধনী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (দাসী ও রথের উল্লেখ দ্রষ্টব্য); অপেক্ষাকৃত দরিদ্র যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যাদের অনেক কম সম্পত্তি ছিল, তারা তাদের যৎসামান্য সম্পত্তির উপরে স্বশুরবাড়ির লোভী হস্তক্ষেপে নিঃস্ব হয়ে পড়ত।

প্রাচীন ও পূর্ব মধ্যযুগীয় সমাজের দুটি গুরুতর বৈশিষ্ট্য উপরের এই বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমত, পুথিগত ভাবে নারীর সম্পত্তির, এমনকী ভূমির, উপরেও অধিকারের ধারণা ছিল। যেহেতু তাকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হত না এবং তথাকথিত নিম্ন অর্থাৎ শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী শ্রেণি ছাড়া তার অর্থকরী জীবিকাও ছিল না, সে অল্প বস্তু আশ্রয় ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য তার স্বামী ও তার পরিবারের পোষ্যই ছিল। তাই তারা তার ধন খুশি মতো খরচ করে দাবি করতে পারত, তার ভরণপোষণের জন্য তা ব্যবহার হয়েছে। সেও তাদের যুক্তি খণ্ডন করতে সফল হত না। রানি বা ধনী নারী, যাদের পিতা বা ভ্রাতা সামাজিক ভাবে তার স্বশুরবাড়ির চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তারা ছাড়া আর সকলের সৌদায়িক স্ত্রীধন বা যৌতুক, সবই স্বামী এবং তার পরিবারের হাতে যেত। যেমন এখনও যায়।

দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রবল ভাবে নাড়া দেয় তা হল, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলির কালেও, এমনকী মনুর সময় পর্যন্ত, বধুর পরিবারের পক্ষ থেকে বরের পরিবারকে পণ দেওয়ার ধারণা স্বীকৃত ছিল না, অনুমোদিতও নয়। রামায়ণ-মহাভারত-এ সমাজের যে প্রতিফলন ঘটেছে, সেখানে বধু ও বরের পরিবারের মধ্যে উপহার বিনিময়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। মনু খুব পরিস্ফুট ভাবেই বলেছেন যে, বধুর পরিবার যদি পণ দেয়। তবে বিক্রয়ের প্রসঙ্গ

আসে। 'পণ' শব্দটির অর্থ মূল্য', এবং বধুর পরিবার যদি মূল্য দেয়। তবে তারা কী কিনছে? অবশ্যই বরকে, যে তখন 'পণ' হয়ে দাঁড়ায়। স্পষ্টতই এ ধারণা সমাজে জুগুপ্তসাজনক। এতে বরের সামাজিক সম্মান ও আত্মমর্যাদাও হ্রাস করে, কেননা এতে সে তার শ্বশুরকুলের কাছ থেকে পণ মূল্য গ্রহণ করার লজ্জা অনুভব করে না, ফলে তার দাম্পত্যজীবন ব্যবসায়িক বেচাকেনার উপরে নির্ভর করছে। তার সম্মানবোধের সম্পূর্ণ নিঃস্বতাই প্রমাণ করে। মনুর যুগেও সে সাধারণ ভাবে সমাজ এবং বিশেষ ভাবে তার শ্বশুরবাড়ির দ্বারা স্বীকৃত, তা সে মনে করত না। আবার এই স্বীকৃতি যে শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে সে যে পরিমাণ পণ আদায় করতে পারে তার দ্বারা নির্ধারিত, এমনও সে মনে করত না। পরে পণ দেওয়া নেওয়ার এই ঘৃণ্য প্রথায় লজ্জার লেশমাত্র রইল না। কন্যার পিতামাতা যে মুহুর্তে বর কেনার জন্য মূল্য দিতে সম্মত হল, তখনই তারা বধুর পরিবারকে চাপ দিয়ে আরও বেশি আদায় করার জন্য শ্বশুরকুলের লোভকে আরও শান দিল। এই লোভের যথার্থ খাদ্য যোগাতে না পারার ফল হত—এখনও হয়—বধুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার। সে যদি এই যন্ত্রণার জীবন মেনে নিত তাহলে তাকে জীবস্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকতে হত। যদি সে তা না পারত—বা এখনও যদি না পারে—সে আত্মহত্যা করে তার অবসান ঘটায়। যদি তার মধ্যে সেই মরিয়া 'সাহসী' না আসে, তাহলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তা নিজেদের হাতে তুলে নেয়; বিষ, আগুন, অথবা উঁচু জায়গা থেকে সফল একটি ঠেলা দেওয়া। যে অবাঞ্ছিত বধুর পিতামাতা প্রত্যাশিত কামধেনুর ভূমিকা পালন করতে চায় না বা আর পারে না, তাকে সরিয়ে দেওয়ার কত রাস্তাই না আছে। তা ছাড়া, প্রবাদে বলে, 'ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গরু মরে।' শাস্ত্র বিপল্লীককে খোঁচায়—আবার এবং যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ করতে। তারপরে, যদি ভাগ্য ভাল হয় তবে তৃতীয়বার, চতুর্থবার যতবার হয়—নির্লজ্জ ভাবে, বারে বারে। তার বয়স কোনও বাধা নয়, কারণ নারী তো সস্তা পণ্যদ্রব্য, আর কুমারী মেয়ে

মা-বাবার লজ্জা। তাই পুনঃ পুনঃ বিবাহ অর্থে পার্জনের একটি বর্ধমান উপায় হয়ে দাঁড়াল এবং এই প্রথা এখন চেতনাকে এত লজ্জাহীন ও অনুভূতিহীন করে তুলেছে যে কোনও পক্ষই আর কোনও লজ্জা অনুভব করে না।

কিন্তু তবু এটি একটি সম্পূর্ণরূপে দুষ্ট ও লজ্জাকর নিয়ম। দরিদ্র পরিবারের বধু সংসারে কার্যিক শ্রম দেয় এবং ধনী ঘরের বধু ভাল পণ নিয়ে আসে। সুতরাং দ্বিতীয়টি বরকে কিনে নেয়, কিন্তু সে এই প্রথায় লজ্জাবোধ করার পরিবর্তে নিজের বাজার দর নিয়ে বড়াই করে, তাই সহজেই মেনে নেয় সে পণ্যদ্রব্য ছাড়া আর কিছু নয়। এই কুপ্রথা আমাদের সমাজজীবনে এতটাই ওতপ্রোত এবং ব্যাপক যে শিক্ষিত ছেলেরাও কোনও রকম বিবেকের দংশন ছাড়াই এই জঘন্য প্রথাকে মেনে নেয়। প্রায়ই তারা সুবোধ সন্তান হওয়ার ভান করে, নোংরা কাজটা পিতামাতার হাতে ছেড়ে দেয়। শাস্ত্রে বলে, 'কন্যা একটি পরিবারকে দান করা হয়, অতএব সমগ্র পরিবার তার কাছ থেকে সেবা আদায় করতে পারে, ইচ্ছামতো তার উপরে অত্যাচার করতে পারে, আরও বেশি টাকা আদায়ের জন্য তার বাবা-মাকে চাপ দিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আর পণ না দিলে তাকে মেরে ফেলতেও পারে। তারপরে সে আবার স্ত্রী ঘরে আনেসমস্ত পদ্ধতিটার পুনরাবৃত্তি করে।

এ কথা সত্য যে পাশ্চাত্য দেশেও পণপ্রথা ছিল— অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত নারীকে নিকৃষ্ট জীব ও দাসী হিসেবে দেখা হত। কিন্তু গত দুই শতাব্দীতে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, পশ্চিমে পণের নির্লজ্জ আদানপ্রদান পশ্চিমে লোপ পেয়েছে। শিক্ষা এবং স্ত্রী পুরুষের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থানের ফলে উন্নততর আলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে যা এই প্রথার অবসান এনেছে। কিন্তু শিক্ষা সত্ত্বেও, এমনকী নারীশিক্ষা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে বরের পরিবারের এই লোভ কমেনি, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে ছাড়া। বরং নানাপথে কলো টাকা ও সহজলভ্য টাকার আবির্ভাবের ফলে এই পণের

লোভটা আরও বেড়ে উঠেছে। গোপন পণ, অর্থাৎ মনস্তৃষ্টি ঘটানোর উপহার অনুপার্জিত ধনের জন্য লিঙ্গা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং সেই ভাবে এই নির্লজ্জ প্রথা চলতেই থাকে। এখন বন্ধুর পরিবার কখনও কখনও হঠাৎ বড়লোক, উপযুক্ত বরের জন্য অর্থ ও অন্যান্য বস্তুতে যে অসীম পরিমাণ খরচ করেছে সে বিষয়ে বড়াই করে বেড়ায়, ভুলে যায় যে এই ভাবে তারা বরের পরিবারকে এই ধারণা দেয় যে এখানে সোনার খনি আছে, অনির্দিষ্টকাল ধরে যা থেকে লাভ করা যায়।

পণ, স্ত্রীধন এবং সৌদায়িক—এই সব উপহারের প্রধান প্রাপক বধু। শুধু যৌতুকের ক্ষেত্রে দম্পতি তার যৌথ প্রাপক। কিন্তু বেশির ভাগ পরিবারেই স্বশুর-শাশুড়ি নিজেদের মেয়ের বিয়ে দেয় অথবা বরকে বিদেশ পাঠায় বধুর বাড়ি থেকে পাওয়া অর্থে। তারা সহজে এবং বিনা লজ্জায় বধুর পরিবারের কাছ থেকে আদায় করা ধন ভোগ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের আরও বেশি অর্থলিঙ্গা বধুর পিতামাতাকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। সত্য কথা, পরবর্তী শাস্ত্রে অনুষ্ঠারিত ভাবে, কখনও স্পষ্ট ভাবে এই প্রথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কি ভুলে যাওয়া উচিত, এমন কি মনু যিনি এমনিতেই প্রাচীন পন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল, তিনিও এমন পরিস্ফুট ভাবে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে কেবলমাত্র আসুর বিবাহেই পণ স্বীকৃত? তিনি এবং আরও কয়েকজন ধর্মশাস্ত্রকার বলেছেন যে এই প্রথার অর্থ হল পণের টাকা নিয়ে নিজের পুত্রকে বিক্রি করা এবং এমন ইঙ্গিত দেন যে, কোনও আত্মসম্মান বিশিষ্ট পুরুষের এই বিক্রয়ে সায় দেওয়া উচিত নয়। পণ দেয় বা নেয় যারা, তাদের সামাজিক ভাবে একঘরে করে রাখা অথবা মাইক্রোফোনে বা পোস্টারে এই ঘৃণ্য কাজ ঘোষণা করা, এই সব হয়তো এই প্রথার বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করবে। মেয়েদের উচিত, যে বর পণ চায় তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করা, তাদের নিজেদের বিবাহের সময়ে

পিতামাতার থেকে আদায় করা আরামের সামগ্রীর উপর এই নিকৃষ্ট লোভ ত্যাগ করা উচিত। ছেলেদের উচিত, যেখানে অর্থ বা সামগ্রী-যেমন আসবাব, গহনা, গাড়ি, ফ্রিজ, ইত্যাদি-বিধুর সঙ্গে দেওয়া হয়, সেখানে বিবাহ করতে অসম্মত হয়ে তাদের পিতামাতা, পরিবার ও আশপাশের সামাজিক পরিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, তাদের বধু ছাড়া আক্ষরিক ভাবে কোনও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করার সংকল্পে স্থির থাকা উচিত, কারণ তা মানবিক সম্মানের পরিপন্থী এবং প্রাচীন গ্রন্থকারেরাও নিম্নতম স্তরের বিবাহই কেবল স্বীকার করেছেন। ছেলেদের উচিত অনুপার্জিত অর্থ গ্রহণ করা যে শুধু অপরাধ তা নয়, তাদের নিজেদের উপার্জনক্ষমতার বিরুদ্ধে অপমান, এ কথা ঘোষণা করা; এই প্রথা তাদের মানবিক সম্মানের অবমাননা এবং তাদের আত্মসম্মানের পরিপন্থী।

তনয়া

প্রাচীন ভারতবর্ষে পুত্র জন্মালে শাঁখ বাজত, কন্যা জন্মালে নয়। তাছাড়া ভাইফোঁটা, জামাই ষষ্ঠী, সবই পুরুষকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। জন্মদিনও ছেলেদেরই বেশি হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এ বলা হয়েছে: যে নারী পুত্রের জন্ম দেয় সেই শ্রেষ্ঠ নারী। যে নারী কন্যার জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরে ত্যাগ করা যায় (৬:৩:১৭:১৩)। বৌধায়ন ধর্মসূত্র (২:৪:৬) ও আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (১:১০:৫১-৫৩; ২২:৫:১১,১৪) অনুযায়ী প্রাচীন সমাজ কন্যার জন্মে হতাশ হত। মনুসংহিতা-য় বলা হয়েছে, পুং নামক নরক থেকে উদ্ধার করে বলে 'পুত্র' বলা হয়; শাস্ত্রকারেরা কল্পনাশক্তি দিয়ে এমন একটি নরক সৃষ্টি করার প্রয়োজন মনে করেননি, যেখানে থেকে কন্যা তার পিতামাতাকে রক্ষা

করতে পারে। পিতার মুখাঙ্গি করার মৌলিক অধিকার পুত্রেরই আছে, মৃত পিতাকে পিণ্ডদান ও পিতামাতার শ্রাদ্ধেরও অধিকার আছে। কারণ সমাজে বাল্যবিবাহের অনুপ্রবেশ ঘটায় পর বিবাহের সময়ে বালিকা কন্যার গোত্রাস্তার হত, তাই ভিন্ন গোত্রের পিতামাতার জন্য তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার অধিকার ছিল না। কিন্তু পিতামাতার সঙ্গে একই গোত্র হওয়ায় পুত্রের সেই অধিকার ছিল। পিতা যেহেতু পরলোকে তার মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার বিষয়ে পুত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল, পুত্রের সামাজিক মূল্য কন্যার চেয়ে বেশি, কন্যা সেই অনুপাতে উপেক্ষিত।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আমরা দেখি, সোমযাগের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে কতগুলি যন্ত্রীয় পাত্র মাটিতে রাখা হত, কতগুলি আবার উপরে রাখা হত। 'সেইজন্য শিশুকন্যাদের জন্মের পর মাটিতে রাখা হয়, শিশুপুত্রদের তুলে ধরা হয়।' (৬:৫:১০:৩)। রোমে শিশুকে জন্মের পর মাটিতে রাখা হত এবং পিতাকে ডাকা হত, পিতা যদি শিশুকে দেখে বেঁচে থাকার যোগ্য মনে করত, সে তাকে মাটি থেকে তুলে নিত। এখান থেকেই আমরা ইংরেজি 'rearing up the child' বাক্যাংশটি পেয়েছি। কিন্তু লক্ষণীয় যে এই তুলে ধরায় ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হত না। এ দেশে কন্যাসন্তান জন্ম থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

গর্ভাবস্থায় 'পুংসবন' অনুষ্ঠান করা হত, যাতে নলজাতক পুত্রসন্তানই হয়, কন্যা নয়। সমাজ নানা মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটাই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে— সদ্যোজাত সন্তানটি যেন সব সময়ে পুত্রই হয়। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর আশপাশে রচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এ বলা হয়েছে, 'নারী অমঙ্গলজনক, কন্যা অভিশাপ।' (৬:৩:৭:৩) মহাভারত-এও দেখি কন্যা শোকের কারণ। (১:৫৯:১)

আমরা শুনতে পাই পূর্বজন্মের পুণ্যফল পুরুষ হয়ে জন্মানো যায়। মহাভারত-এ স্পষ্টই বলা হয়েছে, পূর্বজন্মের পাপের ফলে নারী হয়ে জন্মাতে হয়।

(৬:৩৩:৩২) এক নারীর আত্মত্যাগে সন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধ এক সময়ে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, সে যেন পরজন্মে পুরুষ হয়ে জন্মায়। সোজা কথায়, এই গল্পটি সেই ধারণাই সমর্থন করে যে নারী হিসেবে জন্ম ঘণ্য, কিন্তু পুরুষ হয়ে জন্মানো শুভ, কারণ তা পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মের ফল। তাই কন্যার জন্মে পরিবারের বা সমাজের সব সদস্যরা তৎক্ষণাৎ মনে করত, সে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কোনও পাপ করেছে, তাই কন্যা হয়ে জন্মেছে।

সমাজ সাধারণ ভাবে কন্যাদের শিক্ষার অধিকার দেয়নি, কারণ উপনয়ন না হলে কেউ বেদ পড়তে পারে না এবং কন্যাদের উপনয়ন হতে পারে না। কিন্তু কয়েকটি সম্মানজনক ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল; বৃহদারণ্যকোপনিষদ-এ বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি পণ্ডিতা ও দীর্ঘায়ু কন্যা কামনা করে, তার উচিত তার পত্নীকে তিল ও ঘি দিয়ে অন্ন খাওয়ানো।' (৬:৪:১৭)

অতএব কিছু মানুষ নিশ্চয়ই শিক্ষিত কন্যা চাইত এবং কন্যাদের শিক্ষা দেওয়ার কোনও উপায় খুঁজে পেয়েছিল, এগুলি যদি ব্যতিক্রমও হয়। সারা পৃথিবীতেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত নারীর শিক্ষার অধিকার স্বীকার করা হত না। এখানেও ঠিক তাই। মনু বলেছেন, 'বিবাহ হল নারীর উপনয়ন, স্বামীর গৃহে জীবন কাটানো গুরুগৃহবাস এবং স্বামীসেবা বেদপাঠ।' (মনু সংহিতা ২:৬৭)

সাহিত্যে কন্যার শৈশবের কোনও বর্ণনা নেই। কালিদাসের কুমারসম্ভব এ দু' একটি শ্লোকে গৌরীর শৈশবের বর্ণনা আছে, যদিও গৌরী পূর্ণ দেবী। কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কিন্তু শুধু যে বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি আছে তাই নয়, সঙ্গীতে, চিত্রে,

মূর্তিতে, যাত্রাভিনয়ে তার অসংখ্য বর্ণনা আছে। কোনও দেবীর বা কোনও নারীর শৈশবের এ রকম বর্ণনা কিন্তু কখনও মেলে না।

পুরুষকেন্দ্রিক সমাজে কন্যা অবাঞ্ছিত অতিথি। রাজস্থানে জন্মের পরেই কন্যা হত্যার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এখনও ওই রাজ্যে এমন কিছু গ্রাম আছে যেখানে কোনও কন্যাসন্তান নেই; গ্রামবাসীরা প্রতিবেশী গ্রাম থেকে স্ত্রী জোগাড় করে। এ দেশে অন্তত ২৫০০ বছর ধরে দূতমূল ধারণা আছে যে কন্যা অমঙ্গল। কন্যাপণ যখন ধীরে ধীরে অথচ সাধারণ ভাবে যৌতুকে পরিণত হল, যা আবশ্যিক এবং আকাশচুম্বী, যাতে পিতামাতা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, সমাজ যে তখন এই যন্ত্রণার মূল কন্যাকে দৈব নির্ধুরতা হিসেবে দেখেছিল, তা আশ্চর্য নয়। তাই পণপ্রথা প্রচলিত হওয়ার পর এই বিশ্বাস, যা জনমানসে আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা অর্থনৈতিক স্বীকৃতি পেল।

তার মানে সব কন্যাসন্তান সব সময়েই পিতামাতার কাছে অবাঞ্ছিত ছিল বা তাদের স্নেহ পেত না, তা নয়; সমাজে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ছিল। অনেক পরিবার ও ব্যক্তির উদারনৈতিক মতবাদ কন্যার আগমনকে উষ্ণ ভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, কিন্তু আগে যা বলা হল তা হল সাধারণ চিত্র। পরিবারে পুত্র ও কন্যার প্রতি যত্ন ও স্নেহের তারতম্য এখনও অনেক ক্ষেত্রেই চমকে দেয়। সমাজতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকদের গবেষণা দেখিয়েছে যে অপুষ্টির অনুপাত ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশি। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অবহেলা অনেক বেশি হয় এবং অনেক বেশি দিন ধরে হয়। যে মায়ের শুধু মেয়ে আছে, সে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, অপরাধবোধে ভোগে। সে যে উত্তরাধিকারী ও শ্রাদ্ধাদিকারী না হতে পারার অপরাধবোধ। পুত্র ও কন্যার মধ্যে সাম্যভাবের অভাবে অনেক পরিবারে মেয়েরা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। শাস্ত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার ফলে বহু শতাব্দী ধরে তাকে কোথাও জন্মের পরেই হত্যা করা হয়েছে, কোথাও অবহেলা করা

হয়েছে এবং সারা দেশেই পরিবারে ও সমাজে নীচু চোখে দেখা হয়েছে। সে অস্বাস্থ্যে ভোগে, রোগের সময়ে অবহেলিত হয় এবং অবহেলা ও অপুষ্টির কারণে তার ক্ষেত্রে মৃত্যুর আনুপাতিক হার অনেক বেশি।

আধুনিক যুগে এর আর একটি প্রকাশ হল, গর্ভাবস্থায় ভ্রমণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য পিতামাতার অশোভন, উগ্র আগ্রহ, যাতে চিকিৎসকেরা সহায়তা করেন। এগুলি একত্র হয়ে দিবালাক দেখতে পাওয়ার পূর্বেই কন্যাসন্তানকে হত্যা করে। আজকেও কী আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও স্বীকার করতে পারি না, যে পুত্র এবং কন্যার দুজনকেই সমান স্থান দেওয়া পিতামাতা ও সমাজের আবশ্যিক মানবিক কর্তব্য? এর ব্যতিক্রমকে মহাপাপ বলে গণ্য করার সময় হয়েছে? এবং সেই ব্যতিক্রমকে আইনত দণ্ডনীয় করতে এখন আইন তৈরি করা উচিত। জন্মসূত্রে যে অধিকার এবং পারিবারিক ও সামাজিক অভ্যর্থনা কন্যাসন্তানের প্রাপ্য যা এতদিন তাকে অস্বীকার করা হয়েছে, তাই এখন তাকে দেওয়া উচিত? তা না হলে মানবিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন ঘটবে; তা না হলে আমাদের সব শিক্ষণ লজ্জা পাবে এবং কুটিল বলে গণ্য হবে।

মহাভারত-এ ভার্গব-প্রক্ষেপণের সামাজিক কারণ

পণ্ডিতদের মতে মহাভারতমহাকাব্যের সূচনা এবং চূড়ান্ত রূপায়ণ এই দুই পর্বের মধ্যে প্রায় আট শতাব্দী সময় কেটে গেছে—মূল বীর গাথা যা এই মহাকাব্যের বীজ এবং তার পরে প্রক্ষিপ্তভাবে এবং কখনও বা ধীরে ধীরে, এই কাব্যের সৃষ্টি নিরন্তর ভাবে এই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। এই আট শতাব্দী ধরে উত্তর ভারতে অন্যান্য সাহিত্যও রচিত হয়েছিল এর মধ্যে ছিল মহাবস্তু ও

ললিত বিস্তার, কিছু কিছু জৈন গ্রন্থ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, যাঞ্জুবল্ক্য স্মৃতি, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, রামায়ণ ও মনুসংহিতা। এই সময়ের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় যুগের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলিতে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলিতে দেখা যায় বহু উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অথচ সুসংহত সামাজিক ধ্যান ধারণা মিলে গেছে।

মধ্যপ্রদেশের খোহা গ্রামে একটি লেখে (৫৩৬ খ্রি.) বলা হয়েছে মহাভারত-এর শ্লোক সংখ্যা শতসহস্র (১ লক্ষ)(১); বর্তমানে প্রাপ্ত পুনা সংস্করণে দেখা যায়। এই সংখ্যা মোটামুটি ৮২,০০০। মহাকাব্যের মধ্যেই বলা হয়েছে এর শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০। কেমন করে এই ২৪,০০০ শ্লোকের বীজকাব্য পল্লবায়িত হল ৮২,০০০-এ সে কথাও কাব্যের মধ্যেই বলা হয়েছে। (২) এই কাব্যের মুখবন্ধ ছিল তিনটি; মনুর উপাখ্যান, আস্তিকের উপাখ্যান আর উপরিচর উপাখ্যান। (৩) অর্থাৎ মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল তিনটি পর্যায়ে, এর তিনটি পৃথক পৃথক নামও ছিল, সম্ভবত রচনার বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জয়, ভারত এবং মহাভারত। (৪) এই মহাকাব্যে বলা হয়েছে এই গ্রন্থ রচনার পরে ব্যাসদেব তা পাঠ করেন। তাঁর পুত্র শুকদেবের কাছে, এবং তারপরে তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের কাছে। (৫) শুকদেব এটি আবৃত্তি করেন জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে এবং সম্ভবত সেই সময়ই চিরন্তন মূল্যবোধের নীতিমূলক আখ্যানগুলি যুক্ত হয়। কিন্তু এই প্রক্ষেপণ খুব বৃহৎ অংশের নয় এবং এই বীরগাথাত্মক কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত অংশের ভাবনা ও সৌন্দর্যবোধ মিলে যায়। অনেক পরে, শৌনকের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সোম যজ্ঞে, রাজা সূত লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবসকে মহাকাব্যটি আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর প্রথম অনুরোধ ছিল ভার্গব বংশের একটি ঐতিহাসিক, প্রথম বিবরণের জন্য। (৬) এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ফলে আলোচ্য অংশের রচয়িত ভৃগুবংশের গুণকীর্তন করার সুযোগ পেয়ে যান, ভার্গবদের

কীর্তিকে মহত্তর রূপে প্রচার করা হয় এবং প্রক্ষিপ্ত অংশের অতিরিক্ত প্রামাণ্যতা সৃষ্টির সুযোগ পাওয়া যায়। যখন এই ভার্গবদের বিবরণ শেষ হল, তখন শৌনক ব্যাসরচিত জয় সংহিতা শোনার ইচ্ছা করলেন। (৭)

চারণ লোমহর্ষণ ও তাঁর পুত্র উগ্রশ্রবস, এই সূত্র পরিবার একত্রে প্রক্ষিপ্ত অংশের এক বৃহৎ ভাগের অধ্যায়গুলি রচনা করেন। এই প্রক্ষেপণ, বর্তমান মহাকাব্যটির আকারের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি; একেই বলা হচ্ছে ভার্গব বা ব্রাহ্মণ্য সংযোজন। রচনামূল্যের বিচারে এই অংশটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অতি-অলঙ্কৃত, শব্দভারাক্রান্ত এবং পুনরুক্তি দুষ্ট। (৮) আদি, বন, দ্রোণ, শল্য, শান্তি এবং অনুশাসন পর্বগুলির অধিকাংশ এই প্রক্ষিপ্ত অংশেরই অন্তর্গত; এবং আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান এবং স্বর্গারোহণ সম্ভবত সম্পূর্ণভাবেই প্রক্ষেপণের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আকর্ষণীয় তথ্য এই যে, এই ভার্গববংশেরই কৃষ্ণের জন্ম, যারা তাকে মহিমাম্বিত করে উপস্থিত করবেন। ভৃগুর পুত্র কবি, তারই সন্তান শুক্রাচার্য, যার কন্যা দেবযানী হয়েছিলেন যদুর জননী; এই বংশধারাতেই কৃষ্ণের জন্ম। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে চূড়ান্ত ভাবে ভার্গবেরা কৃষ্ণের গুণগান করে যাবেন যতক্ষণ না তিনি প্রকৃত অর্থে একজন দেবতা হয়ে উঠেছেন।

মনুসংহিতা-ও সেই একই যুগের সৃষ্টি যখন এইসব সংযোজন ঘটেছিল; এই গ্রন্থ ভার্গব বংশেরই এক শিষ্যের রচিত। (৯) মহাভারত কোনও ধর্মসূত্র বা স্মৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করে না; যে সময়ে মহাভারত রচিত হয়েছিল তাতে প্রাচীন সূত্রসমূহের প্রকৃত উৎস বিস্মৃতিতে ঢেকে গিয়েছিল, যদিও শাস্ত্রের কোনও বস্তুগত পরিবর্তন ঘটেনি। (১০) এই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভৃগুবংশের তরুণ ব্যক্তির ও শিষ্যেরা, খ্রিস্টীয় যুগের প্রারম্ভিক

শতাব্দীগুলিতে দুটি অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করেন; অর্থাৎ মনুসংহিতা এবং মহাভারত-এর ভার্গব সংযোজন এই সময়ে ঘটেছিল।

আধুনিক পণ্ডিত এম আর ইয়াদি, মহাকাব্যের রচনার পর্যয়গুলির বিষয়ে সুকথঞ্চরের মতামত মেনে নিয়েছেন। (১১) কিন্তু তার মতে আরও দুজন লেখক এই রচনার সঙ্গে জড়িত, যাঁরা হরিবংশ এবং আলোচ্য মহাকাব্যের পর্বসংগ্রহ পার্বণ রচনা করেন। হরিবংশ অনেক পরবর্তী রচনা, আর পার্বণ। অধ্যায়টি মহাকাব্যের উপর তার প্রভাবের বিচারে অকিঞ্চিৎকর। ভার্গব অধ্যায়েই আলোচ্য দুটি পর্বের সূত্রপাত যথাযথ ভাবে আন্দাজ করা যায়। এই সংযোজিত অংশেই যে যুদ্ধ কাহিনি প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ঘটনার সময়ে তৎকালীন শাসকবংশে কৌরবদের অনুকূলে রচিত হচ্ছিল, সেই কাহিনিকে বিজয়ী পাণ্ডবদের অনুকূলে পরিবর্তিত করা হয়। সূত্র লোমহর্ষণ ও সৌতি উগ্রশ্রবসের এই রচনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কেন তাঁরা এই অংশগুলি রচনা করলেন? ভার্গব অংশগুলির সঙ্গে সহঘটিত ভাবে যুক্ত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল সংস্কৃত ভাষার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। প্রাকৃতের ক্রমশ সমৃদ্ধি হচ্ছিল। কিন্তু বিদেশি অভিযানকারীরা সংস্কৃতকেই প্রাধান্য দিতেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম 'যুপ' শিলালেখ কণিষ্ক সংস্কৃত ব্যবহার করেছেন, রুদ্রদমন ও তাঁর বিখ্যাত শিলালিপিতে (১৫০ খ্রি.) সংস্কৃতই ব্যবহার করেছেন। এই ভাবে বিদেশি শাসক গোষ্ঠীগুলি সংস্কৃতের মাধ্যমে ভাষাগত ঐক্য খুঁজেছেন এবং পুরোহিততন্ত্রের এতে সাগ্রহ সম্মতি ছিল, কারণ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা থেকে দূরবর্তী এবং সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য না থাকার ফলে এটি পুরোহিত শ্রেণির হাতে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠেছিল।

যেহেতু মহাভারত তার কাব্যগত উৎকর্ষের জন্য ইতিমধ্যেই বিপুল ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, ভার্গবদের পক্ষে নিজেদের মতামত বিস্তারিত করার

জন্য এটিই ছিল শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাদের রচনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই এই সংযোজনের কারণ বোঝা যায়।

ধর্মের ক্ষেত্রে এই ভার্গব গোষ্ঠী সর্বপ্রথম সম্প্রদায়গত ধর্মের জন্য এক প্রকার দেবতাতত্ত্ব ও একটি ধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টি করলেন—মুখ্যত শিব এবং কৃষ্ণ এই দুই দেবতাকে ঘিরে। ঋগ্বেদ-এ রুদ্র ছিলেন সম্পূর্ণ ভাবে এক গৌণ দেবতা। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে তিনি অবশ্য রুদ্র-শিব রূপে অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব পেয়েছেন। কিন্তু মহাকাব্যের আলোচ্য অংশে তিনি প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ, ভীতিকর, একজন প্রধান দেবতা হয়ে উঠেছেন, গ্রিক পর্যটকরা 'সিবই' নামে জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তাঁরই শৈব সম্প্রদায়। ভার্গব প্রক্ষেপণগুলিতেই প্রথম শিবের উপর মানবত্ব আরোপিত হতে দেখা যায়। এখানে শিবের ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে, অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে একজন প্রধান দেবতারূপে গড়ে তোলা হয়েছে। দ্রোণপর্বে আমরা প্রথম শিবের মধ্যে প্রলয়কর্তার রূপ দেখি; সৌপ্তিক পর্বেও তাঁর ভূমিকা ওই একই রকম। দ্রোণপর্ব এবং অন্যত্র কৃষ্ণ তাঁর গুণগান করেছেন। (১২) ব্যাস ও পরমেশ্বর শিবের স্তুতি করেছেন। (১৩) অন্যান্য দেবতারাও ত্রিপুর ধ্বংসের পূর্বে তাঁর বন্দনা করেছেন। (১৪) অশ্বথামা(১৫) এবং উপমন্যু(১৬) তাকে দেবাদিদেবরূপে, সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারের দেবতারূপে স্তুতি করেছেন। এই সব চিন্তার কোনও কোনও ধারণা ইতিপূর্বেই বৈশম্পায়ন রচিত মহাকাব্যের 'ভারত' পর্যায়েই দেখা গিয়েছিল। এই সময়েই পাশুপত ও লকুলীশ এই সম্প্রদায় দুটির বীজাকারে সূচনা হয়। বনপর্বে আমরা গাণপত্য সম্প্রদায়ের ধর্মগত আচার অনুষ্ঠানের সূচনা দেখতে পাই।

ভার্গব পর্যায়েই অপর প্রধান দেবতা হলেন কৃষ্ণ; তাঁর দেবত্ব আরোপ করেছেন সূত এবং সৌতি। বাসুদেব এবং নারায়ণীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ইতিপূর্বেই ছিল; এখন যা ঘটল তা হল: প্রথমত বিষ্ণু এবং নারায়ণ উভয়ের সমন্বয় ঘটেছিল কৃষ্ণের মধ্যে এবং এদের সম্মিলিত ভাবরূপ হয়ে উঠেছিলেন

পরমেশ্বর। ঋত্রিয় কাব্য জয়সংহিতা-তে পাণ্ডবের সখা রূপে, মথুরার রাজা রূপে কৃষ্ণের যে চরিত্র সেখানে কোথাও কৃষ্ণ দেবতা নন। পরবর্তীকালে, তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাসুদেব সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু। (১৭) বৈশম্পায়ন কৃত বিবরণে তিনি কেবলমাত্র বৃষ্ণিদের কাছেই একজন দেবতা রূপে স্বীকৃত। এই অংশের মানব কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পদস্পর্শ করেন, যেমন ভাবে কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠকে প্রণাম করেন, সাধারণ মানুষ কোনও ধার্মিক সাধু চরিত্রের ব্যক্তিকে প্রণাম করে। পরবর্তীকালে ভার্গব-সংযোজন অংশে, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন, যেমন আচরণ করেন কোনও শিষ্য তার গুরুর প্রতি। ভূরিশ্রবস, কৃষ্ণের কোনও দেবমহিমা উপলব্ধি করে না, তাই অর্জুনকে তিরস্কার করে বলে—‘বৃষ্ণিরা অ-সভ্য, পাপপুণ্যের ভেদজ্ঞান রহিত দুষ্টি; এই গোষ্ঠীর কোনও লোককে তুমি কি করে সম্মান কর?’ (১৮) এই মানব কৃষ্ণ উমার কাছে বর প্রার্থনা করেন এবং উমা বলেন ‘কেমন করে তুমি, একজন সাধারণ মানুষ, সত্যের পথ জানবো?’ (১৯)

৪০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আগাথোর্কেস-এর মুদ্রায় কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি প্রথম পাওয়া যায়। একজন বিদেশি শাসকের মুদ্রায় এটিই একমাত্র প্রতিমূর্তি। পরবর্তী সময়ে হেলিওডোরাস নিজেকে বলেছেন একজন ভাগবত, বাসুদেবভক্ত। বিষ্ণু নারায়ণের পরে, পঞ্চ বৃষ্ণি-বীরের বৃহ থেকে বাসুদেবই নিজস্ব, পৃথক সত্তা রূপে পরিগণিত হন এবং ধীরে ধীরে একজন মুখ্য দেবতার স্থান গ্রহণ করেন। ভার্গব গোষ্ঠী তার নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে নিজেদের লক্ষ্য স্থির করেছিল। সভাপর্বে শিশুপালের প্ররোচনামূলক ঔদ্ধত্যের প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই অঘোষিত লক্ষ্যের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। এর পরে, বনপর্বে মার্কণ্ডেয় দেখেন শিশুর উদরে মহাজাগতিক সমুদ্রে ভাসমান মহাব্রহ্মাণ্ড। (২০) দ্রোণ পর্বে এবং অন্যত্র এরই বর্ধিত এবং অতিরঞ্জিত বিবরণ দেখা যায়। বনপর্বে আমরা কৃষ্ণবন্দনা দেখতে পাই। এগুলি উদাহরণযুক্ত আখ্যানের অন্তর্নিহিত। এমনকী বনপর্বে কল্পি অবতারেরও উদ্ভব হয়েছে। শিব এবং কৃষ্ণকে ঘিরে এই যে নূতন

সম্প্রদায়গত ধর্ম গড়ে উঠল তার কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। এই প্রথম একজন দেবতা অধ্যাত্মজীবনে একজন পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখা দিলেন। এ বিষয়ে প্রথম ছিলেন ঐতিহাসিক চরিত্র বুদ্ধ, তার মহিমা গান করা হয়েছে ললিত বিস্তার, মহাবস্তু, অবদানশতক এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যত্র। বৈদিক দেবতারা ব্যক্তিগত পরিত্রাতা ছিলেন না; তারা শুধুমাত্র পার্থিব প্রাপ্তির বিষয়ে আশীর্বাদ দিয়েছেন এবং ঋগ্বেদ সংহিতা-র অর্বাচীন অংশগুলিতে স্বর্গসুখের বিষয়ে কিছু অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিও দেখা যায়। জীবন এতই আনন্দময় ছিল যে মানুষের লক্ষ্য ছিল যত দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্ভব, জীবনকে প্রাণভরে উপভোগ করা। তাই বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন দীর্ঘ জীবন, প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি অর্থাৎ সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যসহ পার্থিব সুখ'। পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্য এবং প্রাথমিক যুগের উপনিষদগুলিতে, জীবনকে মূলত দুঃ খদায়ী বলে চিত্রায়ন শুরু হল কারণ এই সময় থেকেই জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তনের ভাবনা রূপ নিয়েছে। সুতরাং এই সময়েই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় এই অস্তিত্বচক্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করা। এখন লক্ষ্য ছিল মোক্ষলাভ এবং এই সব নুতন দেবতারা মুক্তির বরদান করতেন। এই প্রথমবারের জন্য আরাধ্য দেবতা আর তাঁর ভক্তের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণের দ্বারা একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল-তা হল ভক্তি। এখন থেকে এই ভক্তিই মোক্ষলাভের একমাত্র সত্য পথ বলে স্বীকৃত হল। মৌর্য এবং গুপ্ত যুগের মধ্যবর্তী সময়ে সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করার একমাত্র উপায় ছিল তার কর্তৃত্বের কাছে ভক্তির মাধ্যমে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ; এই যুগের ধর্মমতেও এই মনোভাবই অন্তত আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে। ভক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ধরেই এল পূজা, বিগ্রহ, মন্দির এবং নুতন ধরনের অর্ঘ্য-উপহার। ভগবদগীতা-য় কৃষ্ণ বলেছেন 'পত্র, পুষ্প, ফল, জল যা কিছু ভক্তির সঙ্গে আত্মসংযমী ভক্ত আমাকে উৎসর্গ করেন তা-ই আমি গ্রহণ করি।' (২১)

এই অংশেই প্রথম মূর্তি পূজা দেখা গেল। কৃষ্ণ বলেন, 'আমার একনিষ্ঠ ভক্ত যে রূপে আমায় পূজা করতে চায় আমি সেই রূপই গ্রহণে স্বীকৃত হই।' (২২) এখনই সর্বপ্রথম আমরা উপবাসের উপকারিতা এবং ব্রতরক্ষার পুণ্যফল সম্পর্কে অবহিত হই। (২৩) এই সব তন্ত্রও পুরাণে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে, কিন্তু মহাকাব্যের এই সব আলোচ্য অংশেই এগুলি প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ব্রতপালন না করে, তীর্থদর্শন না করে কেউ স্বর্গলাভ করতে পারে না। (২৪) বনপর্বেতীর্থসমূহের একটি বিশদ বিবরণী আছে। (২৫) নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী আশ্রয়স্থল, পর্বত এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক আকর্ষণীয় স্থান এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। এই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে বিষ্ণুর অবতার সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে মেন নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বলরাম এবং কঙ্কিন। (২৬)

স্বর্গনরকের বিচার উদ্ভূত হল এই প্রথম। বিত্তবান সমাজের প্রত্যক্ষগোচর উচ্চমানের জীবনযাত্রার এক কল্পিত প্রতিফলনেই স্বর্গের রূপকল্পনা করা হয়েছিল এবং ক্ষমতাশালীর হাতে দুর্বলের নিপীড়নের প্রতিচ্ছবি ছিল নরকের রূপকল্পনাতে। এই ভার্গব অংশে আমরা দুর্লক্ষণ, অমঙ্গলের পূর্বাভাস, প্রভৃতির বিবরণ পাই। (২৭) অর্বাচীন ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ইতিপূর্বেই পুরোহিতদের যজ্ঞ-দক্ষিণার কথা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন দেখা দিলেন এক নূতন শ্রেণির পুরোহিত যাঁরা পূজা পরিচালনা করতেন, ব্রতপূর্ণ করার পারণ কর্যে সাহায্য করতেন এবং তীর্থস্থানে সঠিক ভাবে পূজা দেওয়ার কাজে তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করতেন। এই সব পারিবারিক ও মন্দিরের পূজারীরা বর্তমানে বর্ধিত দক্ষিণা চাইতে লাগলেন এবং পেতে শুরু করলেন।

এই সব কিছুই কারণ যে সব দার্শনিক তন্ত্র সেগুলি ইতোমধ্যেই উপনিষদসমূহে প্রচারিত হয়েছিল, এর মধ্যে কর্ম ও জন্মান্তরিবাদের তন্ত্রগুলিই প্রধান। এখন যে নূতন তন্ত্রের উদ্ভব হল তা হল ভাগ্য বা নিয়তিবাদ। (২৮)

যুক্তির বিচারে, নিয়তিবাদ আর কর্মফল্যবাদ একে অন্যের সঙ্গে মেলে না, কিন্তু ভার্গব অংশে উভয় তত্ত্বের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখা যায়।

গৌতমীপুত্রের অকালমৃত্যুর উপাখ্যান দিয়ে অনুশাসন পর্ব শুরু হয়—কাল, মৃত্যু এবং কর্ম পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে, যতক্ষণ না সিদ্ধান্ত হয় যে মৃত বালক তার মৃত্যুর জন্য নিজেই প্রকৃত দোষী। সমস্যা ছিল এই যে গৌতমী বা তার পুত্র কেউ জানত না যে মৃত্যু কেন ঘটেছে; তাদের কাছে এই মৃত্যু ছিল ভাগ্য, অ-দৃষ্ট। কর্মফলবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য অজস্র উপাখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও কর্ম আর পুরুষকারের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী তাই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। দৈব অনুগ্রহ, অকারণ আনুকূল্যের বিপরীতে কেলভিনের পূর্ব নির্ধারণের তত্ত্বের মতোই এখানেও একটি তত্ত্ব দেখা যায়। এই সব তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বিরোধ বোঝা যায় একটি প্রশ্ন থেকে: তথাকথিত বিদেশী আত্মার পরিণতি কী হয়? মুক্তি? স্বর্গ? নরক? প্রেতাবস্থা? পূর্বজন্ম? মানুষ রূপে না পশুরূপে? প্রথমে কোনটি? কত দিনের জন্য? মৃত্যুর পরে কর্মের আপেক্ষিক ফলাফল সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করার জন্য কোথাও একটি নির্দিষ্ট বিধি নেই।

বিভিন্ন কর্মের জন্য আমরা একই প্রকার ফলের বিভিন্ন উদাহরণ এবং একই কর্মের বিভিন্ন ফলের উদাহরণ দেখতে পাই; চিত্রগুপ্ত একজন সাধারণ হিসাবরক্ষক, তার উপরে কোনও সচিব নেই। এই শেষতম প্রক্ষিপ্ত অংশে হঠাৎ অলৌকিক ভাবনার অত্যাধিক্য দেখা যায়। মূল জয়সংহিতা প্রকৃতপক্ষে ছিল মানব বীরদের কাহিনি; সেখানে দেবতাদের মুখ্য স্থান ছিল না। চাডউইক বলেন, 'বীরগাথাতে যে লৌকিক কাহিনি অপেক্ষা অলৌকিকের প্রাধান্য অনেক কম, তার কারণ নিঃসন্দেহে এই যে, ওই সময়ের রাজসভাগুলি জনসাধারণের অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষা এক অনেক উন্নত স্তরের সংস্কৃতির অধিকারী ছিল।'(২৯) অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত এবং

কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিত শ্রেণির লেখকরাই ভার্গবদের সংযোজিত অংশে অলৌকিক ঘটনার বাহুল্য বিস্তার করেন।

ঘটনাপ্রবাহকে আরও জটিল করে তুলতে, এই সময়ই প্রথম দেখা যায় রাশি রাশি অভিশাপ আর আশীর্বাদের ঘটনা। তপস্যার অন্তর্বর্তী অবসরে কোপনস্বভাব মুনিঋষিরা মানুষকে অভিশাপ দেন। আবার সেবা প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হয়ে তারা বরদান করেন—কিন্তু কার্য আর অভিশাপ/আশীর্বাদের কোনও নৈমিত্তিক যোগসূত্র নেই। অতএব বিভ্রান্ত মানুষের কাছে অভিশাপ বা আশীর্বাদ দৈবলীলার রূপ নেয়। পুনর্জন্ম, কর্ম এবং ভাগ্যের তন্ত্রসমূহ একই উদ্দেশ্য সাধন করে, অতীত এবং ভবিষ্যৎকে অজ্ঞাত এবং অ-জ্ঞেয় তন্ত্রসমূহ একই উদ্দেশ্য সাধন করে, অতীত এবং ভবিষ্যৎকে অজ্ঞাত এবং অ-জ্ঞেয় বলে প্রচার করে; ফলস্বরূপ, বর্তমান হয়ে পড়ে বোধের অতীত। এই সব কিছুই অবধারিত ভাবে সাধারণ মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলে দেয় এক বিশেষ শ্রেণির হাতে, যারা জীবনের রহস্যময়তার গভীরে প্রবেশ করার ভান করে থাকে। এক শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে এই সুবিধাভোগী শ্রেণির প্রাথমিক স্বার্থ হল জনসাধারণের কাছে অটল বিশ্বাস এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রাপ্তি, ভাষান্তরে যাকে বলা যায় শোচনীয় বশ্যতা। যার ফলে ইহজন্মে দুঃখ প্রাপ্তি। পূর্বজন্মের সেই অজ্ঞাত পাপকে ব্যাখ্যা করার নামে এবং উন্নততর অবস্থায় পুনর্জন্ম নিশ্চিত করার নামে এই শ্রেণি সাধারণ মানুষের কাছে আনুগত্য ও সেবা দাবি করে, পেয়েও থাকে। এই তথ্যের উদাহরণে ভার্গব সংযোজিত অংশ ভারাক্রান্ত।

এখানে আমরা দেখি রাজা এক নূতন মহিমায় মগ্নিত। ইহ-পরলোকে তাকে ধর্মত এবং বাস্তবত 'গুরুর আসন দেওয়া হয়েছে। রাজাকে যে অবহেলা বা অপমান করে তার দান, যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধের পুণ্য বিনষ্ট হয়। (৩০) ন্যায়নিষ্ঠ রাজা একজন চিরন্তন দেবতা, এমনকী দেবতারাও তাকে সম্মান

করেন।(৩১) সমৃদ্ধি চায় যে মানুষ তারা প্রথমেই রাজা নির্বাচন করে।(৩২) যেমন করে শিষ্যরা গুরুকে প্রণাম করে তেমনই মানুষদের উচিত রাজাকে প্রণাম করা। যেমন দেবতারা ইন্দ্রকে স্তুতি করেন তেমনই প্রজাদের উচিত রাজাকে স্তুতি করা।(৩৩) একজন রাজাকে কখনও মানুষ ভাবা এবং অবহেলা করা উচিত নয়। নররূপে তিনি এক মহতী দেবতা।(৩৪)

খ্রিস্ট পূর্ব যুগের শেষ শতকগুলিতে যে সব অভিযানকারী গোষ্ঠীগুলি উত্তর ভারতে এসেছিল, তারা সকলেই নিজ নিজ রাজাকে অতিমানব মনে করত। ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক, রোমান, হুণ রাজ্যের অধিবাসীরা; সিথিয়ান, কুয়াণ, যুয়ে চিহ, পাসীয় সকলেই নিজেদের রাজাকে অতিমানবীয় মর্যাদা দিয়েছে। এই বিশ্বাসের কথা তাদের মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায়, তাদের রাজাকে প্রায়ই বলা হয়েছে দেবপুত্র, তাদের মাথা ঘিরে এক জ্যোতিবলয় দেখা যায়। ভারতবর্ষেও এই সব প্রভাব পড়েছিল এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত এখানে শক্তিমান রাজাদের পরম্পরা দেখা যায়। সুতরাং রাজশক্তিকে মনে করা হত দৈব শক্তিরই রূপান্তর। ভার্গব সংযোজন সোৎসাহে এই ধারণাকে শক্তিশালী করেছিল। সমুদ্রগুপ্তের সময় হরিশ্বরের লিপিতে আমরা জানতে পারি যে রাজা শক্তিশালী, কারণ, তিনি বন্দি করতে পারেন, মুক্ত করতে পারেন এবং অনুগ্রহ করতে পারেন; তিনি এই তিন কর্মের সমন্বয় সাধক।(৩৫) সুতরাং রাজকীয় কর্তৃত্ব ছিল বন্ধন, মোচন এবং অনুগ্রহ প্রদানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল; খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমে নাসিক শিলালেখে আমরা চতুর্বর্গের ধারক রাজা গৌতমী বলশ্রীর কথা শুনি; নাসিকে রাজা নহপানের জামাতা উষভদত এক ব্রাহ্মণকে তার কন্যার বিবাহের জন্য প্রচুর দান করেছিলেন, এ কথাও জানা যায়। বনঘটে সাতকণীর শিলালেখে বলা হয়েছে রাজা ব্রাহ্মণদের মুক্ত হস্তে দান করেন এবং তিনি বর্গসংকর রোধ করেছেন।(৩৬) একটি গুপ্ত যুগের শিলালিপিতে বলা হয়েছে দানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। সুতরাং রাজার কাছে এইটাই

ছিল প্রত্যাশিত; তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করবেন এবং বর্ণ বিভাগকে অক্ষুন্ন রাখবেন যাতে বর্ণসংকর না ঘটে।

ভাগবি অংশের অন্যতম কেন্দ্রীয় ভাবনা হল বর্ণধর্ম। বর্ণাশ্রমের উচ্চতম যে ব্রাহ্মণ তিনি রাজার মতোই পূজনীয়; তার ক্রোধে সর্বনাশ হতে পারে। বাতাপি ও ঈশ্বলের উপাখ্যান একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। (৩৭) অনুরূপ একটি উপাখ্যান হল কর্তবীর্যাজুন ও পরশুরাম, (৩৮) এগুলি প্রমাণ করে যে ব্রাহ্মণ হল পৃথিবীচারী দেবতা। (৩৯) তার ব্যবহার সাধু বা অসাধু যাই হোক না কেন ব্রাহ্মণকে কখনও অপমান করা চলে না। (৪০) ব্রাহ্মণ অন্য সব বর্ণের সম্পদ নিতে পারে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণের চেষ্টা করে সে দুঃখভাগী হবে। অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রে রাজদ্রোহের জন্য চরম দণ্ড পেতে হত, কিন্তু রাজদ্রোহে অপরাধী ব্রাহ্মণের শাস্তি কেবল নির্বাসন। (৪১) যখন রাজা পাওয়ার জন্য উৎসুক প্রজারা বেণ-পুত্র পুথুকে অভিষেক করেছিল তখন ভবিষ্যৎ প্রজাদের জন্য তাঁর প্রথম প্রতিশ্রুতিই ছিল যে তিনি ব্রাহ্মণদের শাস্তি দেবেন না এবং অন্তর্বর্ণ বিবাহ রোধ করবেন। (৪২) ইওরোপে যেমন চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘ, তিক্ত বিরোধ চলেছিল, তেমনই এ দেশেও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগেই ঋত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। (৪৩) ভার্গব অংশে আমরা দেখি 'পৃথিবীর আধিপত্য কার? ব্রাহ্মণ না ঋত্রিয়ের?'— উত্তর, 'পৃথিবীর সমস্ত কিছুই অধিপতি ব্রাহ্মণ।' তবে ঋত্রিয় কেন রাজা?— উত্তর, যেমন স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা তার দেবরকে আলিঙ্গন করে, এ-ও তেমন। (৪৪) উপাখ্যানে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণের ফল চুরি করায় এক ব্যক্তি বানর হয়ে পুনর্জন্ম নিয়েছিল; আর একজন ব্রাহ্মণকে উদার ভাবে দান না করায় শৃগাল হয়েছিল। (৪৫) এই সব গল্পের স্পষ্ট ভাবেই একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, জমদগ্নি তীর নিয়ে খেলা করতে করতে সেগুলিকে ক্রমেই দূর থেকে আরও দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন; তার পত্নী

রেণুকা সেগুলি কুড়িয়ে আনছিলেন। একবার মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে তিনি ফিরে আসতে দেরি করলেন; ক্রুদ্ধ জমদগ্নি সে কথা জেনে সূর্যকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। সূর্য নীচে নেমে এসে তাকে একটি তাপ নিরোধকারী শ্বেতচ্ত্র দিলেন। অতএব ব্রাহ্মণকে ছত্রদান করলে পুণ্য লাভ হয়।'(৪৬) ব্রাহ্মণকে দানযোগ্য বস্তুর দীর্ঘ ক্লাস্তিকর তালিকা দেখা যায়। সেই সঙ্গে আছে পরলোকে এই সব দানের কত গুণ পুণ্য হবে সে তালিকাও। কেবলমাত্র অনুশাসন পর্বেই পয়ত্রিশটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদে এই বর্ণনা রয়েছে।(৪৭)

কেবল দান নয়, দক্ষিণাও প্রচলিত ছিল বৈদিক যুগ থেকেই; কিন্তু আলোচ্য ভার্গব অংশে এগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছিল গাণিতিক অনুপাতে; পুরাণে এই বৃদ্ধির প্রবণতা শুরু হয়। খাদ্য, বস্ত্র, জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্য, নানা বিলাসদ্রব্য, সোনা, গো-ধন, রথ, ভূমি, দাস এবং নারী—এগুলি যদি প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় তবে ইহলোক-পরলোকে বহুগুণ ফল লাভ করা যায়। কুমারী, শিশু সন্তানসহ বিবাহিতা নারী এবং সন্তানহীনা বিবাহিতা তরুণীর এদের বিশাল সংখ্যায় উল্লেখ আমাদের বোধকে আহত করে। এই সব নারীদের নিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা কী করতেন সে আর এক প্রশ্ন। এই ভার্গব অংশেই আমরা প্রথম শুনতে পাই জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ— ব্রাহ্মণ জাতির কথা। জপতপ অধ্যয়ন ছাড়াও তাকে ব্রাহ্মণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।(৪৮) এবং এই ব্রাহ্মণও পূজনীয়।(৪৯)

মহাকাব্যে ঋত্রিয় হল যোদ্ধা, কিন্তু স্থল-বাণিজ্যে ঋত্রিয়েরা প্রহরী রূপে পণ্যবাহীর সঙ্গে যেতেন। সমকালীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ঋত্রিয়কে সমৃদ্ধ ভূস্বামী শ্রেণিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈশ্যের জীবিকা ছিল দুটি—কৃষি ও বাণিজ্য।

বণিকেরা প্রায়ই ধনী হতেন, ব্রাহ্মণ, ঋত্রিয় ও ধনী বৈশ্যরা একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণিরূপে গণ্য হতেন। প্রাচীন জৈন শাস্ত্র-অঙ্গবিজ-তে দুটি শ্রেণির

কথা বলা হয়েছে। 'অজ্জ' এবং 'পেসস'।(৫০) স্পষ্ট ভাবেই এটি অর্থনৈতিক বিচারে সরল শ্রেণিবিভাগ: ক্ষমতাবান, সমৃদ্ধ শ্রেণি ছিল আৰ্য বা অজ, অবশিষ্টেরা ছিল ভৃত্য, প্রেষ্য বা পেসস।

অর্বাচীন যুগের বৈদিক সাহিত্য থেকেই দেখা যায় শূদ্র হল ভৃত্য, প্রায়ই সে দাস' যে অপর তিন বর্ণকে সেবা করে। মহাকাব্যের আলোচ্য অংশে বলা হয়েছে প্রজাপতি শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন অপর তিন বর্ণের ভৃত্যরূপে।(৫১) শূদ্রের উচিত বিগতদ্বেষ্ট হয়ে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করা।(৫২) ছত্র, প্রলেপন, জুতা, পাখা এবং পরিচ্ছদ যখন জীর্ণ হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হবে তখন শূদ্র দাসকে দিয়ে দেবে।(৫৩) প্রভু স্বচ্ছন্দে তার ভৃত্যের ধন ব্যবহার করতে পারে।(৫৪)

কিন্তু এমনকী এই প্রেক্ষাপটেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। লৌহ লাঙ্গলের ব্যবহার প্রবর্তন হওয়াতে কর্ষণযোগ্য ভূমির বিস্তার হচ্ছিল। এক বৈশ্যের পক্ষে এত পরিমাণ ভূমিতে কৃষিকাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না, সুতরাং কিছু শূদ্রও কৃষিকাজ করছিল, খুব সম্ভব ভাগীদার চাষি হয়ে। দ্বিতীয়ত খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই মৌসুমী বায়ুর পূর্বজ্ঞান পাওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং মাস ও বৎসরের গণনা পঞ্জিকাও প্রচলিত ছিল। ফলত, অতএব সামুদ্রিক বাণিজ্যও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হয়েছিল, এবং কিছু কিছু বৈশ্য, যাদের বিনিয়োগ করার মতো সচ্ছলতা ছিল, তারা এই পরিশ্রমসাধ্য কৃষিকাজ শূদ্রের হাতে ছেড়ে নিজেরা বাণিজ্য শুরু করে। যারা সামাজিক মর্যাদার গণ্ডির বহির্ভূত ছিল যেমন স্লেচ্ছ, চণ্ডাল, পুলকস, স্বপাক, শবর ও নিষাদ-এরা সকলেই সমৃদ্ধিশালী বৈশ্য ও শূদ্রের অধীনে কাজ করত। ভার্গব সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম প্রবক্তা মনু বলেন -এরা হল 'স্বনির্ভর শূদ্র'।(৫৫) যে সব ব্রাহ্মণের শূদ্রযাজী বা শূদ্র প্রতিগ্রাহী ছিলেন না, সমাজে

তাদের স্থান ছিল অধিকতর মর্যাদার। (৫৬) তবুও শূদ্রের অনুষ্ঠানে যাজকবৃত্তি লোভনীয়। চাতুর্যের সঙ্গে এই উভয় সংকটের সমাধান করা হয়েছিল, কারণ মনু বলেন ন্যায়াবতীর্ণ শূদ্রের জন্য ধর্মানুষ্ঠানে যাজন করা যেতে পারে। আর কে সেই ন্যায়াবতী শূদ্র? মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন 'যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সে ন্যায়াবতী'। (৫৭) এই ন্যায়াবতী শূদ্রের পরিবারে কারও মৃত্যু হলে ধর্মীয় অশৌচের কাল-সীমা এক মাস ছিল না, ছিল মাত্র পনেরো দিন। স্পষ্ট ভাবেই, আর্থিক সমৃদ্ধির বিচারে এই সব সুবিধা দেওয়া হত; এখন এই ধনীশূদ্ররা সমাজে উন্নতির সোপানে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছিল। অবশ্য সাধারণ শূদ্র অর্থাৎ শূদ্র জনসমাজের অধিকাংশই পড়ে ছিল দরিদ্র ও অবদমিত স্তরে। তাই আমরা দেখি যারা অর্থ দিয়ে কর দিতে পারে না তারা 'বিষ্টি' অর্থাৎ বাধ্যতামূলক শ্রম দিয়ে তা শোধ করতে পারে। বৃহস্পতি ধর্মসূত্র-তে(৫৮) বলা হয়েছে। শূদ্র বণিককে সর্বোচ্চ হারে কর দিতে হবে। অতএব কোনও কোনও শূদ্র যথেষ্ট হারে এবং অর্থমূল্যে কর দেওয়ার মতো যথেষ্ট ধনী ছিল এবং তা হলেই সমাজে তারা সম্মান পেত। কিন্তু দরিদ্র শূদ্রের অবস্থান ছিল। জঞ্জাল-তুল্য। (৫৯) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলছে, যে রাজার অধীনে বহু শূদ্র প্রজা রয়েছে তারা রাজ্যের বহু অংশেই অ-বৈদিক ধর্মাচরণ হয়।' ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলে শবর, মূর্তিব পুণ্ড এবং অন্ধ এরা হল বিশ্বামিত্রের অবাধ্য সন্তান অর্থাৎ পতিত ঋত্রিয়। এই ভাবে বিদেশি আগন্তুকদের সমাজে মিশিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের স্থান হয়েছিল মেচ্ছদের ওপরে; তারা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ ঋত্রিয় হতে পারত। সুতরাং ব্রাত্যস্তোমের মাধ্যমে বহুবিবাহের মাধ্যমে এবং স্বাধীন সচ্ছল বৃত্তির মাধ্যমে কোনও কোনও শূদ্র সমাজে উচ্চতর স্থান অধিকার করত।

প্রাগৈর্যরা কারুশিল্প এবং বহু কুটির শিল্পে অধিকতর দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত ছিলেন; সেই জন্য তাঁরা প্রাচীনকাল থেকেই এই সব কারুশিল্পের ধারা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। ধীরে ধীরে এই কায়িক শ্রমকে হীন দৃষ্টিতে দেখা শুরু হয়েছিল।

ভার্গব অংশে বলা হয়েছে যে, যদি কোনও ব্রাহ্মণ এই সব কারুশিল্প ও বাণিজ্যে যোগ দেয়। তবে তাকে শূদ্র বলে মনে করা হবে। মনুরও একই মত। (৬১) সমাজ বিদেশি আগন্তুকদের মধ্যে অভিজাতবর্গকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়েছিল এবং বিদেশিদের এই সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। অতএব, এই সমস্যার সমাধান করতে আইন-নির্ধারণ করা তাদের মদদও পরিবর্তিত করেছিলেন; তারা এই সব বিদেশিদের যথাযথ ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দিলেন এবং তাঁদের রাজা ও অভিজাত বলে। সম্মান করলেন। বশিষ্ঠের কামধেনুর উপাখ্যানে, কামধেনু তার প্রভুর বিপদে বিদেশি সৈন্যদল সৃষ্টি করেছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে ব্রাহ্মণের বিদেশিদের নিজেদের বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

ভার্গব অংশে বর্ণ সংমিশ্রণকে অসন্দিগ্ধ ভাষায় নিষিদ্ধি করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বর্ণসংকর বিনাশ ডেকে আনে এবং এটি কলিযুগের এক বিশিষ্ট, অব্যর্থ লক্ষণ। ভার্গব অংশে কলির পীড়াদায়ক অবস্থা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবে আলোচিত হয়েছে। কলিযুগে শূদ্র ধর্মীয় নির্দেশ দেবে। আর ব্রাহ্মণ হবে ভূত্য, (৬২) এবং শূদ্র ব্রাহ্মণকে সেবা করতে অস্বীকার করবে। (৬৩) কলিযুগের আর একটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য হল যে স্ত্রী স্বামীকে মান্য করবে না। (৬৪) মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন: একজন ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ এক বককে অভিশাপে দক্ষ করে; তারপর সে এক গৃহে যায় যেখানে ব্রাহ্মণ অতিথিকে সেবা করার আগে স্ত্রী তার স্বামীকে খাবার পরিবেশন করে। ব্রাহ্মণ যখন তাকে শাপ দিতে উদ্যত হয়, তখন সে বিদ্রুপ করে। বলে, 'আমি কি বক'; বিস্মিত ব্রাহ্মণকে তার পরে বলা হয় সমস্ত পতিব্রতা স্ত্রীদেরই দৈব অন্তর্দৃষ্টি থাকে। মার্কণ্ডেয় বলেন পতিব্রতা রমণী সর্বদাই তার স্বামীর ভোজন পাত্রের অবশিষ্ট খেয়ে থাকেন। (৬৫) দ্রৌপদী স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে সত্যভামাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আমি সত্যে আমার স্বামীদের সেবা করি, যেন তারা ক্রুদ্ধ সর্প। (৬৬) আমি কখনও আমার স্বামীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি

করি না, কখনও তাদের ছড়িয়ে যাই না, কখনও আমার শাশুড়ির বিরোধিতা
করি না। (৬৭) আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পত্নীদেরও সেবা
করি। (৬৮) এই হল সাধবী স্ত্রীর, 'সতী' স্ত্রীর কর্তব্য। প্রসঙ্গত, 'সতী' এবং
'পতিব্রতা' এই শব্দ দুটির অর্থগত দিক থেকে কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই।
সুতরাং বিবাহিত জীবনের কর্তব্য সম্পূর্ণ ভাবেই একপক্ষে।

নারীর পক্ষে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা অপরাধ, কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহ
কোনও অন্যায় নয়। (৭০) অমরা পঞ্চচূড়া নারদকে বলে—পুরুষ অপেক্ষা
নারীই বেশি যৌন আনন্দ উপভোগ করে। আমরা লক্ষ্য করি এ কথা বলানো
হয়েছে। একজন নারীর মুখ দিয়েই, যাতে বক্তব্যটির বিশ্বাসযোগ্যতা অধিক
হয়। শরশয্যায় মৃত্যুমুখে পতিত ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরকে দু'বার বলেন, নারীর
চেয়ে পাপিষ্ঠ কেউ নয়। (৭১) তিনি বলেন—অনুক, শমন, মৃত্যু, পাতাল,
বাড়বানল, ক্ষুরের ধার, বিষ, সর্প, অগ্নি—এই সব কিছু একত্রে একটি নারীর
সমান। (৭২) তরুণী রাজকন্যা মাধবীর উপাখ্যান আমাদের চোখ খুলে দেয়।
গুরুদক্ষিণা দিতে অপারগ গালিব রাজা যযাতির কাছে প্রার্থ হয়েছিলেন।
কিন্তু রাজার রাজকোষ তখন নিঃশেষিত অর্থের পরিবর্তে তিনি তাই নিজের
সুন্দরী কন্যা মাধবীকে গালিবের হাতে দিলেন যাতে গালিব একে একে তিন
রাজার কাছে মাধবীকে এক এক বছরের জন্য গচ্ছিত রেখে তার বিনিময়ে
প্রয়োজনীয় অর্থ নিতে পারেন। গালিব এতে কোনও অন্যায় দেখলেন না।
তিনি তা-ই করলেন। (৭৩) নারীর কাছে শিক্ষা হয়েছিল নিষিদ্ধ। (৭৪) নারীকে
বিবাহ করতেই হবে; পুরুষ নাও করতে পারে। তাই স্বর্গপ্রবেশের অধিকার
লাভের জন্য কুণিগর্গের কন্যা, বর্ষীয়সী তপস্বিনীকেও বিবাহ করে এক রাত্রের
জন্য হলেও স্বামীসঙ্গ করতে হয়। (৭৫) কৃষ্ণ নিজেই তাঁর উদ্ধারযোগ্য
পাপীদের তালিকায় নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেন। (৭৬)

মূল মহাকাব্যে স্বামীর চিতায় সহমরণ এক বিরল ঘটনা; বিধবাদের বাঁচার অধিকার সেখানে আছে। কিন্তু ভার্গব অংশে দুই একটি ব্যতিক্রম আছে; বসুদেবের মৃত্যুতে দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা স্বামীর চিতায় সহমৃত্যু হন; কৃষ্ণের মৃত্যুতে সত্যভামা, রুক্মিণী এবং তার অন্যান্য পত্নীরা সহমরণে যান। শান্তি পর্বের উপাখ্যানে ঘুঘুপাথির পত্নীও স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরে। (৭৭) কিন্তু গান্ধারী, কুন্তী, সত্যবতী এবং আরও অনেক বিধবা ও যুদ্ধবিধবারা কোনও সামাজিক কলঙ্ক ব্যতীতই বেঁচে থাকেন। হেরোডোটাস বলেছেন সিথিয়ানদের মধ্যে 'সতী' প্রথা প্রচলিত ছিল। এরাণ স্তম্ভ লিপিতে আমরা পাই যে রাজা গোপবর্ধনের পত্নী তার স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন।

ভার্গব অংশের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল নারীর সামাজিক অবনমন। ১৪০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক সিরিয়ান লেখক বর্দোসেনেস বিভিন্ন দেশের আইন সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেনবুক অব দ্য লজ অব দ্য কাস্ট্রিজ। সেখানে তিনি বলেছেন যে, কুশাণরা তাদের পত্নীদের সঙ্গে উপপত্নীর মতো ব্যবহার করত এবং তাদের কাছে যৌন আনুগত্য আশা করত না। তাদের স্ত্রীরা এমনকী ভূত্যের সঙ্গেও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করত। সম্ভাবনা আছে যে, এই ধরনের প্রবণতাকে বাধা দেওয়ার জন্যই আইন প্রণয়নকারীরা নারীর উপর বেশি করে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। কিন্তু ভার্গব অংশে বারংবার নারীকে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের অবদমিত রাখার জন্য বিধি তৈরি করা হয়েছে। তবুও কিন্তু পূর্বতন মূল মহাকাব্যে বেশ কিছু স্বাধীনচেতা নারীর কথা বলা হয়েছে। যাঁরা ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্রী। ভার্গব অংশে অবশ্য প্রয়োজন ছিল নারীর বশ্যতা স্বীকারের কথা প্রচার করা, সেই জন্যই এই বিষয়বস্তু নিয়ে অসংখ্য উপাখ্যান ও নীতিমূলক অংশ রচিত হয়েছে। সমসাময়িক একটি অর্বাচীন গুপ্তযুগের ভাস্কর্যে আমরা প্রথম বারের জন্য দেখতে পাই লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ এবং তৃতীয় শতাব্দী থেকে সমাজে এবং ধর্মবিশ্বাস ও আচার আচরণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। এই সবেৰ জন্য কোনও শাস্ত্র তখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। এই প্রাক-পৌরাণিক ভাগবি সংযোজনই সেই শাস্ত্র রচনা করেছিল। মূল জয়সংহিতা রচনা শুরু হয়েছিল মোটামুটি ভাবে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এবং শেষ হয়েছিল খুব সম্ভব দ্বিতীয়/প্রথম খ্রিস্টীয় শতকে, এই সময়েই সংযোজনের প্রথম পর্যায় রূপে চিরন্তন মূল্যবোধের উপাখ্যানগুলি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। অল্পদিন পরেই ভার্গব সংযোজন শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে শেষ হয়েছিল। এই সংযোজন ছিল সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন পুরোহিত গোষ্ঠীর রচিত, মূল মহাকাব্যের চেয়ে গঠনভঙ্গিতে অনেক নিম্নস্তরের অলঙ্কৃত, অতিরঞ্জিত, বাহুল্যযুক্ত এবং পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট।

বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক এবং উপনিষদীয় প্রভাব মুছে যাওয়ার পর অথবা যথেষ্ট কমে আসার পর মানুষ যাগযজ্ঞে বিশ্বাস হারিয়েছিল এবং উপনিষদের দুর্বোধ্য দর্শন সাধারণ মানুষের বোধক্ষমতার সীমানায় ছিল না। সুতরাং দেশজ মানুষেরা খুব সম্ভব সমাজের সীমারেখায় বসবাসকারী অ-বৈদিক আর্ষদের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল এবং ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবেই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। আগলুক গোষ্ঠীগুলির বিশ্বাস এবং রীতিনীতি, যার ফলে তৎকালীন সামাজিক ধ্যানধাণাতে ইতিপূর্বেই যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। যজ্ঞবিহীন যে জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি ও বিশ্বাস এর আগে অবদমিত ও বিতাড়িত হয়েছিল বর্তমানে তা পুনরুজ্জীবিত হল এবং মহাকাব্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের স্তরে তা আবার দৃষ্টিগোচর হল। রাজার উপর ঐশ্বরিকত্ব আরোপ, সম্প্রদায়নিষ্ঠ ধর্মের তন্ত্রনির্মাণ এবং পুরোহিত গোষ্ঠীর সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার ক্রমিক বৃদ্ধি এই সময়েই শুরু হয়। এর পর এই নূতন পূজাভিত্তিক ধর্মের নূতন নূতন

দিক আবিষ্কার হতে থাকে—মন্দির, বিগ্রহ, ব্রত, তীর্থযাত্রা এবং ব্রাহ্মণের প্রতি দান ও আনুষ্ঠানিক দক্ষিণার নিয়ত বৃদ্ধি সব কিছু ক্রমেই গুরুত্ব পেতে থাকে। কয়েক শতাব্দী ধরেই জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদের তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। ইতিপূর্বে উপনিষদীয় যুগেই এই সব ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল এবং এই নিগুঢ়-রহস্যময় জ্ঞানই ছিল ঋষিদের মূল তত্ত্ব। এখন এই সব তত্ত্বকে কাজে লাগানোর জন্য পুরোহিতগোষ্ঠী উপাখ্যানের পর উপাখ্যান রচনা করতে লাগলেন। স্বর্গ-নরক-প্রেতকথা-জ্যোতিষ-দুর্লক্ষণ চিহ্ন—এই সব কিছুই এই নব্য ধর্মীয় দার্শনিক আদর্শের মূলভিত্তি যে নিয়তিবাদ তার সহায়কের কাজ করতে লাগল। এর ফলে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি এক রহস্যময়তায় আবৃত হয়ে হয়ে পড়েছিল, যে আবরণ ভেদ করতে পারতেন কেবলমাত্র পুরোহিতরা।

কুশাগ, শক, মুরুদ, পছব, হুণ এবং পারদ-দের বারংবার আক্রমণের ফলে নিরাপত্তাবোধ ব্যাহত হয়েছিল, অন্তত সাময়িক ভাবেও সমাজে কিছুটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। এই গোলযোগের ফলে রক্ষণশীল মনোভাব জেগে উঠেছিল এবং এই সব নূতন মূল্যবোধের সৃষ্টিকর্তা পুরোহিত গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্র, শূদ্র, দাস এবং নারীরা। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশে অন্তর্বিবাহ দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। নারীর সতীত্ব এবং শূদ্রের আনুগত্য স্বীকার—উভয়কে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আইনরক্ষকেরা অত্যন্ত সর্ব্ব হয়ে পড়লেন। রক্ষণশীল মূল্যবোধ, বিশেষ করে বর্ণশ্রমের নিয়ম বর্ণধর্ম ছিল শূদ্র ও নারীর প্রতি অবদমনমূলক। যে কলিযুগের তাঁরা বর্ণনা দিয়েছেন সে বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে ছিল তাঁদেরই সমকালের সমাজের; এই সময় গ্রিস, রোম এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে জলপথের বাণিজ্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় বাণিজ্য সম্পর্কটি কোনও নূতন ধ্যানধারণার সৃষ্টিধর্মী অভিঘাত বা নূতন চিন্তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব হয়ে আসেনি। অতএব এক প্রকার সংকীর্ণ মনোভাব দেখা দিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনের

সম্বন্ধ ও শ্রেণিবিন্যাসকিছুটা স্থিতাবস্থায় এসেছিল। বর্ণসংকরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং নিশ্চিত ভাবেই এই সরলীকরণ ধীরে ধীরে অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠল। আর্য অভিজাত সমাজ ছিল ব্রাহ্মণ, ধনী ক্ষত্রিয় ও ধনী বৈশ্যদের নিয়ে গঠিত আর দরিদ্র ক্ষত্রিয়, দরিদ্র বৈশ্য, শূদ্র, স্লেচ্ছ এবং অন্ত্যজ অশুচিদের সমাহারে গঠিত হয়েছিল দাসবর্ণ। এই শ্রেণি ও বর্ণবিভাগে ক্লিষ্ট সমাজ শাসন করতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও নীতি নির্ধারকেরাই। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদের তত্ত্বের দ্বারা লালিত কুসংস্কারে মানুষকে অন্ধ করে রাখা হত, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিয়তিবাদ, শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক ক্রিয়া এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রতি বিশ্বাস। এই সব বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু মহাকাব্যের ভার্গব সংযোজন অংশেই এগুলির প্রথম সূচনা হয়। এই সব তত্ত্বের বিস্তারিত চর্চা দেখা যায় পুরাণসমূহ, স্মৃতি, ধর্মশাস্ত্র এবং নিবন্ধগুলিতে। মহাভারত-এ ভার্গব সংযোজনে যার প্রথম অঙ্কুরোদগম পরবর্তী কালে তারই পরিণতরূপ দেখা যায় হিন্দুত্বে। এবং সেখানেই এই সংযোজনের প্রকৃত গুরুত্ব।

নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব

কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকসনারি অনুসারে 'হিংসাত্মক উপদ্রব' হল কোনও ব্যক্তি বা সম্পত্তির ওপর আঘাত বা ক্ষতিসাধন। প্রাচীন ভারতে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার তো ছিলই না, বরং তারা নিজেরাই (অন্যের) সম্পত্তি গণ্য হত। তাই তাদের প্রসঙ্গে হিংসা বলতে তাঁদের ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতনই বোঝাত। অধুনাতন ইংরেজি ভাষায় person শব্দটি শুধু শরীর বোঝায় বটে, তবে আলোচ্য প্রসঙ্গে তা শরীর ছড়িয়ে মনকেও বোঝাবে।

নারীবাদী পরিস্থিতিতেও যদি ধরে নেওয়া যায় যে, উপদ্রবকারী অবশ্যই কোনও পুরুষ, কিন্তু আমরা জানি, অন্য কোনও নারীও প্রায়শ তেমন করতে পারে, সে কথায় পরে আসছি। আক্রমণকারী যেই হোক, আশ্রয়স্থল মহিলাটির দুর্দশা ঘটবেই এবং আরও সরাসরি ও শোচনীয় ভাবে সে পাশবিকতার শিকার হবেনাই।

বেদে এ কথা স্পষ্ট আছে যে, নারীর শরীর তার নিজস্ব নয় এবং এতটুকু ওজার-আপত্তি না করে পতির কাছে আত্মসমর্পণ করা তার বিধেয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, কোনও স্ত্রী যদি তার পতির শয্যায় আসতে অসম্মতি জানায়, (প্রথমে) মিষ্টি কথায় তাকে আদর ও অনুনয় করা যেতে পারে; তাতে কাজ না হলে গয়নাপত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে 'কিনে নেওয়া'ও যেতে পারে; আর তার পরও যদি রাজি না হয় তাহলে পতির উচিত লাঠৌষধি কিংবা চড় খাপ্পড় প্রয়োগ।(১) মৈত্রায়নী সংহিতা-য় অনেক বার বলা আছে, নারীশরীর নারীর নিজের নয়, তাই যৌন নিপীড়ন থেকে তার নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ নেই।(২) কোনও নারী পরপুরুষের শয্যাসঙ্গী হলে তার নির্দিষ্ট অঙ্গে কাঁকড়াবিছে ঢুকিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।(৩) তার ওই প্রেমিককে মারবার জন্য অভিচারমন্ত্র ও আচরক্রিয়া তো আছেই, যা নিঃসন্দেহে মানসিক নির্যাতন বৈকি।

নারীমত্রেই অশুভ প্রতীক গণ্য হতেন, যেমনটা ছিল কুকুর, শকুনির মতো অশুভ পাখি, বেজি। ইদুরের মতো প্রাণী ও শূদ্রের বেলায়। এদের মধ্যে যে কোনও একটির হত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল সমান।(৪) তৈত্তিরীয় সংহিতা স্পষ্ট ভাষায় লিখেছে, নারী কেবলমাত্র যৌনসম্বোগের বিষয়;(৫) গরু, জমি এবং নারীকে অতিমাত্রায় ব্যবহার করা ঠিক নয় অন্যথায় তারা হয় মরবে নয়তো রুগ্ন হয়ে পড়বে।(৬) অগ্নি পত্নীবৎ অনুরূপে একটা লাঠি দিয়ে

ঘিয়ের ওপর আঘাত করা হত। নির্মম স্পষ্টতায় এই প্রতীক ব্যাখ্যা করে জানানো হচ্ছে—স্ত্রীকেও এই ভাবে মারা দরকার, যাতে তার শরীর কিংবা সম্পত্তির ওপর তার কোনও অধিকার না বার্তায়। (৭)

মানসিক নির্যাতনও অবশ্যই ছিল এবং তা সেই বৈদিক যুগেও। প্রায় সব বেদগ্রন্থই দেখিয়েছে, নারী শুধু অধম জীব তাই নয়, অকল্যাণকরও বটে। সমাজে তার একমাত্র পরিচয় কর্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রী, গৃহিণী ও ছেলেদের মা হিসেবে। বারো বছর ধরে পুত্র প্রসব করতে না। পারলে সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা শাস্ত্রসম্মত, ঠিক যেমন মৃত্যুবৎসা হলে পনেরো বছর আর বন্ধ্যা হলে দশ বছর পর তাকে ত্যাগ করা যায়। (৮) এমনকী নববিবাহিত দম্পতি যখন তাদের নতুন ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তখন বর নববধুর সামনে প্রার্থনা করত—‘এস, আমরা সঙ্গত হই, যাতে আমরা (অনেক) পুত্র, পৌত্র, দাস, বস্ত্র, কাম্বল, ধাতুরাজি, সুশাসক, শিষ্যকুল, প্রচুর খাদ্য ও বহু স্ত্রী পেতে পারি। (৯) শিক্ষিত নারী পুরুষ বৈ তো নয়। (১০) যাবতীয় বড় ধরনের দানের অন্যতম উপকরণ ছিল নারী, মাদি ঘোড়ার সঙ্গে নারী ও শিশু (দেয়বস্তু) হিসেবে থাকা উচিত। (১১) কোনও অশুভ পাখি, শকুনি, বেজি, ইদুর, কুকুর ও শূদ্রের হত্যা ও নারীহত্যার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা যে অভিন্ন তাতেই নারীর সামাজিক মর্যাদা বোঝা যায়। (১২) পত্নীকে স্বামীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতে হত। (১৩) খ্রিস্টপূর্ব নবম-অষ্টম শতাব্দীতে লেখা একটি প্রাচীন গ্রন্থ জানাচ্ছে, সর্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠ মহিলাও সব দিক দিয়ে অপদার্থ কোনও পুরুষের অধম। (১৪) নারী ও শূদ্র (বলতে গেলে) অশুভ ও অসত্য-র মূর্তি। স্বামী ও স্বশুরবাড়ির লোকেদের দীনহীন ভাবে সেবা করবেন মেয়েরা, এটাই ধরে নেওয়া হত। একটি গ্রন্থে তার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে—মেয়েকে (বিয়ে) দেওয়া হয় (বরের) পরিবারে। (১৫)

বরুণপ্রঘাস অনুষ্ঠানে সমবেত জনসমাজের মধ্যেই যজমানের পত্নীকে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করতেন—কার সঙ্গে তোমার অবৈধ যৌন সম্পর্ক আছে?(১৬) কোনও পুরুষকে কিন্তু কোনও অনুষ্ঠানে কদাচ এ কথা জিজ্ঞাসা করা হত না। সামাজিক নির্বাসন ও মানসিক নির্যাতনের আর এক দৃষ্টান্ত হল, কঠোর বাক্য ব্যবহার করলে তৎক্ষণাৎ কোনও নারীকে পরিত্যাগ করা হত।(১৭)

এ সব থেকে ধরা যায় যে, হয় সমাজ বুঝে ছিল মেয়েদের মন বলে কিছু নেই, নয়তো বা তা ছিল পুরুষের উদ্ধত নিয়ন্ত্রণে; পুরুষ সচেতন ভাবে নারীবিদ্বেষী ও ধর্ষকাম।

জাতক-এর গল্পগুলোতে এমন একটি সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে যা মূলত মেয়েদের প্রতি নির্মম। এর বেশির ভাগ গল্পেই আছে শারীরিক নির্যাতনের দৃষ্টান্ত; কয়েকটিতে মানসিক নিপীড়নের ছবিও আছে। যেমন, একটি তরুণীকে প্রেমে পড়ার অপরাধে অগ্নিপরীক্ষায় বাধ্য করা হয়েছিল। সে যে একটা কৌশলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে তা একজন ব্রাহ্মণ দেখে ফেলে এবং তাকে ধাক্কা মেরে প্রেমিকের কাছ থেকে সরিয়ে আগুনে ফেলে দেয়।(৬২) এক বণিকের এক বদমেজাজী কন্যা ছিল। তার দাসেন্দ্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় তারা তাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। বুদ্ধ তাকে উদ্ধার করে তার সঙ্গে বাস করেছিলেন। একদিন চোরের দল তাকে তাদের সর্দারের বউ করবে বলে চুরি করে নিয়ে যায়। বুদ্ধ উপস্থিত হলে চোরদের সর্দার তাকে আঘাত করে। বুদ্ধ তাকে নারীহরণের অপরাধের কথা শোনান। সর্দার তখন মেয়েটিকে দুটুকরো করে কেটে ফেলে। (৬৩)

এক রাজা রানিকে খেতে দিতেন না। বুদ্ধ তাকে ভিক্ষা করতে বলেন, তিনিও সব কথা রাজাকে জানান। বুদ্ধ তখন তাকে সমস্ত ব্যাপারটা রাজসভায়

পুনরাবৃত্তি করতে বলেন। অতঃপর বুদ্ধ তাকে স্বামীকে ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। ততদিনে রাজা কিন্তু উচিত শিক্ষা পেয়েছেন।(২২৩)

কোনও এক জন্মে বুদ্ধ চোর হয়েছিলেন। শ্যামা তাঁর প্রেমে পড়েন। তাঁর আর একজন প্রেমিক বুদ্ধের জন্য নিজের জীবন দেয়। তিনি তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি বেঁচে যান। বুদ্ধের কাছে ভৃত্যদের মাধ্যমে তিনি বলে পাঠান—‘শ্যামা তোমার জন্য কাতর হয়ে প্রতীক্ষায় রত।’ কিন্তু বুদ্ধ আর আসেননি (৩১৮)

বিপন্ন অবস্থায় এক রাজদম্পতি ঘরে ফিরছিলেন, ব্যাধের দল তাঁদের একটা পোড়া গিরগিটি দিলে রাজা তাই খেয়ে ফেলেন। রাজার বিদূষক বুদ্ধ ভিক্ষাদানে নারীর কুণ্ঠার অভিযোগ করলে তিনি তার কারণ বুঝিয়ে বলেন। বুদ্ধ বলেন—তাকে ত্যাগ করুন; তখন রাজার অনুশোচনা জন্মায় (৩৩৩) এক ক্রীতদাসকন্যা দেখে ফেলে যে রাজপুত্র তার পিতাকে হত্যা করতে উদ্যত। (রাজপুত্র) তখন তাকে দুটুকরো করে কেটে পুকুরের জলে ফেলে দেয়। রাজা (স্বয়ং) তা খুঁজে পান। তবে রাজপুত্র অনুশোচনা করায় তাকে ক্ষমা করা হয়।(৩৭৩)

নাগরাজ তাঁর রানিকে এক জলচর সাপের সঙ্গে খেলা করতে দেখে বাঁশের লাঠি দিয়ে তাঁকে পেটান। শারীরিক নিপীড়নের আর একটা দৃষ্টান্ত—রানি একটি মন্ত্র লিখতে চাইছিলেন, যার মূল্য একশো ঘা বেত (সহ্য করা)। তিন নম্বর ঘা পড়তেই রানি চেঁচিয়ে ওঠেন। আর তখনই তাঁকে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।(৩৮৬) বিখ্যাত বৈশান্তির গল্পে আছে কী ভাবে নির্বাসিত রাজা স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে গিয়ে ইন্দ্রের ছদ্মবেশে মারধর করেছিলেন। মানসিক নির্যাতনের একটা আশ্চর্য গল্প দেখি সুজাত জাতকে। সেখানে এক রাজা ফলের পসারিণী সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। একদিন রাজা যখন

সোনার পাত্রে ফল খাচ্ছেন, তখন সরল মনে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে রাজা কী ফল খাচ্ছেন। তাতেই চটে গিয়ে রাজা তাকে কাটুবাক্য বলে উপহাস করেন এবং তাড়িয়ে দেন। এমন অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট—মেয়েরা তখন সম্পূর্ণভাবে পুরুষের দায় বেঁচে থাকত। তাকে মারধর করা, হত্যা করা, অপমান করা এবং কোনও তোয়াক্কা না করে তাড়িয়ে দেওয়া যেত। রামায়ণ-এ অহল্যার সঙ্গে গৌতমের দুর্ব্যবহার আমরা দেখেছি। যৌন অসংযমের জন্য কদাচি কোনও পুরুষকে শাস্তি পেতে হয়নি। বালী মৃত ভেবে সুগ্রীব বালীর পত্নী তারাকে গ্রহণ করেছিলেন। বালী সশরীরে ফিরে এলে তার সঙ্গেই তারা ঘর করতে যান এবং তার মৃত্যুর পর আবার সুগ্রীবের ঘরগী হন। এ সব ক্ষেত্রে বাস্তব হিংসা ছিল না বটে, তবে সমাজ অনুমোদিত মানসিক নিষ্ঠুরতা তো ছিলই, যাতে করে পুরুষের হাতে ফেলার সামগ্রী হিসেবে কোনও নারীকে এ-হাত থেকে ও-হাতে ফিরতে হয়েছে।

সীতাকে তো অন্যায় ভাবে সন্দেহ করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে কঠোর বাক্য বলে অপমান পর্যন্ত করা হয়েছে। প্রতিবাদ না করে রামের সে ক্ষেত্রে নীরবতা পালন সীতাকে অগ্নিদাহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অযোধ্যায়। তাকে নির্দয় ভাবে প্রবঞ্চিত করে অরণ্যে নির্বাসন দেওয়া হয়। অথচ তিনি গর্ভিনী হিসেবে একবার অরণ্যভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। (রাজসভায় সীতার) যমজ পুত্র (লব ও কুশ)। বাল্মীকির শেখানো গান গাইবার পর সীতাকে রাজসভায় এসে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সীতা যে নির্দোষ তা বোঝাতে বাল্মীকি তাঁর হাজার হাজার বছরের তপস্যাবলে সঞ্চিত পুণ্যফল ত্যাগ করার বাজি রাখার পরও এমন ঘটনা ঘটে। এ বার অবশ্য সীতা কার্যকর ভাবে প্রতিবাদ করে অন্তর্ধন করেন। একজন সম্পূর্ণ সতীসাধবী ও আন্তরিক ভাবে অনুগত পত্নীর সঙ্গে রামের এই ব্যবহার মানসিক নিপীড়নের উর্ধ্বসীমা স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই।

নারী সমাজের ওপরে পুরুষের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নির্দয় আচরণ মহাভারতে এত বেশি সংখ্যায় আছে যে বলে শেষ করা যাবে না। আমি তার অল্প কয়েকটি এখানে উল্লেখ করতে চাই। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় দ্রৌপদীর প্রকাশ লাঞ্ছনা তার মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক ঘটনা এবং মূল গল্পের নির্ধারক বৃত্তান্ত। এ ঘটনায় যে শারীরিক ও মানসিক নির্দয়তা প্রকাশ পেয়েছে, তা দেখিয়ে দিচ্ছে মেয়েরা কতটা দীনহীন অসহায় যার জন্য তারা নির্ণুরতার শিকার হলেও সমাজ সে অত্যাচার ক্ষমা করে দিচ্ছে, এমনকী অনুমোদন করছে। সারাটা মহাকাব্য জুড়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েদের উপর বলাৎকারের নানা বৃত্তান্ত ছড়ানো। ধর্ষণকারীকে অপরাধী হিসেবে ঘৃণা করা দূরে থাক, বিজয়ী বীরের মর্যাদা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের উপর উপদ্রব করার জন্য কেউ গর্ভবোধ করলেও তাকে সংযত করার দৃষ্টান্ত বিরল। পুরাণ গ্রন্থগুলো তো ধর্ষণ, অত্যাচার, মানসিক নিপীড়নের গল্পে পরিপূর্ণ।

এই যে নিজের মনে শুধু অর্জুনকে কামনা করলেও পাঁচ পাঁচটি ভাইকে বিয়ে করতে বাধ্য হন দ্রৌপদী, তাতে খুব সূক্ষ্ম ভাবে তাঁর মনের ওপর নির্ণুর অত্যাচার ঘটেছিল বৈকি। স্ত্রীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যযাতি কৌশলে দেবযানীতে উপগত হয়েছিলেন। আচার্য গালিবকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে তিনি তাঁর নিজের তরুণী কন্যাকে দান করেন। প্রতি বছর। একজন হিসেবে তিনজন রাজার কাছে ওই রাজকন্যাকে ভাড়া দেওয়া হয়, যতদিন না। তাদের জন্য এক একটি পুত্রসন্তান তিনি প্রসব করেন। তাঁর ইচ্ছা, সম্মতি, পছন্দ সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত থেকেছে। এ গল্পটির একটি উপযুক্ত চূড়ান্ত পর্যায় আছে। রাজকন্যা কঠোর কৃষ্ণসাধন ও তপস্যাবলে যে পুণ্য অর্জন করেছিলেন, তার বাবা তার দখল নেন, কেননা তার নিজের পুণ্য স্বর্গলাভের থেকে কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল।

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের আরও দৃষ্টান্ত: কুনিগর্গের তরুণী কন্যা সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তাঁর মৃত্যু আসন্ন এবং বহু প্রচেষ্টায় অর্জিত স্বর্গসুখ লাভও প্রায় নিশ্চিত, নারদ তখন তাকে জানালেন যে কোনও নারী কদাচ স্বর্গে যেতে পারেন না! চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নী তারাকে অপহরণ করেছিলেন। এই চন্দ্রের ঔরসে তারার গর্ভে বুধের জন্ম। পরে বৃহস্পতি ওই স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেন। আরও একবার দেখা গেল। যার মন বলে কিছু নেই নারী এমন এক জড়বস্তু ও হাতফেরতযোগ্য খেলার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

এই গল্পে এবং আরও নানা গল্পে যে সূক্ষ্ম ভাবে নারী নির্যাতন সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ নারীকে ভাগ্যবস্তু হিসেবে মনে করার মধ্যে নিহিত। সুতরাং নির্বিচারে তার ওপর অত্যাচার করা যায়! সমাজ নারীকে এমন এক ভাবে দেখতে চেয়েছে যাতে অন্য ভাবে তার সামাজিক প্রয়োজন প্রমাণ করতে না পারায় পিতা, স্বামী বা পুত্র কোনও এক পুরুষের উপরেই ওঁকে নিতান্ত দীন ভাবে নির্ভর করে থাকতে হয়। এমনটা হওয়ার কারণ হল, দুঃখের সঙ্গে তাকে সচেতন থাকতে হত যে তার ভূমিকা পরনির্ভর অস্তিত্ব পদানত এবং তা কমাবস্তু হিসেবে নিজের স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের অনুগ্রহে। তাঁরাও জানতেন স্বামীর সম্পত্তির আইনসম্পত্ত উত্তরাধিকারী হিসেবে পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে মেয়েটির পরনির্ভরতার কথা।

এই ভূমিকা সম্বন্ধে নারী যে শুধু সচেতনই ছিল তাই নয়, তা অন্তরেও বুঝেছিল। ফলে তার উপর দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন চিরস্থায়ী করা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত আরিস্তোফানিস, ডোরেন্স ও প্লাউতুস-এ বর্ণিত নারীদের অবস্থার কথা আমাদের ভাবা উচিত যাতে হেলেনীয় গ্রিসে ও রোম সাম্রাজ্যে মেয়েদের অগ্রগামী পুন্যমূল্যায়ন ও আইন সংশোধন দেখে পার্থক্যটা ধরা যায়।

এ রকম স্বনির্ভর অবস্থা ভারতীয় সমাজেও লালিত হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু এখানে মেয়েদের একত্র হয়ে নিজেদের দূরবস্থা আলোচনা করার কোনও মঞ্চ ছিল না। সুতরাং প্রতিটি ঘটনাই বিচ্ছিন্ন ভাবে একক ঘটনা বলে গণ্য হত। বেশ্যাদের বাদ দিলে মেয়েদের ঘটনা নিয়ে কোনও ব্যবস্থারীতিও ছিল না। সুতরাং পুরুষের অত্যাচারজনিত দুঃখ-কষ্ট মাঝে মধ্যেই সর্ব্ব এ ঘট ৩ এবং ৩। নিন্দনীয়ও ছিল না, শাস্তিযোগ্যও ছিল না। হাজার বছরের পুরোনো এই কদাচারের অবসান ঘটতে পারে কেবলমাত্র মেয়েদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায়, আর যদি তাঁর পিছনে থাকে দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট নীতি ও স্বচ্ছ ভাবে নির্ধারিত আইন।

কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদীর মতো নারীব্যক্তিস্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেছিলেন সত্য, তবে সমাজ মোটামুটি ভাবে সে প্রতিবাদ উপেক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কোনও শাস্তি ভয় ছাড়াই চলে এসেছে।

মেয়েদের নাগরিকত্বের কোনও আইন ছিল না, আইনের চোখে তাদের মর্যাদা ছিল। নিচের দিকে। উচ্চ তিন বর্ণের পুরুষরা শূদ্র ও নারীদের ওপর ধর্ষণ, অপহরণ, নিপীড়ন, ইত্যাদি অত্যাচার চালিয়ে যেত, অথচ তার জন্য কোনও শাস্তি পেতে হত না। শুধু বারাগ্গনার কিছুটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ছিল এবং বিনা শাস্তিতে তার উপর অত্যাচার কিংবা তার শারীরিক বিকৃতি ঘটানো সম্ভব হত না। মর্যাদাপুরুষোত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানব বলে কথিত রামচন্দ্রের নির্দেশে তাঁরই অনুগত ভাইয়ের হাতে শূর্ণগথার শারীরিক বিকৃতি সংঘটিত হওয়ার কথা আমরা জানি। রীতিনীতি এমনই ছিল: সামাজিক ভাবে দুর্বল মানুষ, বিশেষত স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের ওপর অত্যাচার অনুমোদিত আচরণবিধির মধ্যেই পড়ত এবং তা সম্ভব ছিল এই জন্যই যে পুরুষ ও নারী উভয়পক্ষই তা মেনে নিয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর লেখা তৈত্তিরীয় সংহিতা জানাচ্ছে, নারীর শরীর তার নিজস্ব অধিকারে নয়; সুতরাং চিরটা কাল ধরে নারীদেহ স্বচ্ছন্দে ভোগ করা চলে, ইচ্ছেমতো তার ওপর অত্যাচার করা চলে এবং পুরুষ খুশিমতো তাকে ত্যাগ করতেও পারে। খুব প্রাচীনকাল থেকেই মেয়েদের মন ও অনুভূতির কথা সমাজ গ্রাহ্য করেনি। সুতরাং পুরুষের ধর্ষকামিতা যতক্ষণ না কিছুটা পরিতৃপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ মানসিক নিপীড়ন মেনে নেওয়া হয়েছে। যেটা আরও খারাপ এ ক্ষেত্রে পুরুষদের সচেতনতার ব্যাপারে সার্বিক ঔদাসীন্য কাজ করেছে। এই জন্যই নববিবাহিত স্ত্রীর সামনে বহু পত্নীর প্রার্থনা সম্ভব। এই জন্যই সম্পূর্ণ নির্দোষ স্ত্রী হলেও রামের হাতে সীতার অপমান ও নিষ্ঠুর আচরণের পুনরাবৃত্তি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে সামাজিক সত্তা হিসেবে মেয়েদের কোনও রাজনৈতিক আইনগত মর্যাদা ছিল না। নারীব ওপর শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের ব্যাপারটা সমাজের উচ্চকোটির লোকেদের পক্ষে তাই সহজতর হয়েছিল। নারী ও স্ত্রী হিসেবে তার কর্তব্যকর্ম আগেই নির্ধারিত ছিল; সে কাজে ব্যর্থতা বা ত্রুটি হলে তৎক্ষণাৎ নির্যাতন ছিল অবধাবিত। এমনকী কর্তব্যহানি হয়নি এমন ক্ষেত্রেও বলাৎকার, যৌন নির্যাতন এবং দুর্ব্যবহার ঘটতে পারত। উদারচেতা ব্যক্তিবিশেষের নৈমিত্তিক মহানুভবতা ছাড়া প্রতিকারের প্রার্থনা করার কোনও জায়গা ছিল না। তার প্রার্থনায় কান না দেওয়াও তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যেমনটা দ্রৌপদীর আবেদনে কুরুবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে দেখেছি।

মেয়েদের ওপর বলাৎকার ও নিপীড়নের ঘটনা প্রায়শ তাদের সমাজের পুরুষদের কোনও কাজের প্রতিশোধ হিসেবে সংঘটিত হত। বলতে গেলে, পুরুষদের কোনও বাস্তব বা কাল্পনিক অপরাধের মূল্য দিতে হত সম্পূর্ণ নিরাপরাধ মেয়েদের এবং অন্যান্য দুর্বলদের। এটাকে বাধা দেওয়াও

সমাজনীতির অংশবিশেষের বিরুদ্ধাচারণ করা বোঝাত। মেয়েদের পরিকল্পিত ভাবে অসহায় ও পরাশ্রিত হিসেবে ধরে নিয়ে পালন ও রক্ষা করা হত। আর ওরাও এই মূল্যবোধ অন্তরে গ্রহণ করে আত্মসমর্পণ করত। একমাএ কার্যকর প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই অত্যাচারের এই কাহিনিগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব ছিল। আজকের দিনেও এই প্রতিবাদ সমান জরুরি।

নারী ও নীরবতা

এক

এই আলোচনাপত্রটি শুরু হচ্ছে আমাদের প্রথম সাহিত্য ঋগ্বেদ থেকে, যার আনুমানিক রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে। ঋগ্বেদ-এ বেশ কয়েকজন নারী কবির নাম জানা যায়—ঘোষা, শাস্বতী, রোমশা, লোপামুদ্রা, অপালা, বিশ্ববারা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঋগ্বেদে অষ্ট্রুণ ঋষির কন্যা বাক (অর্থাৎ বানী) যাবতীয় প্রধান দেবতাদের যথার্থ মূর্ত রূপ হিসেবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। সংক্ষেপে বললে বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিভূমিতে যে সোহিম (অর্থাৎ, আমিই সেই) তত্ত্ব আছে, তিনি তাই উচ্চারণ করেন। (১) তবু সামাজিক মর্যাদায় তাঁর স্থান অধস্তন; সামাজিক ভাবে যাঁরা উর্ধ্বতন, বিশেষত পুরুষ, তাঁদের সামনে তাঁর মুখ খোলা অনুচিত। তাঁর অবদান অনাদৃত থেকে গেছে। তাহলে, এক সময় কিছু মহিলা যথেষ্ট সরব ছিলেন এবং পুরুষরা কোনও কুষ্ঠা না করেই নারী কবি হিসেবে তাঁদের নাম রক্ষা করেছেন। তবু সভা-সমিতিতে উপস্থিত হওয়ার দস্তুর

মেয়েদের ছিল না(২), সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কোনও আলোচনায় যোগদান করার ক্ষেত্রেও একই কথা।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগে অবশ্য কোনও সৃজনশীল কাজে মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন যজ্ঞমানের পত্নী হিসেবে তাকে সাহায্য করতে এবং সম্ভবত কিছু তুচ্ছ কাজে অংশ নিতে। এরই মধ্যে উপনয়নের অধিকার তিনি হারিয়েছেন এবং তার ফলে বৈদিক শাস্ত্র জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। সুতরাং যজ্ঞে নারীর ভূমিকা নিতান্ত নীরব। যদিও কোনও কোনও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পত্নীকে যজ্ঞের পশ্চাৎ (অবশ্যই পতি এই সঙ্গে পূর্বার্ধ বলে চিহ্নিত) বলা হয়। তাঁকে অর্ধেক বলার কারণ হল এই যে যতদিন পত্নী না থাকে সম্মানলাভও ঘটে না। (৩) সুতরাং পত্নীর আসল উপযোগ সম্মান প্রসব করায়। সোমযাগের অগ্নিপত্নীবন্ত অনুষ্ঠানে একটা লাঠি দিয়ে ঘি-তে আঘাত করা হত। লাঠিটি যেন বজ্র আর এই ভাবে দেবতারা তাঁদের পত্নীদের দুর্বল করে দিতেন যাতে আপন শরীরের কিংবা উত্তরাধিকারের উপর পত্নীদের কোনও অধিকার না থাকে। (৪) সুতরাং মারধর করলেও পত্নী নিস্ত্রিয়, নীরব, কেননা এহেন মারধর যজ্ঞ-অনুমোদিত। সেই পতি আরও নিচু গলায় মন্ত্র আবৃত্তি করবে যাতে তার কোনও ক্রমে উৎসাহে উজ্জীবিত না হতে পারে। কিন্তু যজ্ঞে, যেমন বরুণপ্রঘাস অনুষ্ঠানে পত্নী কোনও কথা বলবেন না। যজ্ঞ শুরু করার সময় পুরোহিত প্রকাশ্য সমাবেশে যজ্ঞমানপত্নীকে শুধাবেনকারও সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্ক তিনি করেছেন। কিনা। তাঁকে এ কথার জবাব দিতেই হবে, না হলে দুর্দৈব নেমে আসবে। যিনি স্বীকার করলেন, তার পাপের মাত্রা কমে যাবে। (৫) তাঁর স্বামীকে কিন্তু কদাচ এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় না, আসলে কোনও পুরুষকে কদাচ এমন অবমাননাকর প্রশ্ন করা যায় না। একটি ব্রাহ্মণ-সন্দর্ভে বলা আছে—নারীকে আলাদা করে রাখতে হবে, না হলে

তার শক্তিক্ষয় ঘটবে।(৬) জিজ্ঞাসা করা চলে—বিচ্ছিন্ন করে রাখলেই শুধু রক্ষা পায়, কি এমন সেই শক্তিটি?

উপনিষদ-এ মেয়েরা কদাচিৎ কথা বলেছেন, তার স্বামী দুই স্ত্রীর মধ্যে যা বাঁটোয়ারা করে দিতে চাইছিলেন, মৈত্রয়ী সেই ঐহিক সম্পদের বিশেষ পরোয়া করেননি। স্বামী তাঁকে তখন আধ্যাত্ম-উপদেশ দেন, কিন্তু সারাঙ্কণ নীরব নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হয়েই ছিলেন মৈত্রয়ী।

দুই

যাজ্ঞবল্ক্য নামে পরিচিত এই একই স্বামী অন্যত্র বলছেন কীভাবে স্বামীর শয়্যায় আসতে নারাজ স্ত্রীকে রাজি করানোর জন্য মারধর পর্যন্ত করতে হবে।(৮) এও আর এক অপমান ও আঘাতের নীরব পাত্র হওয়া। আধ্যাত্মিক বিতর্কে পুরোপুরি কোনঠাসা না করা পর্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন গার্গী। যাজ্ঞবল্ক্য তখন বলে বসলেন, 'আর কথা বাড়িও না, গার্গী, না হলে তোমার মাথা খসে পড়বে।' (৯)। এখানেও নারীকে নীরব হতে বলা হল। সুলভা নামে এক বর্ষীয়সী নারী এসেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে আধ্যাত্ম আলোচনা করতে। তার চরিত্র, যৌন মতলব ও উদ্দেশ্য নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য এমন অপমানকর ইঙ্গিত করেন যে ওই মহিলা স্থানত্যাগ করেন। একজন নারীবিদ্বেষীর হাতে অন্যায় কৌশলে এই ভাবে সুলভাকে নীরব হতে হয়েছিল।(১০)

সুতরাং সমাজ নারীদের কাছে এটাই আশা করেছিল যে, তারা উচ্চ চিন্তাভাবনার বিষয়গুলো পুরুষদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সাংসারিক কাজকর্ম পালন ছাড়া অন্যত্র নীরব থাকবেন। এক মহিলার গল্প আছে যেখানে, জনৈক গন্ধর্ব তার ওপর ভর করায় তিনি খুব কথা বলতেন।(১১) তিনি খুব বেশি

কথা বলতেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁর মুখ দিয়ে পুরুষ গন্ধর্বটিই কথা বলত। আর এক মহিলার উল্লেখ পাই, যিনি ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর অতিস্বল্প খাদ্যভাগ থেকে স্বামীর জন্য খাবার বাঁচাতেন এবং খুব কম কথা বলে স্বামীকে তা দিতেন। যখনই দরকার, তখনই নারীকে পুরুষের সেবা করতে হবে, কিন্তু কথা বলা চলবে না; সেবা নীরবে হওয়া চাই।

মহাকাব্যের যুগের আগে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ রচিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে প্রত্যয়যোগে শব্দ নিম্পাদনের এমন কিছু সূত্র যাতে নারী শিক্ষিকার অর্থ অনুধাবন করা যায়। যেমন, নিজে শিক্ষিক অর্থে আচার্য, নিজে উপাধ্যায় অর্থে উপাধ্যায়ী; উপাধ্যায়ের পত্নী উপাধ্যায়ানী, আচার্যের পত্নী আচার্যনীতি। বিস্ময় জাগে, নারীদের যদি উপনয়ন সংস্কার সহ বিদ্যারম্ভ না হত, তাহলে তাঁরা শাস্ত্র শিখতেন। কী ভাবে, যাতে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে অন্যদের বিদ্যাদান করতেন? কোনও নারী শিক্ষাদান করছেন, এমন কোনও লিখিত প্রমাণ। অবশ্য নেই। সম্মানীয় ব্যতিক্রম নিশ্চয় ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবেই আমরা যেন গণ্য করি। দেখতে হবে, সাধারণ ভাবে নারী মৌন পালন করতেন, কেননা তাদের মৌনভাবই সমাজ পছন্দ করত।

রামায়ণ, মহাভারত-এর মূল অংশে অবশ্য কিছু নারীচরিত্র আছে যাঁরা সরব থেকেছেন। অরণ্যবাসে রামের সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুমতি পেতে সীতা তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করেছিলেন। (১২) সাবিত্রী প্রকাশ্য রাজসভায় পিতার সঙ্গে বিতর্ক করেছিলেন—নিজের পছন্দ মতো স্বামী নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। শান্বকে অশ্বা ভালবাসতেন এবং তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভীষ্মের সঙ্গে আশ্বা তর্ক করতেন। (১৩) তপস্যারত মুনি ঋষিদের প্রলোভিত। করার সময় অম্পরাদেরও খুবই বাকপটু হতে দেখা যায়, কিন্তু তারা তো আসলে পার্থিব বারাদেশদের প্রতিক্রম। নীতি প্রসঙ্গে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তর্ক করেছেন। সুতরাং মহাকাব্যের মূলভাগে এমন এক যুগের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান যখন পর্যন্ত

নারীর প্রকাশ্যে ব্যক্তি হিসেবে কথা বলার অনুমোদন ছিল। কিন্তু মহাকাব্যের পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতেই দেখছি নারীর সামাজিক অধিকারগুলি নির্মম ভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে এবং এই সব অধিকারের মধ্যে আছে কথা বলার মুখ্য অধিকার। (১৪) মহাকাব্যের কোনও কোনও নারীচরিত্র যাঁরা আগের পর্যায়ে যথেষ্ট সরব ছিলেন, এই পর্যায়ে তাঁরা পর্যন্ত নীরবে দীনহীন ভাবে পুরুষের অধীন হয়ে পড়েছেন।

যেমন, বনপর্বে সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি কী ভাবে তার পাঁচজন স্বামীকে খুশি রাখেন। দ্রৌপদী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উত্তরে জানান— তিনি কদাচ কোনও বিষয়ে পাঁচজনের কারও কথার বিরুদ্ধাচরণ করেন না। (১৫) ইনি সেই একই দ্রৌপদী যিনি তাঁর স্বামীদের আগে এক সময় কাপুরুষ', 'ক্ষত্রিয় নামের অযোগ্য' বলেছেন, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যিনি ধর্মবিষয়ে বিতর্ক করেছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যিনি কৃষ্ণকে নিষ্ক্রিয়তার জন্য নিন্দা করেছেন। কিন্তু এই দ্রৌপদী যিনি সত্যভামার কথার উত্তর দিচ্ছেন, তিনি নারীর নীরবতার সমর্থক-প্রবক্তা, মহাভারত-এর প্রক্ষেপকারী ভার্গব কবিদের এক দুর্বল সৃষ্টিমাত্র। এই জন্য একটি ব্রাহ্মণ সন্দর্ভে আমরা বলতে দেখি, আদর্শনারী যিনি তার শাশুড়ি-ঠাকুরগণকে কোনও গৃহকর্মে হাত দিতে হয় না, এবং যিনি কখনও কথার উত্তর করেন না।' (১৬) এই একই মহাকাব্য অন্যত্র জোরের সঙ্গে বলেছে, শ্রেষ্ঠ নারীস্ব একজন সবচেয়ে নিকৃষ্ট পুরুষের চাইতেও খারাপ! আগের যুগে, আরণ্যক সাহিত্যে লেখা হয়েছিল, একজন শিক্ষিত নারী বস্তুত পুরুষ এবং উপার্জনশীল নারীও পুরুষ তুল্য। (১৭) মহাভারত কিন্তু সেই নারীর প্রশংসা করেছে, যিনি তাঁর শাশুড়ি ঠাকুরগণের সেবা করেন এবং তাঁর কথার ওপর কথা বলেন না। (১৮) সংঘে নারীদের যোগদানে বুদ্ধদেবের প্রতিবন্ধকতার কথা আমাদের নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে, যদিও প্রএ তিনি তা মেনে নেন। খেরী গাথাগুলি কবিদের কারও কারও সামাজিক ব্যর্থতার কথা বলে। তবে এমনকী বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যেও

নারীসমাজ ছিল। নীরব ও পরাধীন, চাইকি পুরুষের পদানত। সংঘারামের ভিক্ষুদের জন্য নারীদের গৃহকর্মকরতে হত। এমনকী ভিক্ষুণীদেরও পর্যন্ত তাই করণীয় ছিল মহাভারত-এ রাজকন্যা মাধবীর গল্পের কথা তো এ বইয়ের অন্যত্র উল্লেখ করেছি, কী ভাবে আছে, তার বাবা গালবের হাতে তাকে ধার দিয়েছিলেন, যাতে তিনজন রাজার হাতে পর্যায়ক্রমে তাঁকে পুত্র উৎপাদনে নিযুক্ত হতে হয়। (১৯) মেয়েটি নীরব অত্যাচারের শিকার হয়ে রইলেন।

বারললনাদের বাদ দিলে, মেয়েদের কথা খুব কমই কনে তোলা হয়েছে। তাই বারাগনারা সরকারি খরচে শিক্ষালাভ করতেন এবং সমাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী বলতে শুধু এরাই ছিলেন। পরবর্তী সাহিত্যে মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেখা যায় এবং তারপর আর তাদের প্রসঙ্গ শোনা যায় না। এমনকী রাজরানীদেরও পরবর্তী সাহিত্যে এমন ভাবে পাওয়া যাচ্ছে যে, তারা প্রায় কিছুই বলেন না, কিন্তু স্বামীদের বাক্যে 'হ্যাঁ' বলেন। কেউ কেউ কঁদেন। আর ভাগ্যকে দোষ দেন।

নাট্যসাহিত্যেও দেখি শ্রেষ্ঠ নায়িকারা খুবই কম কথা বলছেন এবং তাঁরা যে চূপচাপ থাকেন এটা তাদের অন্যতম গুণ। এটা হল গিয়ে লজ্জাশীলতা, যা নারীচরিত্রের মৌলিক সম্পদ। এ সাহিত্যে তর্কবিতর্ক দুর্লভ এবং মেয়েরা অংশ নিচ্ছেন এমন কথোপকথন, সামান্য কিছু ব্যতিক্রমী নাটক বাদ দিলে, আরও দুর্লভ।

এমনটা হল কেন? কেন আমরা কোনও আরিস্তোফানিসকে পেলাম না, যিনি মেয়েদের অসহযোগের ছবি আঁকতে পারেন, তা সে ঠাট্টা-মস্কারার ছলে হলেও? কিংবা, অ্যাটিক কমেডির মতো কিছু, যেখানে মেয়েরা উদ্যোগ নেন, কথা বলেন, তর্ক-বিতর্ক করেন, ভয় দেখান এবং তুলনামূলক ভাবে সরব হন। গ্রিক মহাকাব্যেরও নাটকে মুখ্য নারীচরিত্রগুলি, তা সে দেবী বা মানুষী

যাই হোন, স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের মনের কথা বলেছেন। ভারতীয় নারীকে কেন এমন আড়ালে রাখা হল, কথা বলার নৃত্যনতম সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হল না? তাঁকে এমন জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হল, যাঁর কথা শোনা যায় না, কেননা বাক (অর্থাৎ বাণী) থাকেন দেহের গভীর অন্তরে। (২০) তার সামাজিক অবস্থান তাকে দাসস্ব ও নীরবতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

এর একটা কারণ তাদের সামাজিক অবনত মর্যাদা যা সমাজ শিক্ষালাভ ও তার ফলে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন থেকে মেয়েদের বঞ্চিত রেখে সৃষ্টি করেছে। নারী-পুরুষ উভয়পক্ষ নারীর নীরবতা মেনেই নিয়েছিল। শিক্ষার অভাব তাদের জানার জগৎকার্যকর ভাবে সঙ্কুচিত করেছে এবং আলাপ-আলোচনার সজীব বিষয় কেড়ে নিয়েছে। আর একটা কারণ হল পুরুষের ওপর মেয়েদের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক নির্ভরতা, যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তাদের ছিল না। আমরা মনকে বোঝাই, মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বেশ জোরে জোরে এবং যেটা মেয়েদের দোষ বলা হয়, বাচালের ভঙ্গিতে স্বকথা বলতেন। কিন্তু বাইরের সমাজ দেখতে চাইত, মেয়েরা সম্পূর্ণ বশীভূত এবং নীরব থাকবেন। এই জন্য, যেটা আদর্শ ভাবা হয়েছে সেই ভাবে নীরব নারীর ছবি ওঁরা এঁকেছেন।

সমাজে নারীর প্রতি উপেক্ষা ছিল অত্যন্ত তীব্র। এতটাই যে নারী আপন অন্তরে এই অন্যায় সামাজিক বিধান মেনে সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে তাদের যেন কেউ না শুনে ফেলে। যেমন, খনা আপাতদৃষ্টিতে সমাধানের অতীত একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য এতটাই খুশি হলেন যে, তিনি তাকে রাজসভায় দশম রত্ন গণ্য করতে চাইলেন। কিন্তু খনার স্বামী বরাহমিহির তাঁর জিভ কেটে দিয়ে সত্যি সত্যি তাঁকে বাক্যহীনা করে দিলেন, যাতে তিনি তার গুণের জন্য আর প্রশংসা না পান। এই ঘটনাটি সর্বকালের জন্য একটি প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে। মেয়েরা দর্শনীয় হলেও

তাদের নির্বক হওয়া চাই। মেয়েরা নিজেরাই সমাজের এই ইচ্ছা অন্তরে
বুঝেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন এবং মানতেন যে মর্যাদায় তারা নিচু;
তাঁরা পুরুষের সামনে কথা বলা অস্বাভাবিক ও অমর্যাদাকর ভাবতেন।
অবশ্য সাহিত্যের বৃহৎ শ সম্পন্ন সমাজের নারীর চিত্রই এঁকেছে। অর্থনৈতিক
দিক দিয়ে যাঁরা নিম্ন পর্যায়ের, সেখানে মেয়েদের নিশ্চয় আর একটু সরব
থাকার কথা। উচ্চবর্গের বিধিনিষেধ সেখানে চালু না থাকাই স্বাভাবিক।

এ থেকে একটা মৌলিক প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে: শব্দ কী, প্রাচীন মানুষের
কাছে তার মূল্য কী ছিল? বেদের গল্পের পর গল্পে বলা হচ্ছে, শব্দ নাকি
আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভরপুর। বর কিংবা অভিশাপ হিসেবে তা অবিনাশী।
শক্তিমান এবং অপরিবর্তনীয়। ঋগ্বেদের ঋষি এমন শব্দ উচ্চারণ করেছেন।
কিন্তু, তার পরই নারীর উপনয়ন সংস্কার বাদ পড়ল, আধ্যাত্মিক
তাৎপর্যমণ্ডিত বাক্য উচ্চারণ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন, বিবাহ ও স্বামী এবং
শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সেবাকেই শিক্ষার সঙ্গে সমান গণ্য করা হল। (২১)
এই ভাবে মেয়েদের আরও পিছনে সরিয়ে দেওয়া হল। অথর্ববেদের একটি মন্ত্র
বলছে, দিন শুরু হলে নক্ষত্রেরা যেমন আলো থেকে দূরে সরে যায়, তেমনই
শ্বশুরের কাছ থেকে বধুরা পালান। (২২)

তবু ঋগ্বেদ-এর বাক, এবং ভারতী এবং আরও পরে সরস্বতী স্বয়ং বাগদেবী!
পরবর্তী সাহিত্যে যে সব দেবীরা কথা বলেন, অভিশাপ দেন। কিংবা
আশীর্বাদ করেন, তাঁদের কল্পনা সমাজে আসলে বাক্যহীনা বৃহৎ নারীগোষ্ঠীর
দুর্দশার ঋতিপূরণ। নারীর বাক্য যেটুকু আমরা পাই তা গোঁড়া মতাদর্শের
কাছে ভয়ানক, দ্রৌপদী, গান্ধারী, সীতা, দময়ন্তী, গার্গী, অম্বা, শকুন্তলা ও
অন্যান্যরা যাঁরাই কথা বলেছেন, ভয় দেখিয়েছেন, চ্যালেঞ্জ করেছেন, তাঁরাই
ঋতিপূরণের পদ্ধতিতে, প্রতীকী পন্থায় নতুন দেবসমাজে অঙ্গীভূত হয়েছেন।
তারা বেশির ভাগ দৈব অধিকারে বলীয়সী দেবী হয়ে উঠেছেন।

যেখানেই প্রতিবাদ উঠেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীর সাফল্য হয়নি বললেই চলে। কে প্রতিবাদ করতে পারেন? নারীকে চুপ করাতে সফল হয়েছে সমাজ। যদি বা তাঁরা কিছু বলেছেন, শক্তিমানের আসন পর্যন্ত তা কখনও পৌঁছয়নি, তাদের কন্ঠস্বর এমনকী নির্বিচারে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই ভাবে সমাজ সরব নারীদের দমন করার ব্যবস্থা নিয়েছে। পুরাণে ও সাহিত্যিক প্রমাণে প্রায়শ এমন সব জো-হুজুর নারীচরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে যারা তাঁদের জীবন ও আচরণ সম্বন্ধে পুরুষের নির্দেশিকা মেনে চলেন, কদাচ প্রশ্ন তোলেন না এবং পতিরতা ও সতী হিসেবে নিজেকে বড় প্রমাণ করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় মাতেন-চিন্তাশীল হিসেবে কিংবা সামাজিক মূল্যবোধের বিচারক হিসেবে নয়। জনতার অর্ধেককে এই ভাবে নির্বক নিষ্ক্রিয় দর্শকে অবনমিত করার দায়িত্ব কঁধে নিয়ে সমাজ আথেরে হারিয়েছে অনেক কিছু। কেননা, দুটি মস্তিষ্ক সব সময়ে একটির চেয়ে ভাল। নারীর ওপর নীরবতা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে সমাজের অধোগতি স্বরাশ্রিত হয়েছে, বিশেষত খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। নারীদের সম্বন্ধে সমাজের নীরবতা এবং নারীর ওপর নীরবতা চাপানের কুফল হিসেবে, সমাজে নারীর নীরবতা এই ভাবে একটা চরম অভিশাপ হয়ে উঠেছিল।

সতী

দেওরালার ভয়াবহ ঘটনা আমাদের সত্য সত্যই বিচলিত করে তুলেছে—
আমরা আমাদের ধর্ম-সামাজিক পরম্পরার বিভিন্ন ধারা আলোচনা করতে শুরু করেছি। এ কী কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা? না কি ইতিহাসে ঐতিহ্যে

এর শিকড় সুদূর প্রসারিত? এই ঘটনা কি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা না কি তার স্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা, প্রতিবেশীরা প্রয়োজনীয় ইন্ধন জুগিয়েছিল অথবা কোনও নির্মম চক্রান্তের শিকার হয়ে তাকে অনিচ্ছায় প্রাণ দিতে হল? নিহতের অথবা তার স্বজনবর্গের মানসিক অবস্থা যাই হোক না কেন, যে তথ্য আমাদের প্রকৃত ভাবে আহত এবং বিস্মিতও করে তা হল এই যে, বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই ঘটনা সত্যই ঘটেছে। এ কথাই আমাদের বিভ্রান্ত করে, এক প্রতিস্পর্ধার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়; এই হত্যা কেবল ঘট্টেইনি, বহু দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ঘটনার প্রশংসা এবং অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সে কি কোনও ধর্মীয় প্রেরণার বশবর্তীর্ণ হয়ে না কি অন্য কোনও আবেগের ফলে? ভবিষ্যতে আরও অনেক মৃত্যুকে প্রতিহত করার জন্য কেমন করে এই প্রেরণাকে বিনষ্ট করা যায়?

রূপ কানোয়ার 'সতী' হয়েছেন। 'সতী' শব্দের অর্থ কি? আমাদের ভুললে চলবে না যে ভারতীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে 'সতীর কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে এবং বিশেষ ভাবে শব্দটির নৈতিক তাৎপর্য কেবল কোনও নারীর প্রতিই প্রযোজ্য। কী এই তাৎপর্য? সদ্যবিধবা নারী তার মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করে এবং নিজেকে উৎসর্গ করে, প্রথমত পরলোকে তার স্বামীর স্বচ্ছন্দ অবস্থানের জন্য, দ্বিতীয়ত স্বর্গে চিরকাল স্বামী সঙ্গ সুখের আশায়।' আলোচ্য বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি যে রূপ কানোয়ারের স্বামী ছিল নিবীৰ্য, তাই তার মৃত্যুর কিছুদিন আগেই সে স্বামীকে ত্যাগ করেছিল অপর এক পুরুষের জন্য। তাই সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন ওঠে অনন্তকালের জন্য সেই স্বামীর সঙ্গলাভের আশায় কি সে সত্যই ব্যাকুল ছিল? হয়তো এ সম্ভাবনা তার কাছে ভয়াবহ হয়েই দেখা দিয়েছিল।

রূপ-এর আত্মোৎসর্গের বিভিন্ন ব্যাখ্যা, অন্তত যুক্তি ও মানবতার বিচারে যে তথ্য তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল বহু শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সমাজের একটি বৃহৎ অংশের

মিলিত সিদ্ধান্ত এই যে স্বামীর চিতায় আত্মহননই। সদ্যবিধবার উচিত কাজ। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বামীর মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক। কোনও সচেতন আত্মহত্যার পিছনে যে বাড়তি যন্ত্রণা, সে দুভোগ তাকে সহ্য করতে হয়নি। মৃত্যু যখন উপস্থিত হল, তখন তার সামনে কোনও বিকল্প ছিল না, কিন্তু তার বিধবা পত্নীর ক্ষেত্রে ছিল। তবু কোন অমানবিক পারিপার্শ্বিক ওই বিধবাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল?

সম্ভবত সহমরণ প্রথার শিকড় বহু দূরে প্রসারিত। অথর্ববেদ-এ আমরা দেখি আমরা মৃতের বধু হওয়ার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি অথবা এই নারী প্রাচীন প্রাথারই অনুগমন করছে। (অথর্ববেদ ১৮:৩:১,৩)। এই প্রথা কত প্রাচীন? এটি কী প্রাগার্য যুগের? সম্ভবত তাই। কারণ, গ্রিক, রোমান, জার্মান অথবা কেন্টিক প্রাচীন সাহিত্যে অর্থাৎ অন্যান্য সমগোত্রীয় ইন্দো-ইউরোপীয় সাহিত্যে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে দাহ করার কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। যেখানে অথবা যখনই এর সূচনা হয়ে থাকে, প্রমাণ রয়েছে যে আর্য ও প্রাগার্যদের মিশ্র জনগোষ্ঠী অন্তত আংশিক ভাবে, সাময়িক ভাবে হলেও অথবা আঞ্চলিক ভাবে এই প্রথাকে গ্রহণ করেছিল, যদিও কখনওই প্রথাটি বহুল প্রচলিত হতে পারেনি। মহাভারত-এ পাণ্ডুর মৃত্যুর পরও কুন্তী বেঁচে থাকেন। মাদ্রীর স্বেচ্ছায় মৃত্যু কোনও সহমরণের ঘটনা নয় বরং অপরাধবোধে আত্মোৎসর্গ। মনে হয় যে ওই সময়ে এই প্রকার সহমরণ ছিল বিকল্প প্রথা। মূল কাব্যে মাদ্রীর মৃত্যু একক ব্যতিক্রম মাত্র। উভয় মহাকাব্যেই অধিকাংশ বিধবা জীবিত থেকেছেন; স্বগে অনন্তকাল স্বামীসঙ্গে বাস করার প্রলোভনে কেউ তাদের আত্মহননে প্রলুব্ধ করেনি। যখন হর্ষচরিত রচিত হয়েছিল সেই সময় উত্তর ভারতীয় সমাজ এক অনুদার সংরক্ষণশীল পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। তবুও যখন যশোবতী, তার স্বামীর মৃত্যুর পর চিন্তারোহণে উদ্যত হলেন, কেউ তাকে উৎসাহিত করেননি; বরং যাদের কাছে তিনি বিদায় নিতে গেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাকে নিরস্তুর করেছেন। এরও পূর্ববর্তী সাহিত্যে

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে দেখা যাচ্ছে স্বামীর বিয়োগে কাতর রতি
আত্মহত্যা উদ্যত বলে কবি বর্ণনা করছেন, এর খুব সম্ভাব্য কারণ, বাস্তবে
তা ঘটবে না। রঘুবংশ একাধিক রাজার মৃত্যুর উল্লেখ আছে কিন্তু স্বামীর
সহমৃতা একটিও বিধবার কথা নেই। পরবর্তী যুগের সাহিত্যে বিশেষ করে
রাজতরঙ্গিনীর মতো প্রাচীন মধ্য যুগের সাহিত্যে, স্বামীর সহমরণে যাওয়ার
ঘটনা বহুবার উল্লেখিত হয়েছে, সমাজের প্রশংসাও পেয়েছে।

মহাভারত-এ দক্ষযজ্ঞের একাধিক বিবরণ রয়েছে কিন্তু শিব-নিন্দার কারণে
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের উল্লেখ নেই। অতঃপর শিব ত্রোধে যজ্ঞ পণ্ড করেন।
পরবর্তী পুরাণগুলিতে, বায়ু পুরাণ (৩০:৪০-৪৫) স্কন্দ পুরাণ ও বামন পুরাণ-
এ কাহিনিটির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই পরিচিত কাহিনির একটি বিশদ
সংস্করণ পাওয়া যায় অর্বাচীন, গৌণ শিব পুরাণ-এ (১৭:২৫-২৯)। এখানে
পতিব্রতা স্ত্রী সতী, তাঁর স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ
করেছেন। কিন্তু অগ্নিদেব হয়ে নয়। এই কাহিনিতে সতী বিশেষণটি
(প্রকৃতপক্ষে তাঁর নাম) একটি নূতন মাত্রা পেয়েছে: যখন স্বামীর অপমান হয়
তখন স্ত্রীর জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন, তাই তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বেছে
নিয়েছেন। দক্ষের কন্যা পুনর্জন্ম নিলেন হিমালয় দুহিতা পার্বতী রূপে এবং
আবার শিবকেই বিবাহ করলেন। সতী-র ভাবমূর্তিতে এবার নূতন একটি
সংজ্ঞা যুক্ত হল: স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ
করলেন। এ কথা বলা নিম্প্রয়োজন যে সমস্ত সাহিত্যের কোথাও স্ত্রীর সম্মান
বা মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বামীর পক্ষে কোনও প্রকার দুশ্চিন্তার অবকাশ রাখা
হয়নি। কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, কখনওই মানুষ হিসাবে সামাজিক
সম্মান মেয়েদের প্রাপ্য ছিল না। তাই ধৃতরাষ্ট্রের সভায় কুরু বৃদ্ধদের মতো
প্রত্যেকেই বিনা প্রতিবাদে নারীর নিগ্রহ এবং অপমান প্রত্যক্ষ করেছে।

সতীদাহের সূত্রপাতে দেখা যায় ধর্মশাস্ত্রে ও পুরাণগুলির চিন্তাধারায় যেখানে একে পবিত্র, কর্মের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাসস্থিতি-র নিদান অনুসারে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-নারীরা অন্য কোনও বর্ণের নয়-অধিকার আছে নিজের স্বামীর চিতায় দক্ষ হওয়ার। 'এবং যদি সে জীবিত থাকে, তবে উত্তম বস্ত্র ও গহনা পরিত্যাগ করবে, এবং তপস্যার দ্বারা শরীরকে শুদ্ধ করবে।' (২:৫৩) এখানে একটি বিকল্প রয়েছে: বিধবা নারী তপস্বিনী হয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন; পরাশরের ধর্মসূত্র-তেও বিকল্প ব্যবস্থার স্বীকৃতি রয়েছে: যে নারী স্বামীর মৃত্যুর পর তপস্যাচরণ করে থাকেন। তিনি তপস্বীদের মতোই স্বর্গলাভ করেন। (৪:২৭) কিন্তু তার একটু পরেই বলা হয়েছে মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থেকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে ৩৩ বৎসরই স্বর্গবাস করে।' (৪:২৮) এখানে অন্তর্নিহিত বক্তব্য এই যে জীবিত থাকার বিকল্প নিকৃষ্ট নারীর জন্যই প্রযোজ্য; সতী নারী সহমরণের পথ বেছে নেন এবং স্বর্গে চিরকাল স্বামীসঙ্গ লাভ করেন। সদ্যবিধবাকে তার দুর্বল, বিহ্বলতার মুহুর্তে এই কথা বলা হত। দক্ষ সংহিতা-তে বলা হচ্ছে, যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়। যেমন করে সাপুড়ে সাপকে তার গর্ত থেকে টেনে বার করে তেমন ভাবে সতী তার স্বামীকে নরক থেকে আকর্ষণ করে এবং তার সঙ্গে সুখে থাকে। হরীত সংহিতা-য় বলা হয়েছে 'যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার, পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে।' (৫:১৬০) যাগ্জুবল্য অবশ্য সহমরণকে অনুমোদন করেন না; সেখানে বলা হয়েছে স্বামীহারা পত্নীর দায়িত্ব নেবেন তাঁর পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, এমনকী ভাইরাও মাতুল। অন্যথায় তার নামে নিন্দা হবে। (১:৮৬) বৃদ্ধ হরীত সংহিতা বলে কোনও বিধবা রমণী দিনে দুইবার মাত্র আহার করবে এবং সুগন্ধি ফুল, অলংকার, রঙিন পোশাক ও কাজল পরিত্যাগ করবেন।' (১১:২০৫-২১০)

যাজ্ঞবল্ক্যের মতোই বিষ্ণুধর্মসূত্র-এর লেখকও বলেন বিধবা নারী আজীবন কঠোর সংযম অভ্যাস করবেন। (২:৫:১৪) যদিও তিনি তার স্বামীর চিতায় মৃত্যুও সমর্থন করেন। মাদ্রী পাণ্ডুর চিতাতেই অনুমৃত্যু হয়েছিলেন, কিন্তু এ ঘটনা সহমরণের উদাহরণ নয়। পাণ্ডুর প্রতি অভিশাপের শর্ত অবমাননার জন্য প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টামাত্র। মহাভারত-এর অর্বাচীন সংযোজিত অংশ মৌষল পর্বে কৃষ্ণের চার স্ত্রী রুক্মিণী, রোহিণী, ভদ্রা এবং মদিরা তাঁর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। এমনকী বসুদেবের আট পত্নীও তাঁর মৃত্যুর পরে সহমরণে গিয়েছিলেন। মনে হয় বৃষ্ণি ও সাত্বতদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কোনও কোনও নারী তাদের স্বামীর মৃত্যুর পরে অথবা শীঘ্রই অগ্নিপ্রবেশ করেন, কারণ স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ তাদের কাছে অসহনীয় ছিল; যদিও কখনওই কোনও স্বামী বিচ্ছেদ বা মৃত্যুর দুঃখে নিজে মৃত্যুকে বরণ করেননি। ভারতীয় সাহিত্যে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর আত্মোৎসর্গের কথা কোথাও পাওয়া যায় না।

যাজ্ঞবল্ক্য স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর সহমরণের বিধান না দিলেও তার ভাষ্যকারেরা নিজেদের মতের সমর্থনে যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার একটি বিধিকে উদ্ধৃত করে মিতাক্ষরাটীকা বলে কোনও অন্তঃস্বহ বা সদ্যোজাত শিশুর জননী ভিন্ন অরাক্ষণ চণ্ডাল সব নারীর জন্যই সহমরণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের নিজের শাস্ত্রে বলা হয়েছে বিধবা তার পিতামাতা অথবা স্বামীর পিতামাতার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সুতরাং সে জীবিতই থাকবে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মানবিকতাবোধ তাঁর টীকাকারেরা কল্পনা করেননি। বরং পরিবর্তনশীল সামাজিক বিধির স্রোত অনুযায়ী তাঁর শাস্ত্রবিধানকে পরিবর্তিত করেছেন। এমনকী স্বভাবত সংরক্ষণশীল মনুও কিন্তু বিধবার জন্য সংযত নিয়ন্ত্রিত জীবনের বিধান দিয়েছেন, স্বামীর সঙ্গে সহমরণের বিধান নয়। তিনি বলেছেন 'বিধবার ভক্ষ্য হবে শুধু ফলমূল এবং ফুল, সে শীর্ণ হবে, কোনও অসম্পর্কিত পুরুষকে

এমনকী নাম ধরেও সম্বোধন করবে না। (৫:১৫৭) এখানে শীর্ণ হওয়ার যে বিধান তার অন্তর্নিহিত অর্থ হল 'আয়ুক্ষয়, কিন্তু সদ্য বৈধব্যের পরই মৃত্যুর সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। ভাষ্যকার মেধাতিথি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন 'পুরুষের পক্ষে যেমন, স্ত্রী লোকের পক্ষেও তেমন, আত্মহত্যা সমর্থন যোগ্য নয়।' যদিও অঙ্গিরস বলেন স্বামীর চিতায় মৃত্যুই নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে মৌলিক বিধিকেই (নিত্যবিধি-এক্ষেত্রে আত্মহনন উচিত নয়) অনুসরণ করতে হবে। যদি কোনও বিধবা ফললাভের তীর (অন্যায়, উদগ্র) আশায় প্রলুব্ধ হয়ে আত্মহত্যা করে তবে শাস্ত্রানুসারে কাজ করা হল না। বৌধায়ন ধর্মসূত্র বলে যে, বিধবা এক বছরের জন্য মধু, মাংস, মদ্য এবং লবণযুক্ত আহার্য ত্যাগ করবেন।' (২:২:৬৬-৬৮) এখানে লক্ষণীয় এই যে অবিধবাদের জন্য মাংস ভোজন ও মদ্যপানের পরোক্ষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সাধারণত সকল শাস্ত্রকারই আত্মহত্যাকে হীন অপরাধ বলেছেন। কিন্তু মিতাক্ষরা এবং অপরাক ভাষ্যে বলা হয়েছে 'সতী'র ক্ষেত্রে অর্থাৎ সহমরণের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা কোনও অপরাধ নয়। অপরাক, আপস্তুম্বকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, যে নারী মায়াবশে ভ্রান্ত হয়ে চিতা থেকে নেমে আসে সে 'প্রাজাপত্য' প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করতে পারে। এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে, সমস্ত পৃথিবীতেই আত্মহত্যা নিজের প্রতি একটি হিংসাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হয়। তবুও যদি ও সব যুগেই এই সত্য পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নারীর ক্ষেত্রে কিন্তু সতীর মতো আত্মহত্যার ঘটনা কোনও পাপ বা অপরাধ তো নয়ই, বরং পুণ্যকর্ম।

আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বিশ্বজনীন এবং সমর্থনযোগ্য (তুল বহু প্রচারিত উক্তি: আত্মানং সততং রক্ষেৎ-নিজেকে সর্বদা রক্ষা করবে)। কিন্তু যখন কোনও

নারী চিতা থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা করতে যায়। তখন সে কাজ পাপ হয়ে দাঁড়ায়। অঙ্গিরসকে উদ্ধৃত করে বলা হয়। 'সতী নারীর চিতায় আত্মোৎসর্গের কোনও বিকল্প নেই।' 'সতীর প্রতিশব্দ হল 'সাধবী' এবং 'সতী' শব্দের মতো এরও কোনও পুংলিঙ্গ' শব্দ নেই। সৎ-অর্থ ভাল। যদি কোনও নারী সারা জীবন পবিত্র এবং ভাল থেকে থাকে। তবু মৃত স্বামীর জন্য আত্মহনে অস্বীকৃত হলেই সে হয়ে যায় মন্দ-অসতী, অসাধবী।

স্মৃতিশাস্ত্রের নব্য মধ্যযুগীয় পণ্ডিত রঘুনন্দন। তিনি অঙ্গিরসকে উদ্ধৃত করে বলেন 'সেই নারী যে চিতারোহণ করে, এর অর্থ থেকে বোঝায় অন্যান্য যে সব নারী সতী হতে চাইতই না তাদের জন্য বিকল্প পথ খোলা ছিল। রঘুনন্দন অনুমোদন করেন যে বিধবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা হল মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করা, কিন্তু তিনিও যারা স্বামীর মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকতেই চায় তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছেন। তাঁর মতে, যে সতী হয় সে হল শ্রেষ্ঠ কিন্তু, অন্যরাও থাকতে পারে; যারা শ্রেষ্ঠ না হলেও বাঁচতে চায়, সে জন্য তাদের পাপী মনে করা উচিত নয়। বিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র-তেও এই দুটি বিকল্পকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর (নারী) সংযত তপস্বিনীর জীবনযাপন করবে অথবা স্বামীর চিতায় আরোহণ করবে। এখানে লক্ষণীয় এই যে প্রথম বিকল্পটি বেঁচে থাকাকেই সমর্থন করে।

কী এই সংযম? যৌন জীবন থেকে বিরতি— তাম্বুল, প্রভৃতি পরিত্যাগ ইত্যাদি। ইত্যাদি শব্দটির ব্যাখ্যায় টীকাকার উল্লেখ করেছেন কীসা, প্রভৃতি ধাতুর পাত্রে আহার এবং প্রসাধন দ্রব্যাদি বর্জনের কথা। এই প্রসাধন দ্রব্যাদি কী? রঘুনন্দন বলেন, 'এই অভ্যঞ্জন একটি চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ, এর অর্থ হল সেই পরিমাণ কেশ-তৈল যা মাথা থেকে দুই কঁধ এবং বাহু পর্যন্ত লিপ্ত হতে পারে আর অল্প পরিমাণকে বলা হয় মাষ্টি।' অনেক অর্বাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে বিধবার জন্য দিনে একবার আহারের বিধান দিয়েছে,

এবং তাকে পালঙ্কে শোবার অনুমতিও দেওয়া হয়নি—অন্যথায় তার স্বামী পরলোকে দুর্গতি ভোগ করবে। স্বন্দপুরাণ বলে বিধবা যদি কবরী রচনা করে তাহলে স্বামীর পক্ষে তা পাপ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ আরও দেওয়া যায়; কিন্তু শাস্ত্রীয় এই সব বিধিনিষেধের অন্তর্নিহিত চিন্তা খুবই স্পষ্ট। এই সব হীনবুদ্ধি শাস্ত্র গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য হল ন্যূনতম মানবিক সুখ সুবিধা থেকেও বিধবাদের বঞ্চিত করা। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বিগতদার ব্যক্তির জন্য শোকপালনের সীমা মাত্র একদিন, যার পরে সে কেবল পুনর্বিবাহ করতেই পারে না, তার জন্য পুনর্বিবাহ করার বিধানই দেওয়া হয়েছে।

হারীত সাধবী' নারীর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'স্বামী যখন দুঃখ পায় তখন সে দুঃখ পায়; স্বামীর সুখ ভোগে সে সুখ পায়, স্বামী গৃহ ছেড়ে গেলে তাকে দেখে মনে হয় ভেঙে পড়েছে এবং সে ব্যাকুল হয় এবং স্বামীর মৃত্যুতে প্রাণ ত্যাগ করে।' এই প্রকার নারীই পতিব্রতা। এই গ্রন্থটিকে বলা হয় অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য। মহাভারত-এ বলা হয়েছে যথাযথ সময়ে (অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পরে) যদি নারীরা তাদের (মৃত্যুতেও) অনুসরণ করে, এমনকী অনুরাগ, ক্রোধ ভয় অথবা ভ্রান্তির বশে, তবুও সেই সব নারীরা পবিত্র হয়ে ওঠেন (মতান্তরে এই সব প্রবৃত্তি থেকে নারীরা সহমরণের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে ওঠেন)। ব্রহ্মপুরাণ বলে যদি স্বামীর প্রবাসে মৃত্যু হয়ে থাকে। তবে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর পাদুকা বুকে ধরে অগ্নিপ্রবেশ করা। আমরা লক্ষ্য করি যে, সমস্ত পরবর্তী শাস্ত্রগুলিই ক্রমান্বয়ে এমন এক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছে। যেখানে বিধবা নারীর বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়ে যাচ্ছে।

ঋগ্বেদ-এর একটি অর্বাচীন অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে রঘুনন্দন বলেন নারীর আত্মহত্যা করা উচিত নয়। বিভিন্ন মত আলোচনা করে তিনি বলেছেন ব্রাহ্মণ-বিধবা কেবলমাত্র স্বামীর চিতায়, পৃথক কোনও চিতায় নয়, মৃত্যুকে বেছে নিতে পারেন। এই ভাবে তিনি ব্রাহ্মণ বিধবার জীবনের সম্ভাবনাকে

আংশিক ভাবে হলেও সম্ভাব্য করেছেন। ব্যাস ধর্ম শাস্ত্র বলে, যদি স্বামী এমন দূরত্বে মারা যায় যে, পথ এক দিনের, তবে যতক্ষণ না স্ত্রী সহমরণের জন্য উপস্থিত হচ্ছে ততক্ষণ দাহ করা উচিত নয় এবং যে অগ্নিকর্তা সে উভয়েরই পারলৌকিক ক্রিয়া করবে।' ভারতের মতো উষ্ণ দেশে মৃতদেহের একদিন অপেক্ষা করার ফলাফল সহজেই অনুমান করা যায়, তবে এই বিধিনিষেধ কেন? এর ফলে বিধবার জীবিত থাকার আশা ক্ষীণতর হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে এই কথাই বলে: হয় তাকে স্বামীর সঙ্গেই দাহ করা অথবা তার জীবৎকালকে করে তোল জীবিতমৃত্যু।

ব্রহ্মপুরাণ বলে, যে নারী স্বামীর বংশরক্ষার জন্য স্বামীর চিতায় আরোহণ করতে উদ্যত, তার জন্য উপস্থিত সকলে তাকে চিত্তারোহণে সাহায্য করবে। এই আবৃত্তি করে এই সব পবিত্র সুসজ্জিত নারীরা পতিরতা; তাঁরা স্বামীর দেহের সঙ্গে সঙ্গে চিতায় প্রবেশ করুন; এই কথা শুনে পতিরতা বিশ্বস্তা স্ত্রী পিতৃমেধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে স্বর্গলাভ করবেন। রঘুনন্দন তার ভাষ্যে বলেছেন পিতৃমেধ অনুষ্ঠান হল চিতায় আরোহণ করা। এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, স্বর্গের এই পথ খোলা আছে শুধু বিধবার জন্য, বিপত্নীকের জন্য নয়।

বিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছে: এই ভাবে আত্মহত্যার কাজ নারীর পক্ষে পাপীজনক কিনা—এ বিতর্কের সিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু তার স্বামীর চিত্তারোহণ করছে সে হেতু এই মৃত্যু আত্মহত্যা নয়। স্বামী এমনই এক পুত পবিত্র বস্তু যার ফলে তার চিতায় আত্মহত্যাও আর আত্মহত্যা থাকে না, পুণ্যকর্ম হয়ে দাঁড়ায়। সংক্ষেপে, বিধবার মৃত্যুই ভাল, সুতরাং বিভিন্ন কথায় সহমরণকে পুণ্যকর্ম বলে ঘোষণা করে তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এরপরে

রঘুনন্দন অনুত্তেজিত সুচিন্তিত ভাবে সতীর অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন।

বাসস্মৃতি বলছে চিতায় বিধবা নারী তার স্বামীর মৃতদেহে আলিঙ্গন করবেন; অথবা তার মস্তকামুগুন করতে হবে। (২:৫৫) অন্যান্য শাস্ত্রেও এই প্রকার সব নির্দেশ পাওয়া যায়। যে যুক্তিতে তাকে প্রসাধন, সুগন্ধি, ফুল, ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত করা হয়। সেই একই যুক্তিতে এই মুগুনকে উচিত মনে করা হয়, যাতে তার চেহারায় নারী সুলভ আকর্ষণ না থাকে, সে কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে না পারে। কিন্তু এই সমস্ত সাবধানতামূলক বিধিনিষেধ থাকা সত্বেও পুরুষের প্রলোভন বাধা পেতে না এবং যুগে যুগে পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিধবাই হয়েছে সহজলভ্য শিকার। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, স্কন্দপুরাণ বলে, সমস্ত রকম অশুভ দ্রব্যের মধ্যে বিধবা হল অশুভতম। (৩:৭:৫০-৫১) ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির, তার বৃহৎসংহিতা-য় বলেন, অহো নারীর প্রেম কি সুদূর, তারা স্বামীর দেহ ক্রোড়ে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে। (৭৪:২৩)

নারদ স্মৃতিতে সাত প্রকার নারীর কথা বলা হয়েছে: (১) যার পূর্বে একজনের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে; (২) কুমারী; (৩) যে বিধবাকে তার শ্বশুরকুল তার স্বামীর বংশে অন্য কাউকে সমর্পণ করেছে; (৪) নিঃসন্তানা বিধবা; (৫) যে বিধবা তার দেবরকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে এবং নিজের পছন্দ মতো কাউকে বিবাহ করে; (৬) যে বিধবা যাকে কিনে আনা হয়েছিল অথবা যে বিদেশি এবং নিজে ইচ্ছা মতো যে অন্য কাউকে বিবাহ করে; এবং (৭) যে বিধবাকে তার গুরুজনেরা কোনও অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির হাতে দান করেন। এর মধ্যে শেষের চার শ্রেণিকে বলা হয় বহিমুখী বা স্বেচ্ছাচারিণী অর্থাৎ বারাজনা, যদিও শেষোক্ত জন তার গুরুজনদেরই অজ্ঞা পালন করে। শাস্ত্রগ্রন্থ এই সাতজনকে বলেছে 'পুনর্ভু' অথবা অন্যপূর্ব' অর্থাৎ যে নারীর পূর্বে অন্য পুরুষ

ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মশাস্ত্র বলে পুনর্ভূ দুই প্রকার—কুমারী এবং অ-কুমারী; মনু (৯:১৭৬), বিষ্ণু ধর্মসূত্র (১৫:৮, ৯), বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র (১৭:১৮) 'পুনর্ভূর কথা বলেছে। গ্রন্থগুলিতে সতীদাহের বিকল্পের অবকাশ আছে।

বিধবার জীবিত থাকার সামাজিক অধিকার বিষয়ে এই বিতর্ক শুরু হয়েছে, ঋগ্বেদ-এর অর্বাচীন অংশের একটিমাত্র মন্ত্রের বিষয়ে বিভিন্ন ভাষ্য থেকে। প্রসঙ্গত ঋগ্বেদ-এর এই অংশটি দেশজ অধিবাসীদের সঙ্গে বহিরাগত জনগণের সংমিশ্রণ এবং উভয়ের সাংস্কৃতিক একীভবনের পরবর্তীকালে রচিত। এই মন্ত্রে কোনও সদ্যবিধবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যে চিতায় তার স্বামীর মৃতদেহের পাশে শুয়ে রয়েছে আত্মহননের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে: ওঠে, হে নারী, যে শুয়ে আছে মৃতকে আলিঙ্গন করে, তুমি জীবিতের রাজ্যে এসো, যে পুরুষ তোমার হাত ধরে আছে তার স্ত্রীর অধিকার স্বীকার করা। (১০:১৮:৮)। কে তার হাত ধরে জীবিতের রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়? আশ্বিনায়ন গৃহ্যসূত্র বলে এই পুরুষ হল তার দেবর, মৃত স্বামীর শিষ্য অথবা পুরাতন ভৃত্য। (৪:২:১৮) এখানে বহু বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করতে পারি: তবে কী ওই বিধবা সতীর ভূমিকাটি অভিনয় করছে? অতঃপর দেবর অথবা অন্য কেউ তাকে চিতা থেকে হাত ধরে তুলে আনে (সম্ভবত দেবর শব্দটির উৎপত্তি দ্বি-দুই বর' এই ভাবে। এমনকী এখনও ওড়িশা এবং অন্যান্য রাজ্যের কোনও কোনও স্থানে কনিষ্ঠ দেবরের সঙ্গে বিধবা ভ্রাতৃবধুর পুনর্বিবাহ প্রথা চালু আছে। তৃতীয়ত, সহমরণে বাধা দেওয়ার কারণ বলা হয়েছে বংশ রক্ষার কাজ অব্যাহত রাখা, প্রজনন। ভাবী জননীরা অকাল মৃত্যুকে প্রতিহত করা হয়েছে, কারণ নারীর প্রসবিনী শক্তি এবং সন্তানলাভ করা সমাজের প্রয়োজন ছিল। কোষগ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুম-তে বলা হয়েছে দিদিষু শব্দের অর্থ 'পুনর্ভূ'; সেই জন্যই তাকে পুনর্বিবাহের প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। মনে হয় স্বামীর চিতায় বিধবার আত্মাহুতি দেওয়ার প্রথা কোনও প্রাগায় প্রথা, সম্ভবত সিন্ধু সভ্যতায় এই

প্রথার প্রচলন ছিল, ইন্দো ইওরোপীয় সভ্যতায় এর কোনও সমর্থন পাওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রথা অনুসরণে উদ্যত কোনও নারীকে (আর্য পুরুষদের অনার্য পত্নীরা নিজেদের প্রথা পালনে উদ্যোগী হতেই পারেন) অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আর্য প্রথা মানতে বাধ্য করা হতেই পারে; সেই ঘটনাই আলোচ্য ঋগ্বেদের মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের কিছু কিছু ঘটনা গ্রিক, লাতিন ও জার্মান সাহিত্যে দেখা যায়।

ঋগ্বেদ পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে ক্রমান্বয়ে বিধবাকে দেখানো হয়েছে অশুচি ও অশুভ রূপে, তাঁর বেঁচে থাকার অধিকার হয়ে উঠেছে বিতর্কের বিষয়। তারপর বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক পরিস্থিতির চাপে ওই ঋগ্বেদীয় মন্ত্রটির অর্থকে, সমাজপতিদের অনুকূলে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী শাস্ত্র স্বাগবিধান বলে, কেবল মাত্র নিঃসন্তান বিধবাকেই জীবিতের রাজ্যে ফিরিয়ে আনা চলে। (৩:৮:৪) অর্থাৎ মৃতের পারলৌকিক কাজ করার জন্য একজন যথাযথ অধিকারী চাই। কোনও কোনও শাস্ত্রে দেখা যায় দেবরের সঙ্গে বিধবার বিবাহ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদ-এর আর একটি মন্ত্রের অর্থ বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। অশ্বিনদ্বয়কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—অন্য কে তোমাদের (সৃষ্টি দ্বারা) স্তুতি করেছে, যেমন করে কোনও বিধবা শয়্যায়। তার দেবরকে সন্তুষ্ট করে। (১০:৪০:২) অতএব, ঋগ্বেদ-এর যুগে বিধবারা বেঁচেই থাকত এবং দেবরকে বিবাহও করত। এই প্রথা সে যুগে অবশ্যই বহুপ্রচলিত ছিল, অন্যথায় উপমা হিসাবে ব্যবহৃত হত না। অথর্ববেদ-এ এক নারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে একাধিক বিবাহ করেছিল। (৯:৫:২৭) এমনকী দশজন স্বামী গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। (৫:১৭:১৯) এখানে অন্তত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহ যে প্রচলিত ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। অথর্ববেদ-এ অবশ্য দু'বার সহমরণেরও উল্লেখ আছে। এই ভাবে এই প্রথার উদ্ভব ও প্রয়োগ যে প্রাগার্যদের মধ্যে ছিল না বোঝা যায়। হয়তো এটি সিন্ধু সভ্যতার প্রথার একটি স্মৃতিচিহ্ন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-এ প্রার্থনা করা হয়েছে, আমি যেন ইন্দ্রাণীর মতো অবিধবা হই। (৩:৭:৫:৫১) এখানেও স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার বেঁচে থাকার পরোক্ষ ইঙ্গিত পাচ্ছি, কারণ বৈধব্যের দুঃখ যন্ত্রণার ভোগ সতীর কাছে অজানা।

রামায়ণ ও মহাভারত-এর মূল অংশে কোনও সতীদাহের ঘটনা নেই; মাদ্রী অনুতাপে আত্মহনন করেন। কারণ তিনি পাণ্ডুর কামনার বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। আর্য বসতিগুলির চারপাশের সমাজে এই প্রাগার্য প্রথার প্রচলন ছিল, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আর্যদের উপরেও এই প্রথার সক্রিয় প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু রামায়ণে দশরথের তিন পত্নী; তারা, মন্দোদরী; ইন্দ্রজিৎ অথবা কুম্ভকর্ণের পত্নীরা কেউই স্বামীর সঙ্গে চিতা আরোহণ করেননি। মহাভারতেও সত্যবতী, কুন্তী, অশ্বিক, অশ্বালিকা, দুঃশলা এবং দ্রৌপদী-তার চার স্বামীর মৃত্যুর পরও বেঁচেছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সময়ে উত্তর ভারতে বিদেশি অভিযানের মিছিল চলেছিল। এর ফলে সামাজিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। ভগবদগীতা প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতকে রচিত। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের কুফল সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন—এতে বংশক্রম বিনষ্ট হয় এবং এর ফলে পরম্পরাগত ধর্মক্ষয় পায়। এইরূপ ঘটনা ঘটলে সমস্ত পরিবার অপবিত্র হয়, অভিজাত কুলনারীরাও দুষ্ট ব্যবহার করেন এবং বর্ণসংকর ঘটে থাকে। (১:৩৯:৪০) এই সব দুষ্টা কুলনারীদের মধ্যে যুদ্ধ-বিধবাদের দেখা যেতে পারে কারণ অর্জুন। এখানে যুদ্ধ ও তার ফলাফল বিষয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অন্য ভাবে বলতে গেলে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পরও বিধবা জীবিত থাকে, সে অন্য স্বামী বরণ করতে পারে এবং তারই ফলে ঘটে যাবে সর্বাধিক ভয়াবহ বিপদ—বর্ণসংকর। তখন পরিবার এবং তার ধ্বংসকারী উভয়েরই গতি হয় নরকে, পিতৃপুরুষের সংকর সঠিক ভাবে

হয় না এবং তারা নরকে পতিত হয়। (১:৪২) এ কথা সহজবোধ্য এবং এ জন্যই সতী প্রথা উজ্জীবিত হয়, অংশত এই ভাবে ব্যাপক সামাজিক অবক্ষয় রোধের জন্য।

গুপ্তযুগে মনুর নির্ধারিত নীতিই প্রচলিত ছিল। (তুলনীয় রঘুনন্দন ১:১৭)। যদিও মনু বিধবার জন্য স্বামীর চিতায় মৃত্যুর বিধান দেননি, তবু তিনি কঠোর সংযমবিধি নির্দেশ দিয়েছেন। এই যুগে পুরাণগুলি রচিত হতে শুরু করেছিল এবং সেগুলির মাধ্যমে নারী ও শূদ্রের প্রতি অবদমনের এক ক্রমবর্ধমান চিত্র পাওয়া যায়। সম্প্রদায়গত পুরোহিতগণ কয়েক শতক ধরে পুরাণ রচনা করে আসছিলেন; তাঁদের ধর্ম ও দর্শনগত মতবাদ ছিল ভিন্ন, কিন্তু নারী ও শূদ্রের প্রতি নিপীড়ন করতে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে একমত ছিলেন।

বেদ-পরবর্তী যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত কুড়িজন শাস্ত্রকার তাদের গ্রন্থ রচনা করেছেন: বহু বিষয়ে তাদের মতভেদও আছে। কেউ কেউ বিধান দিয়েছেন স্বামীর সঙ্গে বা তারপরে সতীদাহ করতে, কেউ বলেছেন শুধু ব্রাহ্মণ বিধবারাই এই ভাবে মারা যেতে পারেন; অন্যরা শুধু কঠোর নিয়ম পালন করবেন। কেউ কেউ বলেন যে সব বিধবা এই ভাবে মৃত্যুবরণ করেন তারা পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়েরই পূর্বপুরুষদের মুক্তি দেন। অন্যরা বলেন সাপুড়ে যেমন গর্ত থেকে সাপকে টেনে বার করে তেমন করেই একজন সহমৃতা সতী তার স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধার করে। এই ভাবে বিষয়টি অনুমান করা হয় যে, যে স্বামী কোনও গুরুতর অপরাধ করে নরক ভোগ করছে, তাকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় হল পত্নীর আত্মহত্যা। যে স্বামী তার নিজের পাপের জন্য নরকবাসের যোগ্য, সে উদ্ধার পেতে পারে একটি নিরপরাধিনী মেয়ের মৃত্যুতে—এই বিধানের অন্তর্নিহিত অবিচারে কোনও সংশয় নেই; ঠিক যেমন যে নারী পাপ করছে তাঁকে বাঁচাবার জন্যও কোনও দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় না। সারা জীবন নীরবে স্বামীর সেবা করে যাওয়া আর

তার মৃত্যুতে আত্মহত্যা করা, নারীর জন্য এই বিধান দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও শাস্ত্র আর একটু অগ্রসর হয়েছে; সে স্বর্গে তার স্বামীর সঙ্গে বাস করবে ত্রিশ কোটি বছর কিংবা তার শরীরে যত লোম আছে তত বছর, যখন স্ত্রীর মৃত্যু হয় স্বামীর আগে, তখন কিন্তু স্বামীর জন্য এমন কোনও নির্ধারিত বিধান নেই যাতে সে চিরদিন তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করবে। প্রচলিত প্রবাদ হল ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গরু। শাস্ত্র বিধান দেয় স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর শোক পালন এবং অশৌচ মাত্র এক দিনের। তারপরে তার পুনরায় বিবাহ করাই উচিত।

কানে-র আট খণ্ডে রচিত ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক ইতিহাসে 'সতী' বিষয়ক কয়েকটি অধ্যায় আছে। তার দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের বাংলায় (যা তখন বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) সতীর সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩৭৮ (১৮১৫ খ্রি.) সর্বোচ্চ ৮৩৯ (১৮১৮ খ্রি.)। এবং, ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলাতেই সংখ্যাটি ২৩৬৬, যার মধ্যে শুধু কলকাতাতেই সতীদাহের সংখ্যা ১৮৪৫। কানে-র মতে এর মুখ্য কারণ হল শুধু বাংলাতেই দায়ভাগ স্মৃতির অনুসরণ করা হয়, (বাকি ভারতবর্ষ মিতাক্ষরকে অনুসরণ করে), এবং এই স্মৃতি অনুযায়ী বিধবাই স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী। জনৈক জিতেন্দ্রিয় পরবর্তীকালে সংযোজন করছেন, 'নিঃসন্তানা বিধবা তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির নিঃশর্ত অধিকার পাবেন।' কানে যথার্থই অনুমান করেছেন যে, পাছে বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তির অধিকার চেয়ে বসে সেই ভয়ে তাকে সক্রিয় প্রেরণা দিয়ে এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে ভয় দেখিয়ে স্বামীর চিতায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হয়। ব্যবসায়ী আর উদ্যোগপতিরা যেহেতু বেশির ভাগই ছিলেন কলকাতাবাসী, তাই এখানে সতীর সংখ্যা এত নির্মম ভাবে বেশি—যাতে আইনানুযায়ী বিধবারা বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে বসতে না পারে।

সমস্যা দুটি: পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিধবাদের স্বামীর চিতায় উঠতে প্রেরণা দেওয়া হত, জোর করে নিয়ে যাওয়া হত। তা যদি না হত তাহলে স্বামীর মৃত্যুতে যে বিধবা যথেষ্ট সম্পত্তি পেয়ে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন হচ্ছে সে কেন সহমরণে যাবে? সুতরাং নিকটবর্তী আত্মীয় এবং অর্থলোভী অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা মেয়েটিকে সতী হওয়ার জন্য ভয় দেখায়, মিষ্টি কথায় ভোলায়। কিন্তু সেই সব বিধবারা যাঁরা এই সব প্রেরণাকে জয় করেও বেঁচে ছিলেন ও স্বামীর সম্পত্তির অধিকার নিয়েছিলেন— পরিসংখ্যান বলে সতীদের চেয়েও তাদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এই সব জীবিত বিধবাদের পরিণতি কি হয়েছিল? ব্রহ্মচর্য-সংযমের জীবন। অন্যান্য কিছু তপস্বী সম্প্রদায় যাঁরা ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করতেন তাদের মাথা মুড়িয়ে, দিনে একবার মাত্র আহার করে বেঁচে থাকতে হত। ব্রহ্মচারী ছাত্রের সংযম-চর্য শেষ হত তার স্নাতক হওয়ার পর। তারপর সে দিনে দু'বার আমিষ আহার করতে পারত, সুগন্ধ, প্রসাধন, অলংকার ব্যবহার করতে পারত। কোনও ব্রহ্মচারীকে কখনও অশুভ, অমঙ্গলকারী বলা হয় না। সুতরাং বিধবার ব্রহ্মচর্য এক অদ্ভুত প্রকারের, যার লক্ষ্য হল বিধবাকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত করে তাঁর মৃত স্বামীর আত্মার উপকার করা।

দায়ভাগ-এর প্রাধান্য সত্ত্বেও, তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে তত্ত্বগত ভাবে অধিকার থাকা সত্ত্বেও, অশিক্ষিত বঞ্চিত সন্তানহীন বিধবার পক্ষে তার মৃত স্বামীর শক্তিমান পুরুষ আত্মজনের নিরাবরণ অর্থলোভের বিরুদ্ধে কী করা সম্ভব? এ সত্ত্বেও যদি সে পিতৃপরিবারের

অধিকারিণীদের পুড়িয়ে মারা হত। বহু নারীর কাছে স্বামীর সম্পত্তির তত্ত্বগত অধিকার যে কেবল মরীচিকা ছিল, সে সত্য প্রমাণিত হয় সামান্য সাহায্যের ভরসায় বেঁচে থাকা কাশীবাসিনী বাঙালি বিধবার বিপুল সংখ্যা থেকে। বৃহত্তর সংখ্যায় বিধবারা তাদের আত্মীয়দের নিপুণ ছলচাতুরীর ফলে

আইনসম্পত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এরা বেঁচেছিল-বেঁচে থাকে
আত্মীয়দের বাড়িতে গলগ্রহ, বিনা বেতনের ঝি-এর মতন।

দ্বিতীয় সমস্যা হল, মিতাফরা অনুসারী রাজ্যগুলিতে, যেখানে সন্তানহীনা
বিধবা কেবল আশ্রয় আর খাদ্যের অধিকারী, এবং স্বামীর সম্পত্তিতে তার
কোনও অধিকারের আশা নেই, সেখানে কী কোনও সতী ছিল না? মিতাফরা-
র শাসন মেনে চলা এমনই একটি অঞ্চল হল রাজস্থান। তবে কেন সেখানে
জহররতের (স্বামীর মৃত্যুতে নারীর স্বেচ্ছামৃত্যু) এত ব্যাপক প্রচলন? এ তো
আক্ষরিক অর্থে গণ-আত্মহত্যা। এই সমাজ অনুমোদিত গণহত্যার ব্যাখ্যা কী?
এখানেই একটি বাস্তব সমস্যা দেখা যায়।

হিন্দু সমাজ কোনও দিনই নারীর স্বতন্ত্র স্বাধীন পরিচয়কে মেনে নেয়নি।
বরং বারবার ঘোষণা করেছে যে, নারী স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। তার
উচিত স্বামীর পদাঙ্ক ছায়ার মতো অনুসরণ করা। যে সব অধিকার মানুষকে
স্বাধীনতা দিতে পারে-শিক্ষণ, সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার, স্বাধীন বৃত্তি,
সম্পত্তির অধিকার, নিজের দেহের ওপর অধিকার, সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত
বজায় রাখার অধিকার, সমাজ শাসনে অথবা রাষ্ট্র শাসনে অংশ নেওয়া বা
নিজের মত প্রকাশের অধিকার, নারী কখনওই এগুলি ভোগ করেনি। অবশ্যই
কোথাও কোথাও কোনওখানে এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। কিন্তু এগুলি
শুধুই ব্যতিক্রম, নিয়মকেই কেবল প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজ কোনও কুমারী বা
বিধবার সামাজিক সত্তাকে স্বীকৃতি দেয়নি; এখানে তার একটাই পরিচয়-সে
কারও পত্নী। স্ত্রী রূপে তার আদর্শ কী? সতী হওয়া, পতিরতা হওয়া। স্বামীর
প্রতি নিবেদিত প্রাণ হওয়া শব্দটির একটি তির্যক অর্থ আছে-স্বৈবে স্বামী।
আমাদের মনে রাখতে হবে এই অর্থে 'সতীর কোনও পুংলিঙ্গ শব্দ নেই, যেটা

হতে পারত 'পত্নীরত', কিন্তু হয়নি। আবার পতিরত শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এটা উচ্চ আদর্শ।

মহাভারত-এ বনপর্বে (এই অংশটি মহাকাব্যে ভার্গব প্রক্ষেপণের শেষতম অংশ এবং চরিত্রগত ভাবে প্রাক পৌরাণিক) সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করেছেন, তুমি কেমন করে তোমার পাঁচ স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখ? উত্তরে দ্রৌপদী পতিরতের আদর্শ সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন, যেটি সম্ভবত ভারতীয় সাহিত্যে পতিরতের সর্বপ্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য সংজ্ঞা। (৩:২২২-২২৩) এর শুরুতেই দেখা যাচ্ছে—'অহংকার, কামনা, ক্রোধ ত্যাগ করে আমি সন্ত্রীক পাণ্ডবদের সেবা করি।' (২২৮-১৮১) প্রত্যেক পাণ্ডবেরই দ্রৌপদী ছাড়া অন্য পত্নী ছিল। পতিরত নারী প্রথম যে বস্তু ত্যাগ করবেন তা হল অহংকার, ব্যক্তির আত্মমর্যাদা। এরপর দ্রৌপদী, স্বামীর কাছ থেকে নারীর প্রাপ্য বিষয়ে একটি তালিকা দিয়েছেন—সন্তান, সুখভোগের নানা বস্তু, শয্যা, সুখাসন, পোশাক, মালা, সুগন্ধি, স্বর্ণ এবং নানা দুর্লভ দ্রব্য। (২২৩:৩) এর আগে তিনি বলেছেন স্বামী সন্তুষ্ট হলে তিনি এগুলি দিয়ে থাকেন, অন্যথায় নয়। বলা নিম্প্রয়োজন যে এই তালিকায় ভালবাসা বা শ্রদ্ধার কোনও স্থান নেই। আর এ কথাও সুস্পষ্ট যে, এই সব উপহারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক কিন্তু জৈবিক স্বাস্থ্য বা বস্তুগত সুখকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। দ্রৌপদীর আলোচনা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, পতিরতের আদর্শ হল স্বামী ও তার সংসারের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন অক্লান্ত সেবা। আর সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ। শেষেরটিই পতিরতের ধারণার কেন্দ্রবিন্দু। পতিরত তার নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ লোপ করে স্বামীর স্বার্থসাধন করে যাবে। তবেই তার বিশেষণ হবে পতিরত।

মানবিক মর্যাদার পক্ষে যা কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ তার সব কিছু থেকেই আমাদের সমাজ নারীকে বঞ্চিত করেছে; সুদূর বৈদিক যুগেই সে তার শিক্ষার

অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, চিরকাল স্বাধীন জীবিকার অধিকার থেকে
সে বঞ্চিত, জীবনের জন্য তার পাথেয় হল দৈহিক সৌন্দর্য, যৌবন,
কর্মক্ষমতা, সন্তানধারণের যোগ্যতা; তার মনকে কখনও স্বীকৃতি দেওয়া
হয়নি, তাই সে নিজেকে কখনও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে
পারেনি। স্বাধীন অস্তিত্বের আস্থা ও যোগ্যতা ছাড়া তার অস্তিত্ব কেবল
প্রাণীরূপে, শূদ্রের মতোই সে-ও কেবল প্রভুর সম্পত্তি। এই পরিস্থিতিতে, শাস্ত্র
নারীর জন্য একটিই ভূমিকার নির্দেশ দিয়েছে পতিরতার ভূমিকা। কেবল এই
কাজটিতে সফল হলেই একজন নারী জনগণের মনোযোগ পেতে পারে।
সার্থকতার উপায় হল স্বামী ও শ্বশুরকুলের সেবায় তাদের প্রসন্নতার জন্য
নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ।

যদি সে পাদ-প্রদীপের আলোয় আরও বেশি করে আসতে চায়। তবে সেই
ভাবে গুরুত্ব পাওয়ার উপায় হল সতী হওয়া, যা পতিরতার জীবনের চূড়ান্ত
পর্যায়। সমস্ত পুরাণগুলি এবং পরবর্তী সাহিত্যের অধিকাংশই সতীর প্রশংসায়
পঞ্চমুখ। ভারতীয় নারীর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের মধ্যে এই ধারণা কাজ করে
যে, একজন সতী তার স্বামীর সঙ্গে চিরকাল স্বর্গে বাস করে। একজন সুখী
বিবাহিত রমণীর কাছে এ এক লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু অন্য দিকে যে নারী
তার স্বামীর দ্বারা নিপীড়িত, অবহেলিতা— তার কাছে এই চিন্তা বিতৃষ্ণাই
সৃষ্টি করে। এর পরেও যদি 'সতী'র প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা তার কাছে কোনও
ভাবে অর্থবহ হয় তবে তার কারণ হল সতীদাহের পটচিত্রের মতো প্রেক্ষাপট,
এর চোখ ধাঁধানো নাটকীয় অস্তিম দৃশ্য, যেখানে শাঁখ বাজে, ঢাক ঢোল বাজে,
জনতা জয়ধ্বনি করে আর সামাজিক উত্তেজনা ও ধর্মের বাতাবরণ তৈরি
হয়। এই দৃশ্যপটের মধ্যে নায়িকা, সদ্যবিধবা নারী নববধূর মতো সাজে,
তার শ্রেষ্ঠ পোশাক পরে, সিঁদুর কাজল ফুলমালা চন্দন আলতায় সুসজ্জিত হয়ে
ধীরে ধীরে সে চিতায় ওঠে; তার স্বামীর পা দুটি বুকে আঁকড়ে ধরে কিংবা
মৃতদেহকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে; এই ভাবে যতক্ষণ না আগুন জ্বলে সে

বিত্রাস্তির সঙ্গে অপেক্ষা করে। শেষ মুহূর্তে সে যাতে বিচলিত না হয়, এবং নীতিগত, দৃশ্যগত ভাবে ছন্দপতন না ঘটে, সে জন্য শুভাকাজিঙ্কীরাকে উত্তেজক পানীয় পান করায়। এমনকী পরে যখন আগুনের লেলিহান শিখা অসহনীয় হয়ে ওঠে; পানীয়ের নেশা কেটে যায়; তখন যদি সেই বিধবা বিচলিত হয়ে পড়ে; 'সতীর মহিমা ফুল হওয়ার ভয় দেখা দেয়; যদি সে চিতা থেকে নেমে আসতে চায়—তখন সেই শুভাকাজিঙ্কীরাই তাকে বাঁশের লাঠি দিয়ে চেপে ধরে; প্রতিবেশী, পুরোহিত, সমাজকর্তা সকলেই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অতিমাত্রায় সাহায্য করতে চায়। তারা গান করে, ঢাক বাজায়, এত উচ্চ জয়ধ্বনি দেয় যে, সতী যা কিছু বলতে চায় সবই উচ্চনাদে ঢেকে যায়।

যেখানে বিধবা স্নেহায় সতী হতে চেয়েছেন সেই রকম কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রমী উদাহরণ ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করে এবং দীর্ঘকালীন সামাজিক শিক্ষাকে বিনষ্ট করে তার সেই প্রবৃত্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু একবার যখন ধার্মিক প্রতিবেশী আর সমাজের নৈতিক রক্ষাকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে। মেয়েটিকে সতী হতেই হবে এবং যদি কোনও দুর্বল মুহূর্তে সে সম্মতি দিয়ে থাকে—বা না দিয়ে থাকে—তবু সে ভাগ্যের হাত থেকে অব্যাহতি পায় না। আমাদের মনে পড়ে সেই অধ্যাক্ষের কথা, যিনি জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন, কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর তাদের জয়ে সাহায্য করবেন তাই অধস্তনদের উপদেশ দিতেন ঈশ্বরে সর্বতো ভাবে বিশ্বাস রাখ। কিন্তু বারুদ শুকনো রাখতে ভুল কোর না।' ঠিক তেমনই, সম্ভাব্য সতীর উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা আর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি পুরোপুরি ভরসা না রেখে লোকেরা প্রয়োজনীয় নৈতিক ও দৈহিক সাহায্য নিয়েই উপস্থিত থাকে, যাতে জীবিত বিধবাদের বিশ্বাস সতীদাহের উপর থেকে টলে না যায়। এও সত্য হতে পারে যে, সমাজে বিধবাদের দুর্বিষহ সামাজিক ও দৈহিক দুর্দশা কোনও কোনও নারীকে প্রেরণা দিয়েছিল সব দুর্গতির একবারেই শেষ করতে। তাই শুভানুধ্যায়ীদের অনুপ্রেরণা, ঘটনার তাৎক্ষণিক গরিমার মোহ আর

পরলোকের দুর্দশার ভয় কিংবা স্বর্গের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি এই সব কিছু মিলেই মেয়েটিকে এই সিদ্ধান্ত নিতে উদ্যোগ জোগায়। আর তারপর সমাজ তাকে সেই সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকতে সাহায্য করে। পৌরাণিক কাহিনিতে পতিরত্নের কর্তব্যের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে: এক পতিরত্ন সতী তার লম্পট কুণ্ডরোগী স্বামীকে প্রতি সন্ধ্যায়। পিঠে বয়ে গনিকাগৃহে নিয়ে যায়। আর সকালে ফিরিয়ে আনে—সমাজের এই মূল্যবোধই বিধবা হত্যার প্রেরণা জোগায় আর তারপর তাকে সতীর সম্মান দেয়। এমনকী পুরুষ পুরোহিতদের নির্ধারিত নিয়মে বাঁধা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও কিন্তু সতীপ্রথা টিকে থাকত না, যদি নারী নিজেই পরলোকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর না হত, যদি তার আত্মীয়স্বজনদের প্রলোভনে মন্ত্রণায় বিচলিত না হত।

নারী নির্যাতনের অন্যান্য উপাদানের মতোই এই সতীদাহের মূলও তারই অবচেতনের গভীরে প্রোথিত এবং কুসংস্কারে লালিত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন এই নারীর জন্য সমাজ পালানোর কোনও রাস্তা খুলে রাখেনি। মাঝে মাঝে যদি দু-একজন নারী সহমরণে না যান। তবে তো সতী'ত্বের গৌরবময় স্মৃতি জনচেতনায় মলিন হয়ে যাবে। এবং যদি মাঝে মাঝে সতীর স্মৃতিতে মন্দির, প্রার্থনাকক্ষ গড়া হয় তবে তো পুরোহিতদেরই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়। আর যুগ যুগ ধরে যে অতিকথা সরবে ঘোষিত হয়ে আসছে যে, কেবলমাত্র কোনও হিন্দু নারীই তার স্বামীর জন্য জীবন দিতে পারে (অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অনুরূপ উদাহরণগুলি অগ্রাহ্য করে এবং এই সব নারীদের 'সতী' আখ্যাও দেওয়া হয় না) সেই দাবি ও যুগে যুগে প্রমাণিত করা যায়। সুতরাং মাঝেমাঝে কোনও অভাগিনীকে পুড়িয়ে মেরে যদি সতীত্বের গৌরব শিখা অল্লাস থাকে। তবে সমাজের, বিশেষ করে পুরোহিত ও নীতিবাগীশদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। বৃহৎসংহিতা-র যুগ থেকেই সমাজ এই অতিকথা ঘোষণা করে আসছে যে, নারী তার স্বামীর প্রতি ভালবাসার জন্যই সহমরণে যায়। এই

মিথ্যার অবসান হওয়া উচিত। যদি স্বামীর প্রতি প্রেমে এক নারী আত্মহত্যা করে তবে কেন আজ পর্যন্ত কোনও স্বামী তার স্ত্রীর চিতায় আত্মহত্যা করেনি? এতো হতে পারে না যে, আজ পর্যন্ত কোনও স্বামীর স্ত্রীকে ভালবাসেনি। যদি সতীদাহের ভিত্তি হত প্রেম, তবে আমরা অবশ্যই কিছু কিছু ঘটনা দেখতে পেতাম যেখানে মৃত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীও সহমরণে গেছেন। কিন্তু তা হয়নি, এ বিষয়ে কোনও শাস্ত্রীয় বিধিও নেই। সুতরাং মূল ব্যাপার হল, স্বামীর স্বার্থে স্ত্রীর সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন; আর সতীদাহ এই আজীবন নাটকেরই পঞ্চমাংশের শেষ দৃশ্য। আজ একুশ শতকের দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা এই সতীদাহের সগর্ভ প্রশংসা শুনছি। আর সমাজ এই ভাবে কৌশলে নারীহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, কারণ, ভারতবর্ষে পুরুষহত্যা অপরাধ, কিন্তু নারীহত্যা তা নয়। পরিবর্তে ধর্মের নামে পবিত্রতার নামে নারীহত্যা করতে পারা সমাজের কাছে সর্বদাই গৌরবের বস্তু। হিন্দু সমাজ ভয় দেখাচ্ছে যে, এই পবিত্র হত্যাকাণ্ডের অধিকারে তারা কোনও হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না। আত্মহত্যা যে অপরাধ, সেখানে লিঙ্গভেদ থাকা উচিত নয়, সে কথা সরিয়ে রেখে সেই আত্মহত্যাকে করে তোলা হয়েছে পুণ্যকর্ম-পুণ্য অগ্নিকে উজ্জীবিত রাখার জন্য সেই আত্মহত্যার স্থলে মন্দির তোলা হচ্ছে। যতদিন শিক্ষা, প্রগতি, যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এই জঘন্য ধর্মীয় অন্যায় নরনারীর চেতনা থেকে উৎপাটিত না হয়, সমাজ সচেতন ভাবে এই সব ঘটনাকে প্রতিরোধ না করে, এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি না দেয়, ততদিন শুধু রূপ কানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই সতী প্রথার শেষ হবে না।

শঙ্কু ও মায়াতি: সমাজে শূদ্রের অবস্থান বিষয়ে একটি বিচার

এক

শূদ্র বিষয়ে অধ্যাপক আর এস শর্মার প্রসিদ্ধ বইটি এবং অন্যান্য লেখকের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষার পরে প্রাচীন বর্ণবিভক্ত সমাজে শূদ্রের স্থান আমাদের সবার কাছে মোটামুটি পরিষ্কার। তেমনই পরিষ্কার রামায়ণ-এর শেষ কাণ্ডে শঙ্কু উপাখ্যান। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শঙ্কুর কাহিনির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ পরীক্ষা করা এবং প্রাক্-মধ্যযুগীয় একটি পুরাণের থেকে একটি চতুর্থ প্রাসঙ্গিক অংশ যোগ করা।

উত্তরকাণ্ডে দেওয়া প্রাচীনতম শঙ্কু কাহিনিতে বলা হয়েছে, রাজার কোনও ক্রটির ফলেই কেবল প্রজাদের অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে।' এ কথা বলেছিল। সেই ব্রাহ্মণ যার পুত্র বাল্যকালে মৃত হয়েছিল; সে রামকে সম্পূর্ণ ভাবে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিল। (১) তাই রাম বেরিয়ে পড়লেন, কোথায় তাঁর শাসনে ক্রটি হয়েছে দেখতে; তিনি দেখলেন শূদ্র শঙ্কু তপস্যা করছে এবং নারদ এর মধ্যেই ব্রাহ্মণ বালকের অকাল মৃত্যুর হেতু খুঁজে পেলেন। (২) তৃতীয় যুগে দ্বাপরে সুবর্ণময় সত্যযুগের তুলনায় অনেক পাপ ঢুকেছিল, তাই বৈশ্যেরা তখন তপস্যা করতে পারত এবং করতও। কিন্তু শূদ্র? কখনওই না। তাদের একমাত্র ধর্ম উচ্চতর তিন বর্ণের দীন ভাবে সেবা, মনু ও অপর ধর্মশাস্ত্রগুলি যে বিধান দিয়েছেন সেই অনুযায়ী কাজ করা। শুধু তাই নয়, যে রাজার রাজত্বে শূদ্র তপস্যা করে, সেই রাজা নরকে যান। নারদের কথায় রাম শূদ্রকে সম্ভাষণ করে তার পরিচয় এবং তার প্রযত্নের হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। শূদ্র উত্তর দিলে, 'আমি এই নশ্বর দেহে দেবত্ব লাভ করতে চেষ্টা করছি।' কিন্তু সে যখন এই কথা বলছে, তখনই রাম তাঁর উজ্জ্বল তরবারি-নিষ্কাশিত করে তার মুণ্ড কেটে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ দেবতারা রামের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করলেন, তাঁর এই কর্মের প্রশংসা করলেন এবং বললেন রাম দৈবকার্য সাধিত করেছেন। তাঁরা তাকে বর দিতে চাইলেন, তাই দিয়ে রাম ব্রাহ্মণ কুমারকে বাঁচিয়ে তুললেন।

রামায়ণ-এর অন্তিম সংযোজন সম্পূর্ণ হওয়ার প্রায় দুই শতাব্দী পরে কালিদাস তাঁর রঘুবংশ-তে এই ইতিবৃত্ত তুলে নিলেন। সেখানে পঞ্চদশ সর্গে(৫০-৫৫ শ্লোকে) আমরা এই উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই। কালিদাস বাল্মীকির মূল ইতিবৃত্ত থেকে ব্যতিক্রম ঘটাতে সাহস পাননি এবং তার সামাজিক মূল্যবোধ মূলত বাল্মীকির সঙ্গে একই ছিল, কারণ তিনি রঘুবংশ রচনা করেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মাণ্য পুনরুত্থানের যুগে। তিনি রঘুবংশের প্রতিষ্ঠাতাকে প্রশংসা করেছেন, 'যাঁর প্রজারা মনুর বিধান থেকে রেখামাত্রও সরে যায়নি।' (১ম সর্গ, ১৭শ শ্লোক)

কিন্তু ধার্মিক শূদ্রের এই তাৎক্ষণিক বধের বিষয়ে তাঁর ভিতরের কবি স্বস্তিবোধ করেননি। রামের কাজটি সমর্থন করা ছাড়া তার কোনও উপায় ছিল না, কারণ, বাল্মীকিও তাই করেছেন, কিন্তু তিনি যা করতে পারতেন এবং করেওছেন, তা হল একটি মর্মস্পর্শী চিত্রকল্পের মাধ্যমে তাঁর কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ। রাম শম্বুকের কন্ঠ থেকে তার সেই মুখখানা বিচ্যুত করলেন, যা হেমাঙ্গ পরাগবিশিষ্ট পদ্মের মতো, তার প্রান্ত দেবতার শ্মশ্রু, তাতে যেন উজ্জ্বল বিন্দু কুলে আছে।' (১৫:৫২)। মৃত্যুর ফলে শূদ্র ধামিকদের স্থান পেল; কঠোর তপস্যাতেও সে তার নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি, কালিদাস খুব সূক্ষ্ম ভাবে বাল্মীকির বর্ণগ্রন্থ উপাখ্যান আগে বিচার করেছেন, বিধ্বস্ত পরাগযুক্ত পদ্মের কোমল চিত্রকল্প দিয়ে এবং শ্মশ্রীর প্রান্তদেশ উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করে। তারপরে তিনি শম্বুকের সামাজিক কলঙ্ক দূর করেন, ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ায় তাকে ধামিকদের স্থান প্রাপ্ত করিয়ে।

প্রায় তিন শতাব্দী পরে ভবভূতি একই কাহিনি তুলে নিলেন তাঁর উত্তর রামচরিত-এর দ্বিতীয় অঙ্কে। তিনি দ্রুত প্রথম অংশটির উপর আচ্ছাদন ফেলে রামকে দিয়ে বলান, তার মতো নির্ধুর ব্যক্তি, যিনি স্নেহময়ী, নিষ্পাপ

পন্নীকে গৃহচ্যুত করেছেন, তার পক্ষে হতভাগ্য শূদ্রকে বধ করা তুচ্ছ ব্যাপার। তারপর এক দৈবী মূর্তি মঞ্চে প্রবেশ করে নিজেকে শম্বুক বলে পরিচয় দেয়; রামের হাতে মৃত্যু তাকে দৈব তেজ দিয়েছে।

রাম শম্বুককে আশীর্বাদ করেন, 'বৈভ্রাজ নামে তেজোময় লোক, যেখানে ধার্মিকতা থেকে উৎসারিত হয় আনন্দ ও উল্লাস, তা চিরদিন তোমার হোক।' আমরা লক্ষ্য করি, এই আশীর্বাদ শ্লোকের প্রথম পাদ সরাসরি ঋগ্বেদ (৯:১১৫:১১) থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, যেখানে তাদের কাল্পনিক লোকে সোমপায়ীদের ভোগের বর্ণনা আছে। রাম শূদ্র শম্বুকের জন্য স্বর্গভোগ কামনা করেছেন, যে শূদ্রকে তিনি নির্মম ভাবে হত্যা করেছেন—বাল্মীকির বর্ণনা অনুযায়ী স্বয়ং দেবতারা তার যে কাজের প্রশংসা করেছেন। কালিদাস শূদ্রকে আশীর্বাদ করেছেন, বরপ্রাপ্তদের লোকে পৌঁছেদিতে চেয়েছেন। ভবভূতি সেই আশীর্বাদ কর্যে পরিণত করেছেন এবং শূদ্রকে অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ থেকে মুক্ত করেছেন।

এই থেকেই প্রকাশ পায় একটি স্বীকৃত ও উত্তরাধিকারের লক্ষ উপাখ্যানের পরই কবিদের চিন্তাধারার পরিবর্তন; যে নতুন স্ব তাঁরা উপস্থাপিত করেছেন, তা কবিদের ব্যক্তিগত সহানুভূতিরই সাক্ষ্য বহন করে, শূদ্রের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনও নমনীয়তার প্রমাণ নয়। কালিদাস ও ভবভূতির মাঝামাঝি সময়ে রচিত পুরাণগুলিতে, এমনকী তার পরে রচিত যেগুলি তাতেও, শূদ্রের প্রতি ক্রমশ দৃষ্টিভঙ্গির কঠোরতাই ধীরে ধীরে প্রতিফলিত হয়। তার একমাত্র কর্তব্য হল অপর তিন বর্ণের সেবা করা, তার অধিকার শাস্ত্রগত ভাবে ক্রমশই খারিজ করা হচ্ছে এবং তাকে উত্তরোত্তর সমাজের শত্রু হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কলিযুগে শূদ্র তার স্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘন করবে, আরও বেশি সামাজিক সম্মান লাভ করবে, এবং সমাজের অন্যান্য অংশের উপর কর্তৃত্ব করার ভান করবে। সে গুরুতর ধর্মসঙ্কট ও সমাজের সত্যকার বিপদ হওয়ার পথে চলেছে।

দুই

এই ব্যাপার যে ঘটছে, তার একটি প্রমাণ হল, তথাকথিত অপকর্মের নিয়ম, যেগুলি অনুসারে শূদ্র আপংকালে উচ্চতর তিন বর্ণের কিছু কিছু জীবিকা অবলম্বন করতে পারে। বলাই বাহুল্য, পুরাণের এই অংশগুলি বাস্তবে যা ঘটছে তারই সমর্থন ও গ্রহণের জন্য কল্পিত; কোনও কোনও শ্রেণির শূদ্র কিছু শিক্ষা পেয়েছে, কিছু ধন সঞ্চয় করেছে, সমাজে অস্বীকৃত সম্মান লাভ করেছে। এই উন্নতিশীল শ্রেণির শূদ্রকে বলা হত সচ্ছদ্র (সচ্ছদ্রৌগোপনাপিতৌ)। মনু তাকে বলেছেন পতিত বৈশ্যের সন্তান (১০:২২); যাঁজবন্ধ্য বলেছেন, সে বৈশ্য মাতা ও শূদ্র পিতার সন্তান (১:৯২); মহাভারত-এর আদিপর্বে বলা হয়েছে, তার পিতা ক্ষত্রিয় ও মাতা বৈশ্য, জীবিকার দিক দিয়ে করণ হল লেখক। বৃহদ্রম পুরাণ-এ বলা হয়েছে, কিরণ চিরদিন শ্রীযুক্ত হোক। সে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে ও আচরণ করে; সে রাজকার্যে নিযুক্ত এবং নীতিজ্ঞ। সে ব্রাহ্মণ ও দেবতার প্রতি ভক্তিমান। সচ্ছদ্র নিঃসন্দেহে এমন হবে। সে ব্রাহ্মণ ও দেবতার আরাধনায় রত। সচ্ছদ্রের লক্ষণ অমাৎসর্য এবং সুশীলতা। (৪)

বর্ণনায় কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: কারণের সম্পত্তি (শ্রী) আছে, কিন্তু তার আচরণ বিনীত, সে ব্রাহ্মণ ও দেবগণের প্রতি ভক্তিমান; কোনও করণিকস্তরে সে রাজকর্মচারী। যেহেতু সে লিখতে পারে এবং তার কাজ তাকে রাজ্যসভার সল্লিকটে নিয়ে যায়, তার ভাগ্যে অবশ্যই অভিশিক্ত রাজকীয় প্রসাদ জোটে, যার সঙ্গে কিছু সামাজিক সম্মান যুক্ত থাকতে পারে। এই শ্লোকের তাৎপর্য

হল, সম্ভ্র দরিদ্র ও সমাজে শক্তিহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সত্যকারের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-এর একটি পাঠে এর সমর্থন পাওয়া যায়। একটি অংশে বলা হয়েছে, নরমেধ যজ্ঞে অশ্বমেধযজ্ঞের অর্ধেক পুণ্য হয়। (প্রকৃতিখণ্ড ২৭:১২০) দুর্গার উদ্দেশ্যে 'একটি মায়াতি', একটি মহিষ, একটি ছাগ এবং একটি সুলক্ষণ মেষ নিবেদন করা উচিত। তাঁর উদ্দেশ্যে মায়াতি নিবেদন করলে দুর্গা সহস্রবর্ষপ্রসন্ন থাকেন। (প্রাগুক্ত ৫৫:৯১, ৯২), 'শোনো, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, মায়াতির (এই) লক্ষণ; এগুলি অথর্ববেদ, অনুসারে; এর অবহেলা হলে সব সুফল বিনষ্ট হয়। এক তরুণ পিতৃমাতৃহীন (যুবক), স্বাস্থ্যবান, প্রসন্নভাবে, বিবাহিত এবং সঙ্গের অজারজ সন্তান, দীক্ষিত সম্ভ্র, বংশের একমাত্র মূল, এমন (ব্যক্তিকে) প্রকৃত মূল্যের অধিক মূল্য দিয়ে তার বান্ধবদের কাছ থেকে কিনে নিতে হবে। ধার্মিক ব্যক্তি তাকে স্নান করিয়ে বস্ত্র, চন্দন, মালা ও ধূপ দিয়ে পূজা করে একজন চর সঙ্গে দিয়ে (সম্ভবত যাতে সে পালাতে না পারে) এক বৎসরের জন্য বাইরে ঘুরতে পাঠানো হবে (অশ্বমেধের অশ্বের মতো)। এক বৎসর পূর্ণ হলে তাকে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে রাত্ৰিকালে দুর্গার উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে।'(৫)

সুতরাং ছাগ বা মেষের মতো মায়াতিও বলির পশু-সেই ভাবেই তাকে কেনা হয়, স্নান করানো হয়, সাজানো হয়, এক বছর সেই ভাবেই ঘোরানো হয় (অশ্বমেধের অশ্ব তুলনীয়), এবং সেই ভাবেই বলি দেওয়া হয়। উদ্দেশ্যও একই, দেবীর প্রসন্নতা-এ ক্ষেত্রে সহস্রবৎসরের জন্য-যাতে যজমানের পরিবারে বর প্রবাহিত হয়।

কিন্তু এ ছাড়াও এই হতভাগ্য মায়াতি, যার মৃত পিতামাতা বংশ রক্ষার প্রয়োজনে আর সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না, যার নিজের বিধবা পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় পরিত্যক্ত হবে, যেহেতু তার স্বামী মায়াতি হল মূলক অর্থাৎ বংশের শেষ জীবিত পুরুষ, সে স্বাস্থ্যবান, সুতরাং ভাগ্য ভাল হলে যে সুখী, সমৃদ্ধ পরিবার ও একাধিক সন্তান নিয়ে সংসার করতে পারত, যার চারিত্রিক কোনও দোষ নেই, শারীরিক সুস্থতা আছে, কিছু অর্থ ও শিক্ষালাভ করেছে (দ্রষ্টব্য, তার করণের বৃত্তি এবং সভায় তাঁর জীবিকা), এবং সেই কারণে যে কিছু সামাজিক ক্ষমতা ও সম্ভবত কিছু রাজনৈতিক সম্মানেরও অধিকারী—এমন একজন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে জীবনচ্যুত। সমাজের ক্ষমতামালী রাজনীতিবিদদের একটি ভাবী বিপদ এমনি ভাবেই দূর করা হল।

তিন

শঙ্কর উপাখ্যান যে পর পর তিন কবির দ্বারা তিন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে কবিদের মর্মগ্রাহিতারই সাক্ষ্য রয়েছে, স্পষ্ট ভাবেই নিরপরাধ এক শূদ্রের নিষ্ঠুর হত্যার বিষয়ে তাদের অস্বস্তি পরবর্তী দুটি সংস্করণ থেকে প্রমাণিত হয়। অতি কল্পনার দ্বারাও কবিদের সমসাময়িক সমাজের চিত্র বলে একে গ্রহণ করা যায় না। খুব সম্ভব ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী শূদ্রদের এবং নিপীড়িত শ্রেণির উপরে অমানবিক নিষ্ঠুরতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই কবিদের অনুপ্রেরিত করেছিল তাঁদের সৃষ্টিতে সামাজিক কুপ্রথার কিছুটা প্রশমন অথবা তার কতকটা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করতে। উপরন্তু, শিক্ষিত ও সম্পন্ন শূদ্রেরা সমাজের উচ্চতর শ্রেণির চোখে বিপদ, তারাই হয়তো তাদের বিষয় কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কবিরা বুঝেছিলেন, তারা উচ্চতর বর্ণের অনেকের চেয়ে মন্দ নয়।

সপ্তম শতাব্দীতেই বাণভট্ট অসুং চণ্ডালকন্যা ও তার পিতাকে জাতিচ্যুত শবর শিকারীদের এবং অন্যান্য শূদ্র চরিত্রগুলিকে কবিসুলভ যে মর্মস্পর্শিতার সাহায্যে চিত্রিত করেছেন, তা করুণা, মানসিকতা এবং কতকটা সহানুভূতিতেও সজীব। হয়তো তিনিও শিল্পী হিসেবে প্রতিবাদ করেছিলেন ক্রমবর্ধমান বর্ণভেদের অনমনীয়তায় গড়ে ওঠা এক সমাজের, যে সমাজ দ্রুত চলেছে নরমেধ যজ্ঞের দিকে, তার বলি অবদমিত শূদ্র মায়াতি, যে উন্নতিশীল শূদ্রগোষ্ঠীর প্রতিভূ। অন্য সব দিক দিয়ে ভাল, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত এই যুবককে বলির পশুর মতো হত্যা করার যে এই অত্যন্ত অমানবিক আচরণের দৃষ্টান্ত মেলে, তা একদিকে সম্ভাব্য সামাজিক প্রতিস্পর্ধীর ভয়ের দ্বারা প্ররোচিত এবং অন্য দিকে লোভের দ্বারা-রক্তপিপাসু দেবীকে অপর কোনও মানুষ বলি দিয়ে সহস্রবর্ষ প্রসন্ন রাখার লোভ। নরমেধ যজ্ঞ সম্ভবত ঋগ্বেদ রচনার পূর্ব থেকেই বাস্তব, হয়তো খাদ্যাভাবের সময়ে যুদ্ধ বন্দিদের এই দুর্ভাগ্য হত (এবং বন্দিদের শুধু বন্ধনকারীদের স্বল্প খাদ্য থেকেই খাওয়াতে হত)। কিন্তু এর চিহ্ন এবং স্মৃতি সাহিত্যে রয়ে গেছে (দ্রষ্টব্য, শাস্ত্রে উল্লিখিত নরমেধ যজ্ঞ), যা পরবর্তীকালে একটি প্রতীকের পুনরুত্থান ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে এবং তৎকালীন অবদমিত শ্রেণির উন্নতিতে বিপন্ন এক সমাজ যে কত নিম্নস্তরের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রশংসা করে, তাই প্রকাশ করে। মনে পড়ে কলিযুগে শূদ্রদের মানবিক অধিকার ও সম্মান অর্জনের স্পর্ধ যে তাদের দীন ভূমিকা ভুলিয়ে দেবে তার বারে বারে উল্লেখ। এই হল তাহলে বাধা পাওয়ার উপায়: আনুষ্ঠানিক ভাবে এক সাধু পুণ্যবান, স্বাস্থ্যবান, সমর্থ শূদ্রকে হত্যা করে সমাজ শূদ্রকের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সমাধান বাণী শোনাচ্ছে। এমন নির্মম আনুষ্ঠানিক হত্যার কথা মনে হলে শিহরিত হতে হয়, যে হত্যা পরিপূর্ণ ভাবে এবং বারে বারে ঘটলে ক্রমে ক্রমে শূদ্রদের উৎকৃষ্ট ও উচ্চতর গোষ্ঠীর বিনাশ ঘটবে।

নিয়তিবাদ : কারণ ও প্রভাব

প্রকৃত ব্যবহারে নিয়তিবাদের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রায় চল্লিশ বছর আগে। এক সপ্তাহ অনুপস্থিতির পরে আমার পরিচারিকা ফিরে এসে জানোল তার দু বছরের শিশুটির বসন্তরোগে মৃত্যু হয়েছে। যখন প্রশ্ন করলাম তাকে টিকা দেওয়া হয়েছিল। কিনা, সে উদাস বৈরাগ্যের সুরে জানাল যখন 'বসন্তে' মৃত্যুই তার ছেলের 'কপালে' ছিল তখন কোনও টিকাই তার মরণকে আটকাতে পারত না। নিশ্চয়ই তার এই মনোভাব অজ্ঞানতা প্রসূত, কিন্তু আমাকে যা আঘাত করল তা হল তার এই সহজ ভাবে মৃত্যুকে মেনে নেওয়া। আর এই মেনে নেওয়া থেকে সে যে শান্তি আর সান্তনা পেয়েছে সেই তথ্য।

আজ যখন কোনও অজ্ঞ কৃষক কারখানায় তৈরি সার ব্যবহার না করে তার অল্প ফসলকেই মেনে নেয়, তখন সে এই একই নিয়তিবাদী মনোভাব দ্বারা চালিত হয়—'এ বছর সার দিই বা না দিই। ফসল কম হওয়াই কপাল।' যা ক্ষতিকর তা হল, এই প্রকার নিষ্ক্রিয় মনোভাব প্রগতির পথ রোধ করে। সঠিক শিক্ষার সুযোগ আর অর্থনৈতিক সুযোগ দেওয়া হলে কিন্তু আধুনিক কলাকৌশল এবং তার উপকার সম্পর্কে এই বিরোধী মনোভাব অনেকাংশে লোপ পাবে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি প্রাচীন ভারতীয় পুরাকথাতে বলা হয়েছে যে পৃথিবী অবস্থান করে বহুফণায়ুক্ত দিব্য সর্প বাসুকির মস্তকে, তাই বাসুকি' যখন তার ক্লান্ত ফণা থেকে পৃথিবীর ভার অপর ফণায় সরিয়ে নেন তখনই ভূমিকম্প হয়। আর একটি পুরাকথায় বলা হয়েছে যখন দানব রাহু চন্দ্র বা

সূর্যকে গ্রসে করে তখনই গ্রহণ লাগে। প্রাক-বিজ্ঞান যুগের মানুষের এই অনুসন্ধিৎসা তার উৎসাহী এবং কৌতুহলী মনেরই পরিচয়। সে মন তাকে প্রেরণা দিয়েছে প্রাকৃতিক ঘটনা প্রপঞ্চ, যে সব ঘটনা তার নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত, যাকে দেখে মনে হয়, কোনও মহাজাগতিক বিপর্যয়, সেই সব অনুশঙ্গকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে, অনুসন্ধান করতে এবং ব্যাখ্যা করতে। জ্ঞানের মাধ্যমে, অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতি এবং ভূকম্পলিখা যন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ ব্যাখ্যাগুলি অকেজো হয়ে পড়ে; বৈজ্ঞানিক, কারণ-নির্ভর সম্পর্কের তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং আকস্মিক সুযোগ থাকার অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি আর স্বীকার করা হয় না। প্রাক-বিজ্ঞান যুগের কৃষকেরা বৈদিক যুগে শূন্যাসীরীয় যজ্ঞের মাধ্যমে আর পৌরাণিক যুগে 'ক্ষেত্রপূজা' করে ক্ষেত্রের কর্ষণের জন্য দেবতাকে প্রসন্ন করত। এমনকী কৃষির উন্নতির জন্য 'ক্ষেত্রপতি', 'হলধর, ইত্যাদি দেবতাকেও কল্পনা করা হয়েছে। (১) বৈদিক যুগে খরার প্রতিবিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হত কারীরী ইষ্টি, পরবর্তী পুরাণের যুগেও হত নানাবিধ পূজা। অনুরূপ ভাবে ফসল না হওয়ার কারণ হিসাবে মাটিতে বিবিধ রসায়নের ঘাটতিকে খুঁজে দেখা হত না, বরং খোঁজা হত নানা অতিলৌকিক শক্তিকে; যথাযথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাদের প্রসন্ন করা গেলে প্রচুর ফসলে আবার পূজকের ঘর ভরে উঠবে। আদর্শ কৃষি-খামারগুলিতে কৃষকদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সার প্রয়োগে মাটির উৎপাদনশক্তি পুনরায় জীবিত করা যায়, এর ফলে কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে, বহু কৃষক সার কিনতে উৎসাহী হয়েছেন। কিন্তু সেচপ্রণালী, খালের জল আর সারের ব্যবহার—এ সবার জন্যই অর্থের প্রয়োজন। আর তাই কেবলমাত্র শিক্ষার ভূমিকাও একটা সীমারেখাতে এসে থেমে যায়। অতএব যতদিন না দেশে জ্ঞানকে পরিব্যাপ্ত করার মতো সামর্থ্য হচ্ছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাগুলি ব্যবহার করার উপায় সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে না দেওয়া যাচ্ছে—ততদিন নিয়তিবাদ অত্যন্ত দৃঢ় এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে

আত্মবিস্তার করে রাখছে তার মূল অতি গভীরে, ইতিহাসের বহু দূরে প্রোথিত হয়ে রয়েছে।

যদি বিষয়ান্তরে গিয়ে নিয়তিসম্পর্কিত ধারণার উৎপত্তি অনুসন্ধান করি তবে দেখা যায় নিয়তিবাদের উদ্ভব তিনটি মূল কেন্দ্র থেকে— জন্ম, দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু; যার মধ্যে সম্ভবত শেষতমটিই চূড়ান্ত শুরুস্বপূর্ণ। জন্ম অতীতে হয়েছে, মৃত্যু ভবিষ্যতে আসবে। কিন্তু দুর্ঘটনা, যা আমাদের জীবনকে পদে পদে অনুসরণ করে সে তো মানুষের জীবন ধারণার অন্তর্নিহিত যুক্তিবাদ বিষয়ে বিশ্বাসকে বিদ্রম্প করতে থাকে। এ সব ঘটনা তো বর্তমানের তাই এর পীড়নও বেশি। জন্মের সঙ্গে নিয়তির সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। এইখানে যে, শিশু তার পছন্দ মতো পিতামাতা কিংবা তার নিজের চারপাশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশকে বেছে নিতে পারে না। অথচ তাকে সারাজীবন ধরে এই আকস্মিক ঘটনার প্রভাব বিয়ে বেড়াতে হয়, কারণ প্রায়ই এই সব সমাপতনের ফলে তার গতিবিধির সীমা নির্দিষ্ট হয়ে যায় অথবা আকস্মিক ঘটনার ফলে তার উচ্চাশা ব্যাহত হয়। অবশেষে, প্রায় প্রতিটি মৃত্যুতেই, অপূর্ণ স্বপ্ন আর অসমাপ্ত কাজের দীর্ঘ তালিকা যেন এক নির্ধুর অকাল সমাপ্তির কথা বয়ে আনে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; যদিও যুক্তি আর বুদ্ধি তাকে প্রণোদিত করে সযত্নে নিজের জীবনের পরিকল্পনা সাজাতে আর সেই কল্পনা অনুসারে কাজ করতে। তবুও দুর্ঘটনা, ব্যাধি, দুর্ভাগ্য আর প্রিয়জন বিয়োগ অপ্রত্যাশিত ভাবে তার পরিকল্পনা বিনষ্ট করে দেয়, আর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে এই সবার উপর যবনিকা টেনে দেয়। অধিকাংশ মৃত্যুই বোধহীন মনে হয়, আর জীবন কখনওই মৃত্যুকে, অস্তিত্বে চরম নঞর্থকতাকে মেনে নিতে পারে না। তাই মৃত্যুতে মানুষকে দুর্ঘটনা আর আকস্মিকতাকে মেনোনিতে হয়, যখন সে এর সংস্পর্শে আসে তখন সে যে ভাষা ব্যবহার করে

তা হল একে 'ভাগ্য' এই সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট করা। কারণ, অত্যন্ত বাস্তব অর্থেই এই সব দুর্ঘটনা মানবীয় প্রচেষ্টাকে যেন বিদ্রুপ করে।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে, অধিকাংশ পুরাকথাতেই অসংখ্য নামে ময়রা'র অস্তিত্ব রয়েছে। নিয়তিবাদ একটি বহু প্রাচীন ধারণা; ময়রা' প্রাচীন দেবী এবং ক্রীট অঞ্চলের লিনিয়ার বি লেখসমূহে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকেই 'এরিনিস'-এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গ্রিস দেশে ডেমোক্রিটাস এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, জীবনের একটি সংগত ব্যাখ্যা হল অণু-বাদ। কিন্তু সেই ইউডেমোনিয়া বা হাগেন ও মানুষের আয়ত্তেই ছিল; এবং ডাইওজিনিস লেয়টিয়াস বলেছিলেন যুক্তি, ভাগ্য, হাইমারমেনে এবং জেউসের সঙ্গে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। বিধাতার ধারণা ঈশ্বর পৃথক এবং ক্লিনথিয়াস বলেছেন যদিও বিধাতার হাত ধরে যা কিছু আসে সবই ভাগ্যনির্ধারিত তবু এর বৈপরীত্য ঘটে না। অর্থাৎ যা কিছু ভাগ্যনির্ধারিত সবই কিন্তু বিধিনির্দিষ্ট নয়। (২) এই মতবাদ ভাগ্যের মঙ্গলময় ও অমঙ্গলকারী দুটি বিধানকে আলাদা করে দেখায়। নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী সমস্যাটি হল স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা। ক্রিসিগাসাস উভয়ের সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ সফল হননি। ভারতীয় সাহিত্যেও সম্পূর্ণ পূর্বনির্ধারিত রূপে নিয়তিকে একক একটি ছাঁদে ফেলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কখনও তাকে মানুষী প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে কখনও কখনও প্রচেষ্টাকে নিয়তির সহায়ক বলা হয়েছে। এই ভাবে আমরা উত্তরবৈদিক সাহিত্যেও দেখি, কিছু কিছু রচনা যেখানে নিয়তির সঙ্গে পুরুষকার অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার প্রতি স্পর্ধা বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে এই মনোভাব আরও সুস্পষ্ট ভাবে দৃঢ় ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সিসেরো'র ডিফলতো-তে; এখানে নিয়তিবাদকে বর্ণনা করা হয়েছে নৈতিক ভাবে পলায়নপর মনোভাব রূপে। নিয়তির বিধান আর স্বাধীন ইচ্ছা এই উভয় বিষয়ে, ভারতীয় সাহিত্যে একটি সরব দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা যায়।

নিয়তির বিভিন্ন রূপকে বিভিন্ন মহিমাম্বিত সংজ্ঞায় ভূষিত করা হয়েছে, যেমন 'ময়রা', 'হাইমরমেনে আতে', 'এরেনিস', 'নিকে', 'নেমেসিস' এবং এই রকম বহু নাম। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবকল্পনা ময়রা', মৃত্যুর সঙ্গে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অন্য দিকে জন্মের সঙ্গেও তার সংযোগ রয়েছে। যে জন্ম জীবনের অপর প্রান্তসীমায় অবস্থিত, যা সম্পূর্ণভাবে মানুষের নিয়ন্ত্রণ রেখার বাইরে। ইলিয়াড কাব্যে ময়রার প্রাচীনতম উল্লেখ পাচ্ছি, সেখানেই সে নিয়তিনির্দিষ্ট মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত অবস্থা আর মানবিক শক্তির নৈতিক দায়িত্ব, উভয়ের মধ্যে যে সংঘাত তা সুস্পষ্ট হয়ে যায় ওডিসি কাব্যে, যখন জেউস বলেন যে মানুষ ভাগ্য বা দৈব নিয়ন্ত্রণের নামে যে দোষ দেয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, প্রকৃতপক্ষে সে তার নিজের কার্যকলাপের ফল ভোগ করে।'(৩)

ভারতের প্রাচীনতম ধর্মমূলক সাহিত্য ঋগ্বেদ-এ অবশ্য নিয়তিবাদের কোনও উল্লেখ নেই। এ গ্রন্থ এক যুদ্ধপ্রিয় কর্মোদ্যোগী জনগোষ্ঠীর বিবরণী, যারা দৈব বা নিয়তির পরিবর্তে শক্তি আর মানুষী প্রচেষ্টা দিয়ে অর্থাৎ পুরুষকার দিয়ে বহু উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করেছিল। এমনকী অন্যান্য সংহিতা আর ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিও নিয়তিবাদী নয়। অতিলৌকিক শক্তিসমূহ অর্থাৎ দেবতারা এই সব গ্রন্থে বিজয়ী আর্ষদের সপক্ষে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করতে যত্ন করেছেন, আর আর্ষরা তাঁদের স্তুতি করেছে। প্রশংসা করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করেছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে প্রতিটি দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং সংকটময় পরিস্থিতির উপযুক্ত যজ্ঞের কথা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরবর্তীকালে দর্শনের যে শাখার উৎপত্তি যজ্ঞীয় ধর্মবিধির প্রয়োজনে, সেই জৈমিনির পূর্বমীমাংসা গ্রন্থে এই সত্য স্বীকার করা হয়েছে যে যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে অপূর্ব বা অলৌকিক শক্তিবিশেষ উৎপাদিত হয়, যার সাহায্যে প্রার্থিত উদ্দেশ্যসাধন করা যায়। এই ভাবে যজ্ঞ আর তার ফল, উভয়ের অন্তর্ভুক্তি যে মাধ্যম। সেখানেই এক অদৃশ্য শক্তির ধারণা বর্তমান

রয়েছে—যে শক্তি, পূর্বকালে দেবতারা যা সম্পাদন করেছেন তাও সম্পন্ন করতে পারে। এই শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা বহির্ভূত বলা যায় না, তবে কী ভাবে যথাবিধি যজ্ঞ নিম্পন্ন হচ্ছে তার সঙ্গেই এই শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থে এই অপূর্ব-কে দেবতাদেরও অতিক্রমকারী শক্তি বলা যায়, এ এক বিমূর্ত অজ্ঞেয় শক্তি যা প্রকৃতপক্ষে দেবতা নিরপেক্ষ ভাবেই কাজ করে। পরবর্তীকালের নিয়তিবাদের বীজ এখানেই নিহিত, যদিও এখন পর্যন্ত এটি ব্যাখ্যাযোগ্য এবং পূর্ব-নির্ধারণযোগ্য।

আরণ্যক এবং উপনিষদ গ্রন্থাবলিতেও যথাযথ ভাবে নিয়তিবাদের কোনও ধারণা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়নি। দৈব নিয়তি, ভাগ্য, কৃতান্ত, বিধিলিপি, ললাটলিখন, প্রভৃতি শব্দ এখনও অজ্ঞাত, কিন্তু বাস্তবত এই সাহিত্যে নিয়তিবাদবিষয়ক ধারণার একটি অত্যাবশ্যক উপাদান বিদ্যমান। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় পৃথিবীতে গ্রিস, রোম, চিন থেকে ইরান এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। ভারতবর্ষে এই সময় বিভিন্ন তপস্বী সম্প্রদায় যথা জৈন, আজীবিক এবং বৌদ্ধদের উদ্ভব হয়; এমন আরও বহু মতবাদের অস্তিত্ব ছিল, বুদ্ধ যাদের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হন এবং প্রাচীন পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে যে সব অগণিত যোগীদের উল্লেখ আছে। দেশ তখন বিবিধ মতবাদ সমন্বিত তপস্বীর দলে পূর্ণ ছিল। সনাতন বৈদিক ধর্ম থেকে তাদের পার্থক্যের মূল কারণ ছিল বেদ ও যজ্ঞবিধিতে তাদের অবিশ্বাস। মুগুক উপনিষদ-এর প্রাচীন গ্রন্থেও আমরা শুনি যে যজ্ঞ হল অনির্ভরযোগ্য তরণী।

কিন্তু এই মনোভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই দেশের ধর্মীয় বাতাবরণে কিছু ঘটনা ঘটেছিল। লৌহ-হলমুখের প্রবর্তনের ফলে, বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ড কর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছিল। ইটের কাঠামো গড়ে তোলার মতো বাস্তুবিদ্যার জ্ঞান প্রচলিত হয়েছিল, তাই ভবিষ্যৎ দুদিনের অপেক্ষায় অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয় করা সম্ভব

হচ্ছিল। আর্থ-আগমনের পরবর্তী কয়েক শতক-ব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার পরে, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরায় শুরু হয়েছিল, ফলে খাদ্যের উদ্ধৃতি এবং কুটিরশিল্পের সম্ভার সমাজের শীর্ষস্থিত কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সব মানুষ কৃষক ও শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানকে নিম্নতমহারে বেঁধে দিয়ে তাদের শ্রমিকে কাজে লাগাত। বর্ষপঞ্জির হিসাব পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে, কৃষিকাজ অনেকাংশে নিশ্চিত ভাবে করা সম্ভব হয়েছিল। এবং, যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বন্যা, খরা, পঙ্গপাল, ইত্যাদির উৎপাত বাদ দিলে কৃষিতে উৎপাদিত ফসল অনেকটাই নিশ্চিত ছিল। রেশম সড়ক অনুসরণ করে বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল এশিয়ার অন্যান্য অংশে এবং মুদ্রার প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবহার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যবিধি অনেকাংশে নিরাপদ ভিত্তি পেয়েছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই সবের ফলে প্রত্যক্ষ উপকৃত হয়েছিলেন ধনী, বণিক, বৈশ্য ও ঋত্রিয়েরা আর পরোক্ষ ভাবে ব্রাহ্মণের। এবং এর ফলে প্রত্যক্ষ ভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল এক বৃহত্তর জনসংখ্যা, যারা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদক: দরিদ্র, বৈশ্য, চাষি আর অগণ্য শূদ্র। তাদের পক্ষে জীবন হয়ে দাঁড়াল প্রকৃত অর্থে এক অভিশাপ। তাদের জন্য এক ধর্মতত্ত্ব প্রতি-উদ্ভাবন করা হল, যেখানে বলা হল জীবন এক অবিমিশ্রিত অভিশাপ, যেখান থেকে সকলেরই মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। পূর্ববর্তীকালে ঋগ্বেদ-এ যে মনোভাব দেখা গিয়েছিল, যেখানে জীবনকে বলা হয়েছে মধুর এক প্রার্থিত বস্তু, একে কামনা করা হয়েছে। এর দীর্ঘস্থায়িত্ব উপভোগ করতে চাওয়া হয়েছে পূর্ণভাবে, এখন দেখা গেল তার চরম বৈপরীত্য এখানে জীবনকে বলা হল অশুভ এক শৃঙ্খল যা পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, চরম শান্তি ও মোক্ষলাভের আগে মানুষকে তার থেকে মুক্তি পেতে হবে।

কর্মবাদের তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি কর্মের একটি সমান এবং আনুপাতিক ফল উৎপন্ন হয়। যা ইহজন্মে অথবা পরজন্মে ভোগ করতে হয়—তা ভাল মন্দ যাই হোক, এই তত্ত্ব বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল জন্মান্তরবাদের। সম্ভবত জীবনের

অসঙ্গতিগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য মানুষ আজ পর্যন্ত যে সব সমাধান চিন্তা করেছে এটিই তার মধ্যে চতুরতম; সেদিনেও এই মতবাদ উল্লেখযোগ্য ভাবে সার্থক হয়েছিল এবং আজকের দিনেও এই মত সার্থক।

বহু যোগী গোষ্ঠী এই 'কর্মফল্যবাদ-কে নাকচ করেছেন এই বলে যে সংকর্ম এক প্রকার উপলব্ধি নিয়ে আসে যা মোক্ষলাভের সহায়ক; কেউ কেউ, যেমন আজীবিকরা মনে করেছিলেন মানুষ যে কমই করুক না কেন, চুরাশি লক্ষ জন্মের পর মোক্ষ অবশ্যই আসবে অথবা আসবে না। যাই হোক, প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলি কর্ম ও জন্মান্তরিবাদের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল। এই সময়ের কাছাকাছি, স্বর্গ ও নরকের তত্ত্বও দ্রুত বর্ধিত হয়েছিল যার ফলে পদানত নিম্নবর্গের ভবিষ্যৎ-চিন্তা হয়েছিল আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন। ধনীরা লক্ষণীয় ভোগময় জীবনের প্রক্ষেপণ ছিল স্বর্গের দৃশ্য, যা সমসাময়িক নূতন সমৃদ্ধির সহগামীরূপে কল্পিত হয়েছিল। অপরপক্ষে নরক ছিল সেই সব অত্যাচার কুঠুরির দৃশ্য প্রক্ষেপণ, যেখানে নূতন সব শক্তির অধিকারী শাসকবৃন্দ সামাজিক ও রাজনৈতিক অপরাধীদের নিষ্ফেপ করতেন। উভয়প্রকার কল্পনার মূলেই ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা-ফলে মানুষের কল্পনার উপর এর সবল নিয়ন্ত্রণ থাকত।

যদিও তত্ত্বগত ভাবে মানুষই তার নিজ ভাগ্যের রূপকার, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে তার পরিবেশের শিকার এবং সে নিজেকে বিশেষ বিশেষ বন্ধনে শৃঙ্খলিত বলেই অনুভব করেছে যে শৃঙ্খল তার ইচ্ছাকে প্রায়ই স্বাধীনতা দিত না। মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা, আর বস্তুগত প্রয়োজনের চাহিদা তার বাস্তব জীবনে খুব বেশি স্বাধীন নির্বাচনের সুযোগ রাখত না। সাধারণ মানুষের কাছে জীবন সত্যই ছিল এক অভিশাপ। তাই বর্তমান জীবনের অগ্রীতিকর অবস্থার পুনরাবৃত্তি রোধ করে। পরবর্তী জীবনে অপেক্ষাকৃত উন্নতির মুখ দেখার জন্য মানুষ সব কিছুই করতে রাজি থাকত।

এখানে আমরা আরও মনে করতে পারি যে উত্তরবৈদিক যুগের শেষাংশে, অর্থাৎ সংহিতা সমূহের প্রামাণ্য সংকলনে যখন অথর্ববেদ-এর স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্ত ঘটেছিল তখন ধর্মের ক্ষেত্রে মূল ধর্মধারা ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, ইত্যাদি প্রতিবাদী ধর্মগোষ্ঠী এই প্রত্যন্ত ধর্ম ধারাকে অধিকতর সুস্পষ্ট, কুণ্ঠাহীন ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এমনকী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে অথর্ববেদ, পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সমূহের মধ্যে কিছু কিছু উপাদান দেখা যায়, যেখানে ওঝাদের জাদু আর ঝাড়ফুক প্রাস্তিক ধর্মধারার এক বলিষ্ঠ পুনরুত্থানের সংকেত পেয়েছে। মূলত প্রাণবাদী জগৎ তত্ত্বে বিশ্বাসী এই ধর্মধারার মতে মানুষের চারদিকে আছে আত্মা, যক্ষ, দানব, দৈত্য, পরী, ইত্যাদি। এই সব অধিষ্ঠাত্রী আত্মা সহজেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং একবার ক্ষিপ্ত হলে তারা ঋমাহীন ভাবে প্রতিশোধ নিতে থাকে। সুতরাং পবিত্র ভাবে জীবনযাপন করা দ্বিগুণ ভাবে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। যদি কেউ তার নিজস্ব বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করে যায় এবং দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে চলার আশ্রয় চেষ্টাও করে। তবু সহজেই সে এই সব অতিলৌকিক আত্মা, প্রভৃতির খেয়ালখুশির বা আক্রমণের শিকার হতে পারে। এই ভাবে অবাঞ্ছিত ভাবেও মানুষ তার চারিদিকে শক্তিমান অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ করে বসতে পারে। তাই জীবন মানুষের কাছে এক অন্তহীন দুঃখ। তার এই দুর্দশার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ধর্মতত্ত্ববিদরা একটি মার্জিত তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। যে, মানুষ তার পূর্বজন্মের স্বকৃত কর্মেরই ফল ভোগ করে থাকে। স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হল এই যে, পরবর্তী জীবনে অনুরূপ দুঃখকে এড়িয়ে চলার জন্য মানুষ অন্যপরাধী হয়ে জীবনযাপন করবে। এবং ভারতবর্ষে যেমন অন্যান্য দেশেও অপরাধ শূন্য ভাবে বেঁচে থাকার অর্থ হল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অনুশাসকদের কোনও রূপ বিরক্তি উৎপাদন না করা। সাধারণ মানুষ তার নিজের কোনও কৃতকর্মকে যখনই ফলের সঙ্গে মেলাতে না পারে, তখনই তার নাম দেয় 'অ-দৃষ্ট'— যাকে দেখা যায় না, অর্থাৎ নিয়তি। এই ভাবে জানা

এবং অজানা শক্তিগুলির সন্তোষ বিধান করা তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, সে ভাগ্যের চরম আধিপত্যকে স্বীকার করে নেয়।

পরবর্তী যুগের বেদাঙ্গ সাহিত্যে ভাগ্যকে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; জীবনের অসংখ্য দুঃখের আকারে এই ভাগ্যের নানা প্রতিমূর্তিকে গণনা করা হয়েছে; এবং এর বিরূপতাকে প্রশমিত করার জন্য নানা গৌণ নূতন নূতন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক প্রকার সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়েছে—এটা 'প্রায়শ্চিত্ত'—সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত অপরাধের জন্য, সুস্পষ্ট ভাবে সীমারেখা লঙ্ঘন করা বা ছোটখাট অনুষ্ঠানগত ত্রুটি বা শৈথিল্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত। বেদাঙ্গ সাহিত্যের শেষ ভাগে আর একটি সহায়ক সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল, তা হল শ্রাদ্ধকল্প এবং 'প্রেতকল্প, এখানে মৃত পূর্বপুরুষদের পরলোকে উন্নীত করার জন্য বিধিনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সব আনুষঙ্গিক শাস্ত্র এই জন্যই গড়ে উঠেছিল যে, অস্ত্যেষ্টি ও শাবানুগমন সংক্রান্ত এই সব অনুষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য ছিল মৃত আত্মার সুখ নিশ্চিত করা এবং এই সব অনুষ্ঠান ও তার ফলসমূহ পরলোকের অজানাকে স্পর্শ করতে চায়; সুতরাং এখানে অজ্ঞ জনসাধারণকে কিছুটা জোর করেই যেন ভাবতে বাধ্য করা হচ্ছে যে যদি এই সব অনুষ্ঠান যথাযথ পালন না করা হয় তবে তাদের প্রিয়জন পরলোকে কষ্ট পাবে। সমাজে প্রচলিত নিয়তিবাদী ধারণার এটি অন্যতম ফল।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, এই যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যে অপরাধী সেই কিন্তু সন্তোষবিধায়ক ব্যক্তি নয়; সুতরাং মৃত স্বজনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পানভোজনের মতোই এই সন্তোষবিধান কল্পনালব্ধ বা পরোক্ষ। স্বজনবিরোগে কাতর জীবিত আত্মীয় এখানে তার মৃত প্রিয়জনের সেবা করতে পেরে সন্তুষ্ট হন এবং অনুষ্ঠানকারী পুরোহিতের পক্ষে এখানে যথেষ্ট দক্ষিণা পাওয়া সম্ভব হয়। পুরাণগুলিতে যে শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে

পুরোহিতদের যথাযথ দক্ষিণা প্রাপ্তির এবং তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদির গুণ ও পরিমাণ বিষয়ে যে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা কেবল আকস্মিক নয়। এই ভাবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অজানা ভয়কে কাজে লাগিয়ে পুরোহিতেরা নিজের ভাগ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতেন আর সাধারণ মানুষের ধর্মাচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই ভাবে মৃত ব্যক্তি নয়, পরলোকে মৃত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে জীবিতের উদ্বিগ্নকেই কাজে লাগানো হয়েছিল, এবং অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ অবস্থানের সম্পর্কিত চিন্তাই সমাজ থেকে তার প্রাপ্য নিষ্কাশন করে নিত। (৪)

মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে, লোকপ্রিয় এই সব শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক নূতন স্তরে, হিন্দুধর্মের চরম গঠনমূলক স্তরে প্রবেশ করি। ইতোমধ্যে, বৈদিকযুগের যজ্ঞনির্ভর ধর্ম থেকে সমাজ বহু দূরে সরে এসেছে। যদিও রাজা এবং ধনবান পৃষ্ঠপোষকরা তখনও যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন, তবুও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই জনসাধারণ এই সব যজ্ঞমূলক ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিরপেক্ষ দর্শকের পর্যায়ে নেমে এসেছিল, কারণ এই সব যজ্ঞব্যয়ের ভার বহন করা যেমন তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তেমনই এগুলি ছিল দুর্বোধ্য। কৌমগত সমাজবিধি ভেঙে যাওয়ার ফলে প্রাচীন ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল; মুখ্য সমষ্টিগত যজ্ঞগুলি হত রাজাদের ও সমাজ প্রধানদের জন্য এবং তাঁদের দ্বারাই এগুলি অনুষ্ঠিত হত। গুপ্ত আধ্যাত্ম রহস্যের জ্ঞান-যোগে মোক্ষলাভ-উপনিষদের এই মতবাদ ছিল সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং তাদের আশ্রয়যোগ্য মতবাদ অতি অল্পই ছিল; এই শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এল মহাকাব্য পুরাণের যুগের প্রকাশমান ধর্মযার নাম হিন্দু ধর্ম। এই ধর্ম তার মূলভিত্তি করে গ্রহণ করেছিল কর্মফল ও জন্মান্তরিবাদের তত্ত্বকে।

সাধারণলোকের মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় তত্ত্বকে ফলপ্রসূ ভাবে প্রচারের জন্য মহাকাব্য ও পুরাণগুলি, পুরাকথা কিংবদন্তী ও নানাবিধ আকর্ষণীয় গল্পের অবতারণা করেছিল। মহাভারত থেকে নেওয়া এমন একটি গল্পকে বিচার করা যাক (ত্রয়োদশ-১):

‘গৌতমীর পুত্র সর্পাঘাতেমারা গেল। সে তার সন্তানের অকালমৃত্যুর জন্য সাপকে দোষারোপ করল। সাপ তা অস্বীকার করল এই বলে যে ওই বালকের সময় পূর্ণ হয়েছিল, অতএব দোষ কালের। কাল শব্দের অর্থসময় এবং মৃত্যু উভয়ই। অভিযুক্ত হয়ে কাল তখন বললেন তিনি নিমিত্তমাত্র, বালকের পূর্বজন্মার্জিত নিজকর্মই তার মৃত্যুর সময় ও উপায় নির্ধারণ করেছে।’

সুতরাং চরম বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের নিজ কর্মই তার জন্ম ও মৃত্যুর কারণস্বরূপ। কাল, অন্তক, যম এদের সবাইকেই, ভিন্ন ভিন্ন অংশে বলা হয়েছে ধর্মরাজ। (৫) অর্থপূর্ণভাবেই এই যুগে দেখা যায়, এই সব কল্পিত শক্তির কাছে দেবতারাও নতিস্বীকার করছেন। উদাহরণরূপে বলা যায়। ভবিষ্য পুরাণ-এ দেখা যাচ্ছে বিষ্ণু, কালের আঙুঠাবহ রূপে কাজ করছেন। (৬) এক কথায় কাল এবং অন্তক রূপে যম হয়ে দাঁড়িয়েছেন ন্যায়বিচার ও পাপের শাস্তি বিধানের প্রতিভূ। (৭) কিন্তু মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে যে অনির্দেশ্য ক্ষমতা তা মৃত্যু নয়, নিয়তি; মূল ধর্মধারা এবং প্রান্তিক ধর্মধারা উভয়ই একে সে ভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। মহাকাব্য ও পুরাণে গল্পের পর গল্প এই নিয়তির অনির্দেশ্যতা ও অনিবার্যতার কথা শুনিয়েছে।

আলোচ্য সময়ে রচিত বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলিতে, বিশেষ করে জাতক ও অবদানশতক-এ, পুনর্জন্মের বহু কাহিনি দেখা যায় যেখানে কোনও ব্যক্তিকে তার ইহজন্মের কাজের ফল হিসাবে পরজন্মে উন্নত বা অধোগামী অবস্থায় জন্ম নিয়ে পুরস্কার বা শাস্তিভোগ করতে হয়েছে। মহাকাব্যগুলিও এই প্রকার

বিবরণে পূর্ণ। মুখ্য চরিত্রগুলির বিষয়ই হোক আর গৌণ চরিত্রের বিষয়েই হোক কেবল কর্মফলবাদের তত্ত্বই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যাই হোক কর্মফলের মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ফল আছে, অস্পষ্ট ভাবে হলেও একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এ বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া যায়। সুতরাং একে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়তির সমান সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কিন্তু আবশ্যিক ভাবে এটি নিয়তিবাদেরই জন্ম দেয়। এটা কী ভাবে হয়?

কর্মফলবাদের তত্ত্ব এই বিধান দেয় যে, প্রতিটি কাজের একটি সমান বা সামঞ্জস্যপূর্ণ ফল পাওয়া যায়—সে ফল ভাল হতে পারে, মন্দও হতে পারে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সেটি এ জন্মে অথবা পরজন্মে ভোগ করেন। কিন্তু কখনওই এই মতবাদে কোনও বুদ্ধিমান বিচারক বা নিয়ন্ত্রার অস্তিত্বের স্বীকৃত নেই যিনি স্থির করবেন কোন কাজের কী ফল হতে পারে। (৮) বৌদ্ধ, জৈনশাস্ত্রে, ব্রাহ্মণ্য মহাকাব্য ও পুরাণে কাহিনির পর কাহিনিতে বর্ণনা করা হয়েছে কর্ম ও তার ফলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কল্পিত কারণাত্মক বন্ধনের কথা। এই সব গল্পে কল্পনা ও আবিষ্কার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে গুণ যথাযথ সমানদর্শিতা বা অবিকল। প্রতিরূপের বিকল্প নয়, যা থাকলে এই কর্মফলবাদ যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারত। এই সব গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায়। এই তত্ত্বে প্রচুর অসংগতি এবং বৈষম্য রয়েছে, কারণ প্রায়ই দেখা যায় একই ধরনের কাজে বিভিন্ন ফল হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সম্ভবত বৌদ্ধ গল্পসাহিত্যে অধিকতর সামঞ্জস্য বা ঐক্য দেখা যায়। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনীগুলি মনে হয় আরও বেশি বর্ণময় ও রোমাঞ্চকর। কিন্তু, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি সঙ্গতিপূর্ণ এবং একই প্রকারের সমীকরণের রীতি গড়ে তুলতে এগুলি ব্যর্থ।

সুতরাং পরিকল্পনাবহির্ভূত ভাবে কিছু ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যায় এবং বোধসীমার বাইরে অবস্থিত অনির্দেশ্য শক্তিকে বলা হয়ে থাকে। অ-দৃষ্ট-ভাগ্যের একটি প্রতিশব্দ।

মহাকাব্য ও পুরাণের গল্পগুলি আশীর্বাদ এবং অভিশাপের উপাখ্যানের মাধ্যমে ভাগ্যের ক্রিয়াকলাপকে স্পষ্ট করে দেখায়। কোনও ব্যক্তি, কোনও সাধু ছদ্মবেশী দেবতা অথবা শুধুমাত্র কোনও বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি ভাল ব্যবহার করে। পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে সেই উপকৃত ব্যক্তি উপকারীকে সৌভাগ্যের দীর্ঘ জীবন, রোগমুক্তি, নিঃসন্তান ব্যক্তির জন্য সন্তানলাভ, সম্পদ, স্বর্গসুখ বা অন্য আনন্দের বর দান করে। অথবা কোনও ব্যক্তি যদি কোনও নির্দোষের ক্ষতি করে, সে তাকে কোনও বিপদ, ক্ষতি, অঙ্গহানি নরকবাস বা অন্য কোনও দুঃখের অভিশাপ দেয়। এই সব আশীর্বাদ বা অভিশাপ এই জন্মে অথবা পরজন্মে সফল হয়। আবার এগুলি, বিশেষ করে অভিশাপ অনেক সময়ই সংশোধিত, সীমিত, লঘুকৃত বা বিলম্বিত করা হয়, যদি শাপদাতাকে সকাতির অনুনয়ে সদয় করা যায়। এই সব ঘটনাতে দেখা যায় শাপ বা বর একবার উচ্চারিত হলে এক বিচিত্র। রহস্যময় নিজস্ব শক্তি তাতে সঞ্চারিত হয়। যেমন যথাবিধি অনুষ্ঠিত যজ্ঞের মাধ্যমে অপূর্ব জন্ম নেয় তেমনই শাপ বা বরের মাধ্যমে সঞ্জাত শক্তিও অপ্রতিরোধ্য। এ যেন জ্যা-মুক্ত তীরের মতো; কিন্তু কদাচিৎ একে ঈষৎ পরিবর্তিত করা যায়। এই সম্ভাবনা অভিশপ্ত ব্যক্তিকে, সেই সব ব্রাহ্মণ বা ঋষি, যাঁরা কখনও তপোবল কখনও বা যথাবিহিত ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা রাখেন, তাদের কাছে দ্রুত বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে এই রূপ অভিশাপ বা বরপ্রাপ্তি অনেক অংশেই বোধের অতীত ভাগ্যের লীলা, ছদ্মবেশী দেবতা বা ঋষিদের দ্বারা এগুলি উচ্চারিত; তাই অনুরূপ ফল দিয়ে থাকে। এই সব বর বা শাপের শব্দগুলি, মানুষের মুখে উচ্চারিত হলেও এগুলি প্রকৃতপক্ষে অতিলৌকিক শক্তি সমন্বিত,

দৈবী হস্তক্ষেপের একটি মাধ্যম। প্রায়ই শাপগুলি অপ্রত্যাশিত হয়ে থাকে। এগুলি কোপনস্বভাব ঋষিদের অন্যায়, অযৌক্তিক ক্রোধ ও অহঙ্কারের প্রকাশ। এই সব সময়ে, সেগুলিকে কেবলমাত্র ভাগ্য বলেই মেনে নেওয়া সম্ভব, কারণ এই সবের পিছনে যে সব ভ্রান্তি বা কর্তব্য চুতি থাকে তার অনুপাতে অভিশাপগুলি খুবই সঙ্গতিহীন অনিশ্চয়তা, আঘাত ও বিস্ময়ের এই সব উপাদান এই সব অভিশাপকে তাই অপরাধীর আয়ত্ত বহির্ভূত এক অনির্দেশ্য শক্তির, ভাগ্যের বহিঃপ্রকাশেই পর্যবসিত করে।

যদিও কর্মফল্যবাদ সম্পূর্ণভাবে ভাগ্য নির্ভর নয়, তবুও কার্যক্ষেত্রে এটি অনিবার্য ভাবে নিয়তিবাদী রূপ ধারণ করে। দেখা যাক, কী ভাবে তা হয়।

উপনিষদ ও পুরাণ-এর এই মধ্যবর্তী সময়ে, ভারতবর্ষের ধর্মমতগুলি এক বিশেষ অপরিণত অবস্থায় ছিল; ভারতবর্ষে কোনও সংগঠিত ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মপ্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রাথমিক বৈদিক ধর্মে ছিল ধর্মমত ও অনুষ্ঠানের মধ্যে এক প্রকার সংযুক্তি গঠন করার মতো প্রয়োজনীয় মতবাদের সামঞ্জস্য। এর কারণ অনেকটাই এই প্রকার যে, ধর্মমতের অনুগামী সমাজের প্রকৃতি ছিল মূলত গোষ্ঠী নির্ভর এবং একটি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় সংবদ্ধ সমাজ এখানে একত্রে পুরাকল্প ও ধর্মানুষ্ঠানকে অনুসরণ করত। এই বিশাল উপমহাদেশে দূরবর্তী প্রান্তে এই ধর্মমত বিস্তার লাভ করার পরে যখন জাতিসংকর সৃষ্টির ফলে এই ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল এবং পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক সংগঠনগুলি অত্যাধিকারের ফলে গোষ্ঠীনির্ভর সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, তখন এই প্রকার ধর্ম তার উৎপত্তির যথার্থ উদ্দেশ্য হারাল। প্রধান যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান করতে লাগলেন রাজা ও সমাজ প্রধানরা। পারিবারিক সংগঠনগুলি গৌণ ধারার গৃহ্য অনুষ্ঠান ও মঙ্গলাচরণকে আশ্রয় করল। এই গৌণ ধারা এই সময় পুনরুজ্জীবিত হল বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মতের

মাধ্যমে। এই গৌণ ধারার অন্তর্নিহিত সর্বপ্রাণবাদ মূল ও গৌণ ধর্মধারাকে বিভিন্ন প্রকার প্রেত ও আত্মার তত্ত্বে ভরিয়ে তুলল।

কর্মফলবাদের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়ভাবের ফলে স্বর্গ নরক সংক্রান্ত তত্ত্ব ছিল চূড়ান্ত ভাবে পৃথক। মানুষের মৃত্যুর পরে তার পরিণতি কী হয়? যদি সে পবিত্র জীবনযাপন করে থাকে আর পূর্ব জন্মের পাপভার মোচন করে থাকে, তবে সে:

(ক) হয় স্বর্গে যায়; অথবা (খ) সুখী আনন্দময় পরিবেশে পুনর্জন্ম লাভ করে অথবা (গ) নরকে যায়; সেখানে অল্পকাল যন্ত্রণা ভোগের পর স্বর্গপ্রাপ্ত হয়; (ঘ) যদি পার্থিব বন্ধন আর বাসনা মুক্ত হতে পারে তবে সে ব্রহ্মা-সায়ুজ্য প্রাপ্ত হয়।

যদি সে দুষ্ট, পাপী জীবনযাপন করে থাকে, তবে সে:

(ক) এই ঘৃণ্য দুষ্ট আত্মায় পরিণত হয় এবং ঊর্ধ্বলোকে ঘুরে বেড়ায়; (খ) স্বর্গে যায় ও অল্প কিছুদিন তার প্রাপ্য সামান্য সুখ ভোগের পর নরকে নিষ্ফিষ্ট হয়; এবং (গ) পরজন্মে এক অকাম্য হতাশাজনক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই সব জটিলতা দ্বিগুণ হয়ে পড়ে, কারণ:

(১) ভাল ও মন্দের বিধিগুলির অস্থিতিশীল ভাবে কারণ ভারতবর্ষ কখনওই ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে নীতিবাদ চর্চা করেনি; (২) কোন কাজের কোন প্রতিফল হবে সে বিষয়ে সমপূর্ণ অনিশ্চয়তা; (৩) একজন পক্ষপাতহীন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক যিনি নিরপেক্ষ ভাবে শাস্তি আর পুরস্কার দেবেন তাঁর অভাব; (৪) পারলৌকিক জগতের হস্তক্ষেপ এবং সর্বশেষে শাপ ও বর যদিও তার প্রাপকের

আচরণ অনুসারেই নেমে আসত, তবু প্রায়ই সেগুলি অপ্রত্যাশিত আর অসঙ্গত। এইগুলি যাঁরা নিতেন তারা ভাগ্যের প্রবক্তা রূপেই কাজ করতেন।

কোনও ব্যক্তির কর্মফলের বিবিধ বিকল্প কোথাও নির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি এবং তার উৎপাদক কাজের সঙ্গে সঠিক ভাবে তার সম্পর্কও নির্ধারণ করা হয়নি। বৈদিক যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠান করলে অপূর্ব উৎপাদিত হয় এবং এই অপূর্ব কাম্যবস্তুর জনক। কিন্তু 'কর্মফলবাদ' অ-পূর্বত্বের চেয়েও অনিশ্চিত, অস্বাভাবিক। তদ্ব্যতিরিক্তভাবে তাই বৈদিক ধর্মতত্ত্বের উপলব্ধি পৌরাণিক হিন্দু কর্মফলবাদ'-এর চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। এই যুগের নিয়তিবাদতত্ত্বের অন্তর্নিহিত বিশৃঙ্খলা অবশ্য এই যুগের ধর্মীয় বাতাবরণের পক্ষে কেবল যথাযথ নয়, এমনকী, অপরিহার্য ছিল।

জ্যোতিষবাদের চর্চাও এই যুগে নিয়তিবাদের বিকাশকে সাহায্য করেছিল। জ্যোতিষীদের সম্পূর্ণ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং এই ছদ্মবিজ্ঞান সাধারণ মানুষকে যথেষ্ট গভীর ভাবে ভীত ও প্রভাবিত করেছিল। এর উৎপত্তির অন্যতম কারণ ছিল গ্রহ-নক্ষত্রের উপর দেবত্ব আরোপ করা এবং মানুষের ভাগ্যের উপর তাদের গতিবিধি অবস্থান ও প্রভাব সম্পর্কে সমীহপূর্ণ বিচার। যতক্ষণ পর্যন্ত মানবজীবনে প্রায় কোনও কিছুই অব্যাক্যাত রইল না। ততক্ষণ এই ভাবে অক্লান্ত বিচার চলতে লাগল। প্রত্যেকটি দেশেই জ্যোতিষের চর্চা হত। কারণ মোটামুটি ভাবে ধারণা করা যায় যে দৈনিক জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এর কিছু কিছু সম্পর্ক রয়েছে। এই সমীক্ষার থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির সঙ্গে মানব জীবনের নিমিত্তগত সম্পর্ক রয়েছে, যদিও সিদ্ধান্তটি সমর্থনযোগ্য নয়। কালক্রমে ভারতবর্ষে জ্যোতিষ নামাঙ্কিত বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল এবং রাজধানী, দুর্গ, কোষাগার, নগর তোরণ, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হল। এই সব দেবতার পূজার বিধি সম্বলিত শাস্ত্র তাদের বিশেষ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

এবং ভক্তদের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুত বরদানের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে
লাগল। (১০)

বঙ্গ দেশে শনিপূজার সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে প্রায় এক দশক আগে। এই
অশুভকারী দেবতার ছোট একটি ছবি, খালাতে ফুল, ইত্যাদি উপাচারে
সাজিয়ে একটি ঠেলাগাড়িতে রাখা হয়। মানুষ প্রণাম করে আর খালাতে
প্রণামী দেয়। এই ধর্মানুষ্ঠানটির সুস্পষ্ট এক আর্থসামাজিক মূল্য রয়েছে।
কারখানার শ্রমিকদের একটি বৃহদংশই অস্থায়ী শ্রমিক, তাই কাজ হারাবার
আশঙ্কায় তারা সর্বদাই ত্রস্ত-যাকে পুরাকল্পের ভাষায় বলা হয় শনির অশুভ
দৃষ্টির সামনে পড়া'। এই অতি বাস্তব বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে স্বভাবতই
তারা শনিকে পূজা করতে প্রলুব্ধ হয়। এই সমস্ত বিষয়টিরই এক প্রকৃত
অমঙ্গলজনক ও করুণ এক তাৎপর্য রয়েছে, তা হল এই সব শ্রমিকদের মাইনে
শনিবারেই হয়ে থাকে, আর এই ভীতিপ্রদ দেবতাটির কোপ থেকে মুক্তি পেতে
তারা আতঙ্কিত ভাবে দেবতাকে সম্ভুষ্ট করতে চায়। এই ভাবে যে বিপদ
অর্থাৎ ব্যয় সংকোচের বিরুদ্ধে এক সম্ভবদ্ব বিরোধিতার মাধ্যমে প্রতিবাদের
প্রয়োজন ছিল তার বিরুদ্ধে দেখা যাচ্ছে এই শান্তিচুক্তির ব্যবস্থা, যার ব্যয়ভার
বহন করা এই দরিদ্র শ্রমিকদের পক্ষে কঠিন। অন্যান্য গ্রহদেবতারা জীবনের
অন্যান্য নিরাপত্তাহীন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং নিজ নিজ দক্ষিণা
আকর্ষণ করেন, যা মন্দিরের কোষ পূর্ণ করে অথবা যে দক্ষিণার গতি হয়
পুরোহিতের থলিতে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব গ্রহদের ঘিরে বিশদ পুরাণকথা
আর স্তোত্র, ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, কারণ, এই সব দেবতার নিয়ন্ত্রণে যে
আতঙ্কের উদ্বেক হয় তা এক অর্থে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি
সম্পর্কিত। যে মানুষ দুর্দশার হীন গ্লানিতে ডুবে আছে তার বিরুদ্ধ মনোভাব
আর প্রতিবাদ, প্রকৃত যে শত্রুর বিরুদ্ধে হওয়ার কথা সেই উৎসবে তাকেই
সম্মুখে আঁড়াল করে রাখা হয়েছে; পুরোহিত এবং শাস্ত্রকাররা এর প্রকৃত
লক্ষ্যকে লুকিয়ে রাখছে। এই ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান

আন্দোলনকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ সাময়িক ভাবে হলেও
বিকাশের পথ রুদ্ধ হচ্ছে।

মহাকাব্য ও পুরাণ যুগের ধর্মমতে 'কর্মফলবাদ' জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব ছাড়াও
বহু নূতন বেদ-পরবর্তী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে আছে মন্দির, বিগ্রহ, তীর্থ,
সংকল্প, শিবের মতো পবিত্রাতার স্বরূপ কল্পনা; বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের রূপ
পরিকল্পনা; পরিবারগত পুরোহিতের মাধ্যমে পূজাপ্রথা এবং পারিবারিক
বিগ্রহের প্রবর্তন; এবং আবহাওয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার তত্ত্ব। আধ্যাত্ম জীবনে
আশঙ্কার প্রসার হল, সামগ্রিক ভাবে ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যে অবহেলার ফল কী
হতে পারে এই সংশয়; অথবা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মন্দিরে অধিষ্ঠিত বা
পারিবারিক দেবতার প্রতি অবহেলা কিংবা ঈশ্বর ও সাধারণ মানুষের মধ্যস্থ
যে পুরোহিত বিশেষ গৌরবভাজন তাঁর প্রতি অবহেলা, ইত্যাদির ফল নিয়ে
আশঙ্কা। অন্তরীক্ষে অবস্থিত অদৃশ্য সব শক্তি— দানব, অতৃপ্ত প্রেতাত্মা আর
অতৃপ্ত আত্মারা, এরা সকলেই মানুষের শান্তি আর সুস্থতাকে বিঘ্নিত করতে
পারতেন। আবার অনিচ্ছাকৃত ভাবে সাধুদের কাছেও মানুষ অপরাধী হয়ে
পড়ত এবং ইহ বা পরজন্মে অভিশাপগ্রস্ত হত। পুরাণগুলিতে বহু কাহিনি এ
বিষয়ে সংযোজিত হল: বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দিরের পুরোহিত্যবর্গ ছিলেন এ
সবের রচয়িতা। তারা বিভিন্ন মতবাদের আনুষ্ঠানিক বিধি প্রবর্তন করলেন
এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার দুঃখদুর্দশার প্রতিকারমূলক অসংখ্য নৈতিক কর্তব্য,
সম্প্রদায়গত ভাবে এবং ঋতু-অনুযায়ী নির্ধারণ করলেন; এমনকী প্রায়শ্চিত্ত
বিধিরও ব্যবস্থা করলেন।

এই প্রকার ধর্ম এক দিকে সর্বপ্রকার গার্হস্থ্য ও সামাজিক প্রথার দায়িত্ব
নিয়েছিল এবং সেগুলির জন্য আচার অনুষ্ঠানের বিধান দিয়ে সন্দেহ এবং
অপাত্রে দান হ্রাস করেছিল, অন্য দিকে সামাজিক ও পারিবারিক
জীবনযাত্রাকে অসংখ্য অনুষ্ঠানের জন্য দায়বদ্ধ করেছিল। বৈদিক শ্রীতি ও

গৃহ্যকর্মের একগ্রীকৃত তালিকার চেয়েও এই সব প্রথার সংখ্যা অনেক বেশি। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত পৌরোহিত্য করতেন এবং এ জন্য তিনি দক্ষিণা পেতেন। অবশ্যই এই সব উচ্চবর্ণের স্বার্থেই অঙ্ক সাধারণ মানুষকে বিশদ ভাবে বোঝানো হত যে, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে দুর্জয়। কারণ তা হলেই যে সব বাস্তব ও কাল্পনিক বিপদ চারদিকে ঘনিয়ে রয়েছে, যে সব আত্মারা, আশেপাশে আক্রমণের অপেক্ষা করছে। তারা মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ধ্বংস করতে চাইছে। সেই সব বিপদের প্রতিষেধক অনুষ্ঠান করার জন্য আরও আরও বেশি দক্ষিণা আদায় করা যাবে। (১১) পূর্বজন্মের যে সব অভিশাপ ইহজন্মে ফল দিচ্ছে অথবা ইহজন্মের যে সব অজ্ঞানকৃত অপরাধ পরজন্মে কষ্ট দেবে সেই সব দূর করার জন্য পুরোহিতেরা পারিশ্রমিক পাবেন। (১২) এই ভাবে ভাগ্যের এক প্রধান শক্তির প্রকাশ হল অভিশাপ। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যেও অনুরূপ চিন্তাধারা দেখা যায়। হোমারের লেখায় এরিনিয়েস (Erinyes) প্রায়ই তাদের নিজস্ব ক্ষমতা হারিয়েছে, এবং তখন তারা কেবল কোনও অভিশাপ বা কোনও ব্যক্তির উচ্চারিত অভিশাপের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (১৩) অভিশাপ ও আশীর্বাদের পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে ফলপ্রসূ হওয়ার ধারণাকে এই ভাবে নৈর্ব্যক্তিক করে দেওয়াতে সেগুলি হয়ে দাঁড়াল সমীহ উদ্রেককারী আধিদৈবিক শক্তিস্বরূপ। এর যুক্তিনির্ভর পরিণতি হল। এই যে, সেগুলি কেবল মানুষী শক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে রইল না, কখনও কখনও দেবতাদেরও আয়ত্তে রইল না; এই ভাবে পুরাণ কথা, আখ্যান ও ধর্মতত্ত্ব ভাগ্যের অদৃশ্য শক্তির কাছে বশীভূত হতে হল। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার দুঃখ, রোগ, ক্ষতি, মৃত্যু, ইত্যাদির অসংখ্য সম্ভাব্য কারণ বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠল। নিজের দুর্দশার সঠিক কারণ সে কখনওই অনুমান করতে পারল না, কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারল না ও সমস্ত ঘটনাই তার কাছে মনে হল ভাগ্যের লীলা। তার চারপাশ ব্যাপ্ত করে এই যে অতিলৌকিক শক্তির সর্বগ্রাসী জাল, তার কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করল। এই শক্তির নিজস্ব গতি সম্পর্কে তার জানার, অনুমান করার অথবা একে নিয়ন্ত্রণ

করার বিশেষ কোনও সম্ভাবনাই তার ছিল না, কেবল খোলা ছিল বহু-বিচিত্র আচারবিধির মাধ্যমে ভাগ্যকে প্রসন্ন করার বা প্রায়শ্চিত্ত করার পথ।

আদর্শগত ভাবে কর্মবাদের তন্ত্রের সঙ্গে নিয়তিবাদকে যুক্ত করা যায় না, কারণ কর্মবাদ একটি কার্যকারণ সূত্রের ফলশ্রুতি। নিয়তিবাদকে সঠিক ভাবে কোনও ধর্মের সঙ্গেও যুক্ত করা যায় না, কেননা, মঙ্গলময় দেবতারা, যাঁরা এখন অধিকাংশই মোক্ষদাতা, যথাযথ পূজার দ্বারা তাদের প্রসন্ন করা যেত। তাঁদের তুষ্ট করার এক অপেক্ষাকৃত নুতন আবেগনির্ভর উপায় দেখা দিল— ভক্তিমােগ। তন্ত্র অনুযায়ী তীর্থযাত্রা এবং ব্রতরক্ষার ফলেও কেবল এ জন্মের নয়। বহু পূর্ব জন্মের অজস্র পাপমোচন হয়। সুতরাং তন্ত্রগত ভাবে তারা ভাগ্যকে অস্বীকার করছে। কিন্তু স্বর্গ-নরকের ধারণা কখনওই সুস্পষ্ট রূপে ঘোষিত হয়নি, সুতরাং মৃত্যুর পরে মানুষের ভাগ্য বিষয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। ভ্রান্তি, কর্তব্যে অবহেলা এবং অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো অসংখ্য বিপদের সম্ভাবনা সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলে। আর একটি বিষয়ে এই সময়ে পুরোহিত এবং জাদু চিকিৎসক উভয় গোষ্ঠীই মন দিয়েছিলেন। এটা হল ভবিষ্যদ্বাণী, অমঙ্গলচিহ্ন, কুলক্ষণ, স্বপ্ন, ইত্যাদি, যা কিছুকে অশুভ ঘটনার পূর্ব সূচনা বলে মনে করা হয় এবং ওই সব অমঙ্গলকে এড়ানোর জন্য যার বিরুদ্ধে ধর্মানুষ্ঠানমূলক প্রতিষেধক গ্রহণ করা উচিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৩৩ অধ্যায়) এবং ভাগবত পুরাণ (৩:১৭)-এ আমরা দুলক্ষণ এবং অমঙ্গল চিহ্নের দীর্ঘ তালিকা পাই। ভাগবত-এ দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর জন্মের সময় বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। মহাভারত-এর মুখ্য চরিত্রগুলির জন্মকাল এবং যখন তারা যুদ্ধযাত্রা করছে— যে যুদ্ধে তারা ঘটনাক্রমে মৃত্যু অথবা বিজয়ের সম্মুখীন হবসেই সময় বহু প্রকার দৈব লক্ষণের বর্ণনা রয়েছে। ইলিয়াদ কাব্যে দেখা যায়। ভাল এবং মন্দ লক্ষণের

সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিশ্লেষণে, এই প্রকার শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। (১৩)
অমঙ্গল চিহ্ন ও দুর্লক্ষণ সম্পর্কে এই প্রকার মনোভাবের পিছনে এই অনুমান
রয়েছে যে, চোখে যা দেখা যায় এবং এর থেকে যার পূর্বাভাস পাওয়া যায়—
এই দুইয়ের মধ্যে কোনও অচিন্তিতপূর্ব যুক্তিসম্মত যোগাযোগ আছে; আমাদের
চোখ এই আবরণ ভেদ করে দেখতে পায় না, যেহেতু আমরা সাধারণ মানুষ
মাত্র। এই যুক্তিকে দূত করার জন্য অনেক সময় সন্ন্যাসী, দেবতা ও
মহাপুরুষরা লক্ষণ ও স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন। এতে প্রমাণিত হয় যে,
দুর্লক্ষণতন্ত্র উপলব্ধি করার জন্য সংগুপ্ত জ্ঞান, যোগসিদ্ধ ক্ষমতা বা
অতিলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। (১৪)

ভারতবর্ষে সেই অর্থে দৈবপ্রত্যাদেশের পীঠস্থান নেই, কারণ এখানে সন্ন্যাসী ও
মহাপুরুষরাই দৈবপ্রত্যাদেশ দিয়ে থাকেন। মানুষ উদভ্রান্ত মানসিক অবস্থায়
বা কোনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে পূর্বাভাসের আত্যন্তিক প্রয়োজনে,
অথবা তাদের কোনও প্রচেষ্টায় বাধা পেয়ে সাধু সন্তের কাছে যায়, যাঁরা
তাদের জন্য আধ্যাত্মিক উপায় খুঁজে বার করেন। আমাদের ডোডোনা (দেবী
স্থান) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্দিরের পুরোহিতকুল, যাঁরা শরণার্থীদের প্রার্থনা কী
ভাবে পূর্ণ হবে বা আন্দীে হবে কি না তা দেখাবার জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক
শুদ্ধি, ব্রত বা পুণ্য কাজের অনুষ্ঠান করতে বলেন। সম্ভাবনার সূত্র অনুযায়ী
কয়েকটি ক্ষেত্রে তা সফলও হয় এবং বলার অপেক্ষা থাকে না যে, ব্যর্থতার
ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্রচুর ভুলভ্রান্তির সুযোগও থাকে। আবার কোনও
অতিপ্রাকৃত কার্যকলাপে—যেখানে মধ্যবর্তী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা (অবশ্যই
রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে) রয়েছে—সেই সব কার্যে বিশ্বাস জন্ম নেয়;
যেহেতু এই সব ক্রিয়াকলাপ, শক্তি এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পদ্ধতি সব কিছুই
অস্পষ্ট, সে জন্য মনে করা হয়। এগুলি ভাগ্যেরই বহুবিচিত্র প্রকাশ। (১৫)

কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে নিঃসন্তান রাজা দিলীপ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ও সমাধান প্রার্থনা করেন; তিনি ঋষির উপদেশ মতো আচরণ করেন ও একটি পুত্র লাভ করেন। মহাভারত-এ নারদ মুনি সত্যবানের আয়ু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন (৩:২৯); অধিকাংশ পুরাণেই এই ভাবে মহাপুরুষেরা মানুষের দুর্দশার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের উপায় বলেছেন। এর কারণ এই যে তাদের পবিত্র তপোবল মহাবিশ্বের অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ স্থাপন করেছে, ফলে তাঁরা জানতে পারেন, এবং যেহেতু তারা পরিণতি বুঝতে পারেন। তাই তারা কার্যের যথার্থ প্রতিষেধকও নির্ণয় করেন।

পুরাণসম্মত সর্বপ্রকার কুসংস্কার পোষণ করার পক্ষে মানসিক পরিবেশ ছিল একেবারে যথায়থ। জাদু এবং রহস্যময়তার প্রতি বিশ্বাসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৬ কিন্তু অনির্ণেয় এবং সর্বশক্তিমান নিয়তি সর্বব্যাপী জাল বিস্তার করেছিল। সাধারণ মানুষকে পদানত করে, তাকে পুরোহিত ও শাস্ত্রের নির্দেশ মানতে বাধ্য করেছিল। এর প্রধান অস্ত্র ছিল আতঙ্ক এবং নিয়তির অনির্ণেয়তাই তাকে আরও ভীতিকর করে তুলেছিল।

নিয়তিবাদের তত্ত্ব যখন ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছে তখন সেই সব শতাব্দীর পর শতাব্দীতেই যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই সব শৈব ও বৈষ্ণব আন্দোলনেও প্রায়ই পরোক্ষ ভাবে নিয়তি তত্ত্বকে ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে গোষ্ঠীগত ধর্মতত্ত্বকে মানুষের মনে দূতমূল করার জন্য যে সব আখ্যান মূলত রচিত হয়েছিল সেগুলির ক্ষেত্রে। এর মধ্যে মুসলিম ধর্মও প্রবর্তিত হয়েছে এবং কিছু মানুষ ধর্মান্তরিতও হয়েছে। কিন্তু জীবনের প্রতি যে গভীর নিয়তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—যার ফলে মানুষ যে কোনও ধর্মীয়, সামাজিক বা

রাজনৈতিক ক্ষমতার আসফালন বিনা প্রতিবাদে মেনে নিত তার কোনও পরিবর্তনই হল না।

কেউ যদি দরিদ্র, মৃত, বঞ্চিত বা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় থাকে। তবে এ-ই। তার নিয়তি। বারংবার আমরা এই প্রবচন শুনতে পাই—‘নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে’—ভাগ্যকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। দীর্ঘতর কাব্যে নাটকে বা ধর্মসাহিত্যে আমরা সহস্রাধিক শ্লোকে এই একই কথা শুনি—নিয়তির সর্বোচ্চ ক্ষমতার কাছে এই নির্বিবাদ আত্মসমর্পণ। এ কথা সত্য যে, আমরা এমন বিবরণও পেয়েছি যেখানে মানুষ তার ক্ষমতার প্রমাণ করার জন্য ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু সেই যুদ্ধের পরিণতিও হয় পরাজয়। মহাভারতে কর্ণ বলেন, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়িত্তং তু পৌরুষম-নীচ বংশে জন্ম ছিল ভাগ্যের অধীন। কিন্তু আমার পৌরুষ আমার অধীন।’ কিন্তু মহাকাব্যের সব পাঠকই জানেন নিষ্কারুণ ভাগ্যের বিরুদ্ধে কর্ণের এই যুদ্ধ অনেকাংশে গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কদের মতো; যারা অতুলনীয় বলশালী সব শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, শুধু হেরে যাওয়া যুদ্ধই করে গেছে কেবলমাত্র তাদের মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করতে। কিন্তু গ্রিক ট্র্যাজিক নায়করা যুদ্ধ করেছে দেবতা দ্বারা রক্ষিত সব শত্রুর বিরুদ্ধে, এখানে ধর্মীয় ও সামাজিক শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধ সমর্থিত হয়েছে, কারণ তার উদ্দেশ্য কাউকে সাহায্য করা এবং অন্যদের প্রতিরোধ করা তাই এমনকী পরাজিত নায়করাও ভাগ্যের বঞ্চনা অনুভব করে না। কিন্তু ভারতবর্ষে ভাগ্য মানুষের কাছে এক অন্ধ চালিকা শক্তি রূপে উপস্থিত হয়, কেননা, মানুষ নিজেই এই শক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্ধ। সুতরাং কোনও মানুষের এ কথা জানার উপায় নেই যে, পবিত্র জীবনযাপন করা সত্ত্বেও তার কেন বিনাশ হল। মাঝে মাঝে মহাকাব্য ও পুরাণের অতিকথাগুলি ভাগ্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে হতভাগ্য মানুষকে জ্ঞান দেয়। এই ভাবে ভাগ্যের বোধ বহির্ভূত প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু সামগ্রিক ভাবে অধিকাংশ মানুষের কাছে এই সব ব্যাখ্যা খুবই প্রক্ষিপ্ত ভাবে

গ্রহণযোগ্য এবং কোনও কোনও সময়ে এর অস্তিত্বই নেই, তাই কেন তারা এই ভাবে কষ্ট পায় এ বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থেকে যায়।

এই সুদীর্ঘ সময়ে অধিকাংশ মানুষের কাছে জীবন ছিল প্রায় অসহনীয়। কৃষক এবং কারিগর এরা অত্যন্ত শ্রমমূল্য পেত। স্বল্পসংখ্যক ধনীরা হাতেই সম্পদ রাশি কৃত হত। রাজসভায় রচিত কাব্য ও নাটকের পাতা এদের উপভোগের বিবরণেই আকীর্ণ। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর আর সর্বনিম্ন স্তরের জীবনযাত্রার মানে এতই পার্থক্য যে, এর জন্য কিছুটা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কর্মফল্যবাদ ও জন্মান্তরবাদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দক্ষতার সঙ্গেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছিল। যেখানে সাধারণ ক্ষেত্রে মানুষ অভাব, রোগ, দুর্দশা এবং শোষণের বিরুদ্ধে সরবে। প্রতিবাদ করবে। সেখানে এই সব দুষ্ট মতবাদ সহজেই প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করেছিল। কারণ পূর্বজন্মের কার্যকলাপ অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়ই রয়ে যায়, তার তথাকথিত যে ফল মানুষ ইহজন্মে ভোগ করে তাই হল অ-দুষ্ট।

তবুও মানুষ অবদমন আর শোষণকে প্রতিহত করেছে। কারণ, যে কোনও তত্ত্ব যত দূর এবং আপাতদৃষ্টিতে যত নিয়ন্ত্রক হোক না কেন তা কখনওই মানুষের জীবনতৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ বিনাশ করতে পারে না।

মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে নিয়তি আর স্বাধীন ইচ্ছা-উভয়ের আপেক্ষিক কার্যকারিতা বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্ক দেখা যায়। যদি পরিণামবাদকে সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নেওয়া হয়, তবে তা জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে, সুতরাং এ বিষয়ক বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থগুলি স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধী। প্রথম তাৎপর্যময় শ্লোকটি দেখা যায় মহাভারত-এ, যেখানে আমরা শুনি, চেষ্টা ব্যতীত ভাগ্যনির্মলফল;(১৭) ভাগ্য কোনও ন্যায়বান পুরুষকে কী করতে পারে?(১৮) অহংকারী, ক্ষমতাবান পুরুষ ভাগ্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন না। এর পর

উদাহরণের একটি তালিকা আছে: 'যেমন করে নিঃশেষিত তৈলপ্রদীপে তেল দিলেও' প্রদীপ নিভে যেতে থাকে তেমনই যখন কর্ম বিনষ্ট হয় তখন ভাগ্যও দুর্বল হতে থাকে। (১৯) ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১১৬-১১৯ পরিচ্ছেদ এবং ১৪৪, ১৪৫ পরিচ্ছেদ) জীবনের নীতিনিষ্ঠ পথ এবং কর্ম থেকে মােক্ষাপ্রাপ্তি ও তার ফলকেই জীবনের সারমর্ম বলে দৃঢ় ভাবে ব্যাখ্যা করে। সমগ্র উনবিংশ পরিচ্ছেদটি হল কর্ম এবং তার প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা। এর প্রথমেই রয়েছে—সৎ বা অসৎ কোনও কর্মই নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যায় না, তারা পরিণত হয়। অর্থাৎ যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে ফলদান করে। এর পরিবর্তে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে: বহু আখ্যানেই আপাত-অলঙ্ঘ্য প্রতিকূলতার সম্মুখে মানব প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে প্রতিদ্বন্দিতার যোগ্য। কিন্তু এক প্রকার বিপরীত অর্থাৎ নিয়তিবাদী মনোভাব, যার অন্তর্লীন ইঙ্গিত হল সচেতন ভাবে এমনকী স্বেচ্ছায় এক অপ্রতিরোধ্য অনির্ণেয় শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করা, সেই বোধ অজস্র আখ্যানে ফুটে উঠেছে এবং এই মনোভাবই সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে এমন এক জগৎ গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সবই পূর্বনির্দিষ্ট, ফলে কাঁটায় পদাঘাত করলে তা ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসে।

এই ভাবে, এই নৈতিক ভাবে দুর্বলকারী মতবাদ বিস্তার লাভ করায় অনেক প্রতিরোধের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়েছিল। কারণ এই মতবাদ একটি সহজবোধ্য স্তরে মানুষকে বোঝায় যে তার ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ অবশ্যই বোধসীমার বহি ভূর্ত, কারণ নিয়তিই সব কিছুর চরম নিয়ন্তা। যে সব শক্তি মানুষের ভাগ্যবিধি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে চেনা অসম্ভব; এই বোধের মারাত্মক চাপ মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় প্রকার নেতৃত্বের কাছেই এই মতবাদ অত্যন্ত সুবিধাজনক। কারণ, এর সাহায্যে সাধারণ মানুষকে নিবীৰ্য করে আত্মিক এবং বস্তুগত উভয় বন্ধনেই

বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল। এই সব সমাজপতিদের হাতে বহু শতাব্দী ধরে নিয়তিবাদ ছিল এক মারাত্মক বলবান অস্ত্র। এক ধর্মীয় বাতাবরণ যার মধ্যে আছে অনেকাংশে জাদু, শুভাশুভ লক্ষণ বিচার, দেবত্ব-আরোপ, দৈববাণী, জ্যোতিষ, অভিশাপ আশীর্বাদ এবং সর্বোপরি যে বাতাবরণকে ক্রমশ এক শক্তিশালী পুরোহিত তন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করেছিল— তা সাধারণ মানুষকে এক ভাবে বন্দি করে রেখেছিল। এই কারণেই প্রায় পনেরো শতাব্দী কাল ধরে এই দুষ্ট শক্তি সম্পন্ন মতবাদ সক্রিয় থাকার ক্ষমতা সংগ্রহ করেছিল।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে নিয়তিবাদ কোনও দার্শনিক তত্ত্ব নয়; এর কোনও ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। কোনও মহাজাগতিক তত্ত্ব, সত্ত্বতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, কারণতত্ত্ব বা স্বর্গ-নরক বিচার—কিছুই এখানে নেই। কিন্তু যে সমাজে এই নিয়তিবাদ সৃষ্টি হয়। সে সমাজে এই সব ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের উপরই নিয়তিবাদের প্রভাব পড়ে। অবশ্যই এই মতবাদ আবশ্যিক ভাবে আদিম নয়, কারণ প্রায়ই দেখা যায় সমাজের যথেষ্ট শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান স্তরেও এর বিস্তার। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায়, এর অন্যতম শর্ত হল বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া। যখন প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ে, যখন বস্তুগত সমৃদ্ধির ফলে কারিগরি উন্নতির ফল জনগণের কাছে সহজলভ্য হয়, তখন নিয়তিবাদের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে। অধিকাংশ সমাজেই সামগ্রিক ভাবে বস্তুগত সমৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যার বিস্তার আর নিয়তিবাদের মধ্যে এক প্রকার বিপরীত অনুপাত রয়েছে।

অবশ্য কোনও মানুষের পক্ষে প্রকৃতিবিষয়ে সামান্য অতিকথা-বিরোধী বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জ্ঞান-নিয়তিবাদের বিরোধিতা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ প্রায়ই এই জ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মতো সহায় তার থাকে না (যেমন ঘাটে কৃষক ও কৃষি সারের ক্ষেত্রে)। কখনও বা অন্তর্নিহিত বাধাই

তাকে বৈজ্ঞানিক সাহায্য আসার পরেও নিষ্ক্রিয় করে রাখে, বিশেষ করে যখন তার সমগ্র জীবনের চিন্তাধারার সঙ্গে কোনও বিজ্ঞান শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র অংশকে সংযুক্ত করার পক্ষে তার নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষার স্তরটি প্রয়োজন মতো উন্নত না থাকে (যেমন টিকাকরণ ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে)। যতদিন জীবনচর্যার এক বৃহদংশ। মানুষের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে, ততদিন নিয়তিবাদ পল্লবিত হতে থাকে। তার প্রধান কারণ এই যে, জীবন সম্পর্কে এক পুরাণকথানুগ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একে যুক্ত করা সহজ। অন্যান্য বহু দেশের মতো ভারতবর্ষেও এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য দেখা যায়।

নিয়তিবাদের সারমর্ম হল যৌক্তিকতার উপরে আকস্মিকতার, প্রত্যাশিত নিয়ন্ত্রণাধীনের উপর অপ্রত্যাশিতের অচিন্তনীয়ের প্রাধান্য। এর ভিত্তি হল জীবনে আকস্মিক অনায়ত্ত পরিস্থিতি উপস্থিত হওয়ার অতিবাস্তব সম্ভাবনা; এবং জীবনে যে সব ঘটনা যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রত্যাশা করা যায়। তার চেয়েও আকস্মিক ঘটনাকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করার মানসিকতাই নিয়তিবাদ। ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশেও বুদ্ধিনির্ভর জীবনযাত্রার এক মূর্ত প্রতিবাদ হল নিয়তিবাদ। বিশেষ করে যেখানে যুক্তিনির্ভরতা আর বুদ্ধি দিয়ে কোনও কোনও সমস্যার সমাধান হয় না।

কালের ক্রম বিচার করলে নিয়তিবাদের উদ্ভব হয় উপনিষদের সমকালে। অন্য ভাবে বলা যায়, মননশীল স্তরের প্রধান অংশ তখন জ্ঞান এবং অধ্যাত্ম-রহস্যকেই জীবন ও বাস্তব সম্পর্কিত একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি রূপে, মোক্ষাপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় কার্যকরী ধর্মীয় উপায় রূপে ঘোষণা করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিপরীত তত্ত্ব সেই সময় দেখা গেল। অবশ্যই ঔপনিষদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য আর আংকাবাদী অ-দৃষ্ট উভয়ের অস্তিত্ব ভিন্ন মেরুতে। কিন্তু জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকার করে, নিয়তিবাদ নিয়ে এল জ্ঞানের এক তাত্ত্বিক শূন্যতা। জ্ঞানকে নিষ্ফেপ করল অন্ধগলি পথে যেখানে মানুষের ভবিষ্যৎ

বাস্তবে অজানা, অজ্ঞেয় থেকে যায়। জীবনে প্রত্যেকটি বিষয়ের যে পূর্বাভাস পাওয়া যায় না, সব কিছু পরিকল্পনা মতো হয় না, আয়ত্তে থাকে না। এই সত্যকে নিশ্চিত করে নিয়তিবাদ। ক্রমবর্ধমান যুক্তিবাদনয়ন্ত্রিত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের চেয়েও আকস্মিকতার ভূমিকাকেই সে অনেক বড় করে দেখায়। এই মনোভাব নিষ্ক্রিয়তার এবং উদ্যোগহীনতার জনক এবং কিছু দূর পর্যন্ত এই মনোভাব নির্দিষ্ট শক্তির স্বার্থ রক্ষণ করে থাকে।

নিয়তিবাদ যে কোনও সংহত ধর্ম ব্যাখ্যার বিরোধী। যদি দেবতারা মানুষকে সত্য, শিব, সুন্দর ও পূর্ণতার পথের মঙ্গলজনক দিশা দেখান, তারই প্রতিনিধি হয়ে থাকেন তবে ভাগ্য যেখানে ক্রিয়াশীল হবে সেই শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় না। মঙ্গলময় দেবতারা যখন মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তার পরিণতি হওয়া উচিত। শুধু আনন্দময়। কিন্তু অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, জীবনের প্রতি এই আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক রক্ষ বাস্তবের মোচড় আছে। সুতরাং, গ্রীণ যেমন বলেছেন, 'বস্তু জগতের মর্মে পুরাকাহিনির দেবতাদের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে এমনকী নৈতিকতার কোনও মূল্য সম্পর্কে একটি গভীর সংশয়বোধ এমনকী নৈরাশ্যবাদ শুধুমাত্র পুরাণোক্ত দেবতাদের সম্বন্ধে নয়, কিন্তু নৈতিকতার মূল ভিত্তি সম্বন্ধেও অন্তর্নিহিত আছে। (২০)

যদি সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহই শুভ শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে নিয়তিবাদকে কোথাও স্থান দেওয়া যায় না, বিশেষ করে যেহেতু নিয়তিবাদ স্বাধীন বিচারশক্তি ও পুরুষকারের ভূমিকা অস্বীকার করে। পূর্বনির্ধারণ এবং স্বাধীনবিচারের মতো, ক্যালডিনের পূর্বনির্ণয়বাদের মতো বিতর্কই ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় প্রধান হয়ে উঠেছে। পুনরায় এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হল গুরুত্বের আপেক্ষিকতা। একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে দৈব, পুরুষকার এবং কাল এই তিন শক্তি যুগপৎ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। (২১) আর এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে সমস্ত দুর্ভাগ্য এবং

দুর্ঘটনা কালের নিয়ন্ত্রণাধীন; কাল যদি বিরুদ্ধে থাকে, ক্রুদ্ধ হয় তবে কী করে আমরা পরিত্রাণ পাব? এটা ব্রহ্মারই বিধি যে, সব কিছু প্রাণীকুলের ত্রিভুবনের সমস্ত শক্তি, কালের অধীন। (২২) আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে ধর্ম, কাল এবং মৃত্যু সর্বদা একত্রে বিচরণ করে। (২৩) মৃত্যুর বারো দিন পরে একজন মানুষকে যমপুরীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে মৃত্যু কাল ও অন্তকের মাঝে সে যমকে দেখতে পায়। (২৪) কালই সর্ব প্রাণীর সৃষ্টি ও ধ্বংসকর্তা, সকলেই কালের অধীন। কিন্তু কাল কারও অধীন নয়। (২৫)

এই কালের প্রয়োজন নিয়তিবাদের ধারণার বিকাশকে পোষণ করার জন্য। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সময় তা হল ভবিষ্যৎ এবং মহাকালের রূপকল্পনা— অসীমের মূর্তি বিগ্রহ; সে হল ভবিষ্যতের প্রায় নির্ভুল রূপমূর্তি। পৌরাণিক অতিকথাগুলিতে শিব, যিনি যুগান্তের ভয়ংকর বিধাতা, তাকে বলা হয়েছে মহাকাল’—মৃত্যুর দেবতা। এই দেবতা ভূত-প্রেতের সঙ্গে বিচরণ করেন এবং তিনি যমেরই এক পরিবর্তিত রূপ। তাই যে সব পুরাকথাতে কাল, অন্তক, যম, ধর্মরাজ, ইত্যাদির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে তারা শিবকেও এঁদের সঙ্গে যুক্ত করে। শিবের মধ্যে এবং শিবের দ্বারা কাল ও সময় মহিমাম্বিত হয়ে উঠেছে। লৌকিক ‘ধর্মপূজার’ ক্ষেত্রে যে শিবকে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় তা কোনও আকস্মিক সমাপতন নয়। এই ভাবে পুরাকথার উপযোগী ভাষায় ও ইঙ্গিতে এই বক্তব্যই প্রকাশিত হয়। যে, কাল একজন ন্যায্য বিচারক, ধর্ম (ন্যায়), কাল (সময়) ও যম (মৃত্যু) একত্রে নৈতিকতা সম্মত কার্য বিধান করেন। মানুষকে তার ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত করার এটি একটি প্রচেষ্টাতাকে আশ্বাস দেওয়া যে, কোনও কিছুই নিয়মবহির্ভূত নয়, কারণ দেবতারাই মানবজীবনে কর্তৃত্ব করছেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত কোনও কিছুই ভুল হবে না, হতে পারে না। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে বা

অতিকথায় এ কথা কখনও স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করা হয়নি, ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ভাগ্য অশ্রেয় ও অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে গেছে।

ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ শেষ বিচারের আপাত বাহ্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে চিত্রগুপ্তের পৌরাণিক চরিত্রটিকে সৃষ্টি করে। এই চিত্রগুপ্ত মানুষের ন্যায্য-অন্যায্য কাজগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখেন, যাতে পরজন্মে সেই অনুযায়ী মানুষ শাস্তি বা পুরস্কার পায়। (২৭) এক অর্থে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা আর নিয়তিবাদ পরস্পরের বিপরীতগামী: যদি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সফল তাৎপর্য থাকে, তবে একজনের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিকল্পে অন্য একজন করতে পারে এবং কর্মের প্রকৃত অনুষ্ঠাতার উপর থেকে নৈতিক দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়।

অভিশাপ এবং আশীর্বাদ, যা মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে, সেগুলি প্রায়ই আবেগত্যাগিত বলে মনে হয় এবং কোনও প্রতীতিমূলক অধিবিদ্যাসংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে এগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায় না। অনুরূপ ভাবে যদি আত্মা ও প্রেত কোনও মানুষের জীবনকে সত্যিই প্রভাবিত করতে পারে তবে তার কৃত ভাল ও মন্দ কাজের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং অকার্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

যদি অনুমান করা যায় যে অভিশাপ ও আশীর্বাদ, আত্মা ও প্রেত, শ্রাদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্ত, এমনকী পুরস্কার ভাগ করে নেওয়া (পুরাণগুলি মধ্যে মধ্যেই আখ্যানের সাহায্যে এর উদাহরণ দেয়)—এই সব কিছুই পূর্বনির্দিষ্টতার পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে তখনই কর্ম তার গুরুত্ব হারিয়ে গৌণ হয়ে পড়ে। আর যদি এই নিয়তি অথবা পূর্বনির্দিষ্টতার তত্ত্ব নিজেই কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ওই সব অসংখ্য গৌণ মাধ্যমের কল্পনা অপয়োজনীয়, এমনকী

পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ে। সুতরাং নিয়তিবাদ বিষয়ে যুক্তিসংগত প্রতিতি উদ্ভাবনের চেষ্টা কখনও করা হয়নি।

তবুও এই নিয়তিবাদের সর্বব্যাপী অস্পষ্টতা হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মীয় পরিবেশকে গ্রাস করে রেখেছে। পুরোহিতদের স্বার্থেই নিয়তিবাদকে তার অসংখ্য প্রকার বহিঃপ্রকাশ আর বিভিন্ন মাধ্যমসহ মেনে নেওয়া হয়েছিল। বৃহত্তর জনসাধারণের আর্থিক অনুন্নত অবস্থা আর বিত্ত জগতেও তার বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবই নিয়তিবাদের অধিপত্যের কারণ। বিভিন্ন স্তরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতিএ দুইয়ের মিলিত অবদানে যখন কুসংস্কারমুক্ত, নিয়তির প্রভাব মুক্ত জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল বাস্তবায়িতই হবে না—অত্যাবশ্যিক, অপরিহার্য হয়ে উঠবে, তখনই নিয়তিবাদের শিকড়গুলি সমাজের অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে উচ্ছেদ হবে। কিছু দিন বাহ্যিক স্তরে এর প্রভাব অবশিষ্ট থাকতেও পারে কিন্তু ভয় আর বিস্ময়ের জাল বিস্তার করে লৌকিক চেতনাকে অধিকার করার ক্ষমতা তখন নিয়তিবাদ হারিয়ে ফেলবে। আর্থসামাজিক অগ্রগতি এর মূলকে ধ্বংস করে হয়ে উঠবে সহজসাধ্য, নূতনতর বিকাশের সহায়ক।